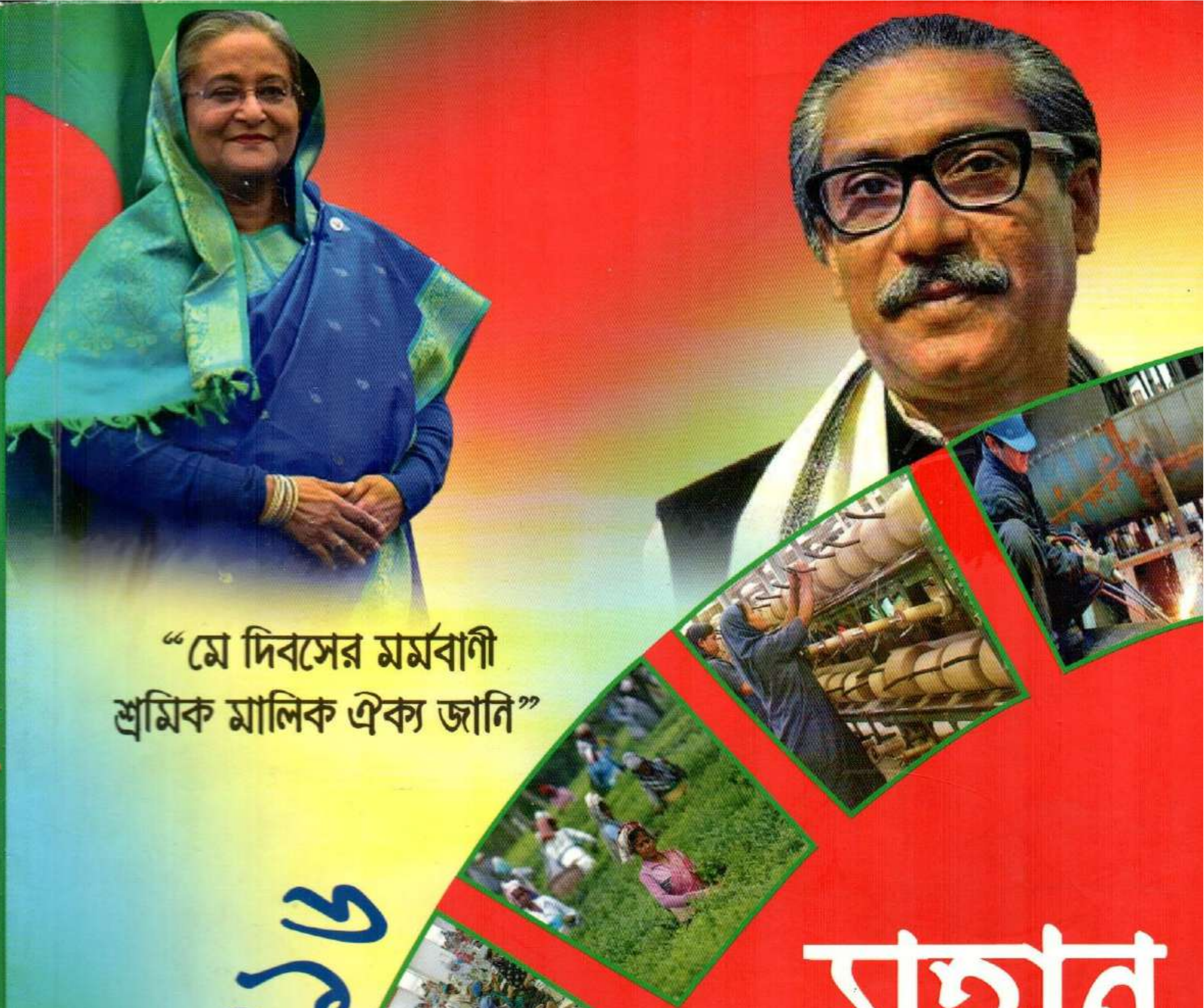

“মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি”

মহান মে দিবস

২০১৬

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মহান মে দিবস ২০১৬

মোঃ ফোরকান আহসান
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

'যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা
গৌরী, যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান'

মোঃ [illegible]
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ ফোরকান আহমেদ
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৮ বৈশাখ ১৪২৩
০১ মে ২০১৬

বাণী

মহান মে দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবময় দিন। আজ থেকে ১৩০ বছর আগে ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক সংগঠনের যে বিজয় সূচিত হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে বিশ্বে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করণসহ বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই। এ জন্য উৎপাদনশীলতা ও শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করণসহ সুস্থ শিল্পসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে তাদের অধিকার ও জীবনমান উন্নয়ন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মেহনতি শ্রমজীবী মানুষ এর সুফল পাচ্ছেন।

শিল্প-কলকারখানার সামগ্রিক উন্নয়নে প্রয়োজন মালিকের সদিচ্ছা, শ্রমিকের একাগ্রতা এবং পারস্পারিক আন্তরিকতা। সকল পক্ষের ইতিবাচক ও সৌহার্দপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে শ্রমিক-মালিকের মধ্যকার বিদ্যমান আন্তরিক সম্পর্ক অব্যাহত রেখে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্পোদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিকের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য।

মহান মে দিবসের সাথে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার,স্বার্থ ও কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মে দিবসের তাৎপর্য এখনও বিশ্বে সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সকলে এগিয়ে আসবেন, মহান মে দিবসে এ প্রত্যাশা করি।

আমি মহান মে দিবস ২০১৬ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৮ বৈশাখ ১৪২৩
০১ মে ২০১৬

মহান মে দিবস শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি। তাঁদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৮৮৬ সালের এ দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা আত্মাহুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার। আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আরেকদিকে শোষিত- আমি শোষিতের পক্ষে"। তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মানের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

আমরা বিএনপি-জামাত জোট আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানাসমূহ চালু করেছি। পোষাক শিল্পসহ ৩৮টি শিল্প খাতের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী ঘোষণা করেছি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-কে যুগোপযোগী ও আধুনিক করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত "বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫" প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিগত বছরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও কার্যক্রম আরও সুদৃঢ় হয়েছে। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধনী) আইন, ২০১৩ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা এবং গৃহকর্মীদের জন্য সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। শিল্প কারখানায় বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে সার্বিক নিরাপত্তা সন্তোষজনক রাখার লক্ষ্যে মানসম্মত ও যথাযথ পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি। ইতোমধ্যে ৩ হাজার ৭৪৬টি গার্মেন্টস পরিদর্শন সমাপ্ত হয়েছে।

দেশের শিল্প খাতের উন্নয়নে সরকারের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে আমরা 'কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তর'কে অধিদপ্তরে উন্নীত করেছি। এর জনবল তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনবল বৃদ্ধি করেছি। শ্রম পরিদপ্তরকে আরও শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

আমাদের এসকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সুফল শ্রমজীবী সমাজ পেতে শুরু করেছে। আমরা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

আমি আশা করি, মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক এবং মালিক পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে কল-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও নিবেদিত হবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি মে দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রমজীবী মানুষের আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর একটি দিন মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালের পহেলা মে আমেরিকার শিকাগো শহরের "হে" মার্কেটে শ্রমিক শ্রেণী দৈনিক ৮ ঘন্টা শ্রমের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ দিনের শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ এক ঐতিহাসিক বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে। যার ফলে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আইনগত স্বীকৃতি ইতিহাসে স্থান করে নিয়ে মহান মে দিবসকে আরো তাৎপর্যময় করে তুলেছে। তাই এ বিশেষ দিনে শ্রমজীবী মানুষ যাদের দৃঢ়চেতা মনোভাব ও রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে তাদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি শ্রম বান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। দেশের এই সুবিশাল জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে দেশে ও বিদেশের শ্রম বাজারে সম্পৃক্ত করতে এবং দেশে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ উন্নয়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার সুসম্পর্ক একান্ত অপরিহার্য। তেমনি বিশ্বায়নের এ যুগে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনের সাথে জড়িত শ্রমিক শ্রেণির দক্ষতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও শিল্পের উন্নয়ন তাই একে অপরের পরিপূরক।

দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ শ্রমজীবী। আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি শ্রমঘন শিল্প। তাই শ্রমিক মালিক এ দু'য়ের মধ্যে ঐক্য না থাকলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। উন্নয়নের হাতিয়ার এই শ্রমজীবী মানুষের শোভন কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও কল্যাণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে মহান মে দিবসে ইহাই আমাদের প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার।

মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি

সভাপতি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

বাণী

আজ থেকে ১৩০ বৎসর পূর্বে ১৮৮৬ সালে শ্রমিকদের শ্রম ঘন্টা নির্ধারণ, শ্রমিকদের মর্যাদা ও তাদের ন্যায় সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা যে আত্মত্যাগ করেছিল তা স্মরণ করার অভিপ্রায়ে মহান মে দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। আমি সকল শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষকে মহান মে দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবরের মত এবারও মে দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করায় মে দিবসের অনুপ্রেরণায় সকল মেহনতি মানুষ অনুপ্রাণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ দিবসের মাহেন্দ্রক্ষণে আমি সে সকল শ্রমিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করছি যাদের রক্তে আজ শ্রমিকদের ন্যায় সংগত দাবী ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত।

একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণি। দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একজন শ্রমিক দরদী জননেত্রী। তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও নির্দেশনায় বাংলাদেশে বিদ্যমান শ্রমিক আইন সংশোধন ও বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে যুগোপোযোগি করা হয়েছে। অতীতের যে কোন সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকার বেসরকারী খাতে শ্রমিকদের কল্যাণে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা সর্বমহলে ব্যাপক প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রম বান্ধব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়।

বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শ্রমিকদের কল্যাণে নিশ্চিন্তে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগকে অবারিত করা হয়েছে ও ট্রেড ইউনিয়নকে সুরক্ষা দেয়া হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার সরকারি সুযোগকে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যেন কেবল মাত্র শ্রমিকের ও দেশের সার্বিক কল্যাণে কাজে লাগান সে জন্য আমি অনুরোধ জানাই।

শ্রমজীবী মানুষের দ্রুত কর্মসংস্থানের প্রয়াসে বর্তমান সরকার একদিকে যেমন নতুন শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করছেন ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন তেমনি অন্যদিকে ইতোপূর্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া সকল শিল্প কারখানা চালু করার পদক্ষেপ নিচ্ছেন, যা দ্রুত আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীল করছে। উল্লিখিত শিল্প-কারখানাসমূহে নিরাপত্তা জোরদার ও শ্রম কল্যাণ নিশ্চিন্তে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্যাপক মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সর্বক্ষেত্রে আমাদের নির্লোভ ও সৎ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে আমরা যেন বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারি এটাই হোক এবারের মহান মে দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
জয় হোক এ দেশের মেহনতি মানুষের।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের মেহনতি মানুষের দাবী আদায়ের স্মৃতি বিজড়িত সংহতির এক অনন্য দিন মহান মে দিবস। বিশ্বের খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে পহেলা মে এক অবিস্মরণীয় দিন। শ্রমের মর্যাদা এবং দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবীতে ১৯৮৬ সালের এ দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরের সংগ্রামী শ্রমিক ভাইয়েরা সৃষ্টি করেছিলেন আত্মত্যাগের এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করে অন্যান্য বছরের মত এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশে মহান মে দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল খেটে খাওয়া মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন "বিশ্ব আজ দু-ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক আর এক দিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে"। বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক উক্তির অন্তর্নিহিত দর্শন নিঃসন্দেহে চিরদিন শ্রমজীবী মানুষের অন্তরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের সু-বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারে সম্পৃক্ত করতে এবং দেশে শ্রমবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রমজীবীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে আমরা দ্রুত এগিয়ে নিতে চাই। এজন্য প্রয়োজন সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ, মালিক-শ্রমিকের ঐক্য ও সুসম্পর্ক এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও উন্নত ব্যবস্থাপনার সার্থক বাস্তবায়ন। তাইতো এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে -

"মে দিবসের মর্মবাণী,
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

দক্ষ জনশক্তি তৈরি, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুশ্রম নিরসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যায্য মজুরি প্রদান এবং লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ে উন্নীত করাই হোক এবারের মে দিবস উদযাপনে আমাদের অঙ্গীকার।

(মিকাইল শিপার)
সচিব

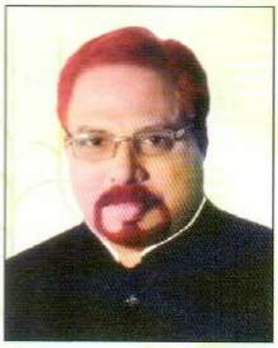

সভাপতি
জাতীয় শ্রমিকলীগ

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমিকের আত্মমর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার ও শ্রমের ন্যায্য দাবী আদায়ের এক অনন্য ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য স্মরণীয় দিন। মে দিবস মানেই শ্রমিকের অহংকার, মে দিবস মানেই শ্রমিকের জ্বলে উঠার দিন। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যুগে যুগে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন আমি তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের দেশে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করার ব্যাপারে অনেক দেশের তুলনায় অনেক অগ্রসর। পৃথিবীর অনেক দেশে এখনো এ দিবসটি সরকারী ছুটি হিসাবে পালিত হয় না। আমাদের দেশে এ দিবসটি সরকারী ছুটির দিন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মে দিবসের চেতনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে শ্রমিক শ্রেণী স্বাধীনতা অর্জনের মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। অসংখ্য শ্রমিক কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। অসংখ্য শ্রমিকের পরিবার ধ্বংস হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার মোকাবেলায় শ্রমিক সমাজের অবদান অনস্বীকার্য।

জাতীয় শ্রমিক লীগের দাবীর প্রেক্ষিতে জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকদের চাকুরীর বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছর করার অঙ্গীকার করেন এবং পরবর্তীতে তা বাস্তবায়ন করেন। বর্তমান সরকার শ্রম বান্ধব সরকার। বাংলাদেশে শ্রম আইন ২০০৬ এর সংশোধন বা যুগোপযোগীকরণ, ৩য় জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন, জাতীয় গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন, শ্রম অসন্তোষ নিরসনে ও শিল্পের নিরাপত্তার জন্য শিল্প পুলিশ গঠন, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের জন্য বহুমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, ৪২টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৩৮ (আটত্রিশ) টি শিল্প সেক্টরের মজুরী নির্ধারণ ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য অবদান।

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। সুখী সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক শ্রমিক সকলের প্রয়াস একান্তভাবে আবশ্যক। শ্রমজীবীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করে সুখী ও সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডকে আমরা দ্রুত এগিয়ে নিতে চাই।

আলহাজ্ব শুকুর মাহামুদ

মহান মে দিবস, ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান মে দিবস, ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অবিস্মরণীয় দিন। আজ থেকে ১৩০ বছর পূর্বে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রম ঘন্টা নির্ধারণ, শ্রমিকের মর্যাদা ও ন্যায় সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমিকরা যে আত্মত্যাগ করেছিল তা স্মরণের মাধ্যমে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ও মে দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রতি বছরের মত এবারও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তরের সহযোগিতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে মহান মে দিবস উদযাপন করছে ।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিঃ তারিখ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো উন্নীতকরণ, দেশী বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যোগ্য মেধাবী, প্রশিক্ষিত, কর্মদক্ষ, পরিদর্শক তৈরী করে কলকারখানায় পরিদর্শনে গুনগতমান বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে ।

কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সুস্থ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, ন্যূনতম মজুরী বাস্তবায়ন, পাশাপাশি শ্রমিক ও মালিকের মধ্য পারস্পারিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অপরিসীম ভূমিকা রেখে চলছে ।

মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে শ্রমিক ও মালিক পারস্পারিক সু-সম্পর্ক বজায় রেখে কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে দেশের শিল্প পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর।

মহান মে দিবসে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রম ক্ষেত্রের সকল সমস্যার বাস্তব সম্মত সমাধানের মাধ্যমে নিরাপদ ও আন্তরিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়িত হোক।

মহান মে দিবস সফল হোক।

(সৈয়দ আহম্মদ)

শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ মহান মে দিবস।
বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের সংহতির দিন, বিজয়ের দিন, আনন্দ ও উৎসবের দিন। আজকের দিনে বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানাচ্ছি।

প্রতি বছরের মত এবছরও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মহান মে দিবস উদযাপন করছে। শ্রমক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে এবারের মহান মে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে–

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

বিশ্বায়নের বর্তমান প্রতিযোগিতায় নিজ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন। বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদনের মূল শর্ত বা চাবিকাঠি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী, মানসম্মত কর্মপরিবেশ, সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। মালিক বা শ্রমিকের একক প্রচেষ্টায় এ সকল শর্ত বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। মালিক শ্রমিকের সম্মিলিত ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং পরস্পরের সহযোগিতায় শর্তগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব। বিশ্ববাজারে এদেশের পণ্যের মান বজায় রেখে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে মালিক ও শ্রমিককে সহযোগিতার লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

শ্রমিক, মালিক ও সরকারের আন্তরিক ও সফল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে প্রিয় বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলব– হোক এবারের মে দিবসের অঙ্গীকার।

(এস. এম. আশরাফুজ্জামান)

২০১৫ সালে ILO বার্ষিক সম্মেলনে ILO মহাপরিচালক Mr. Guy Rider এর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

৩২৬ তম ILO গভর্নিং বডির সভায় ILO মহাপরিচালক Mr. Guy Ryder এর সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

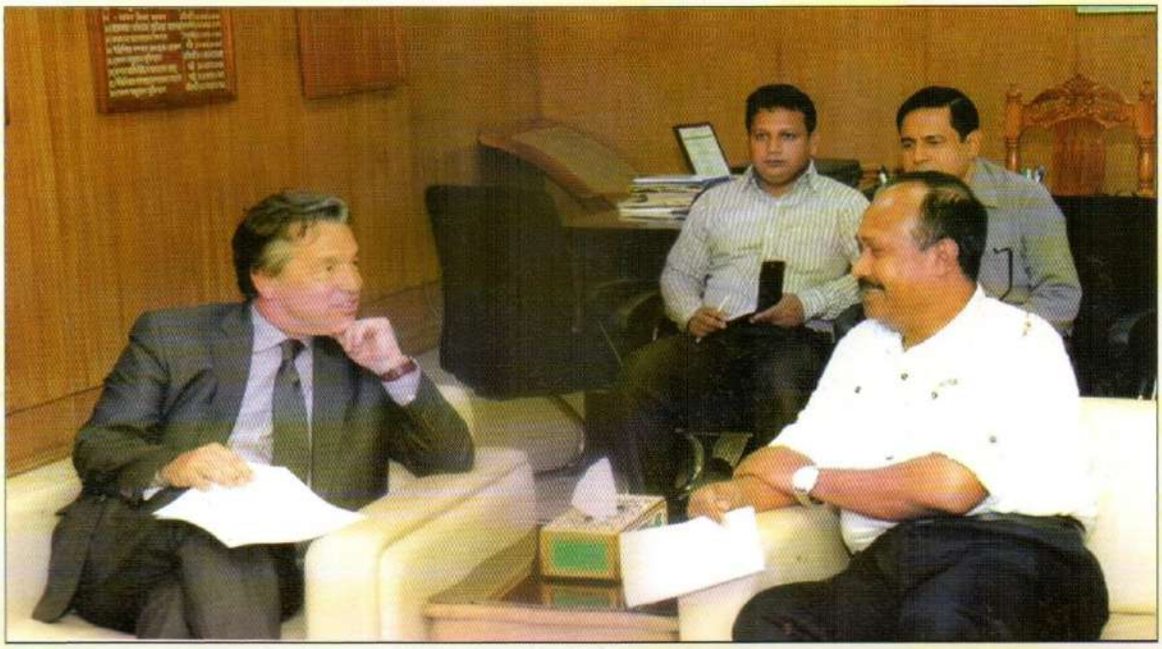

কানাডার মান্যবর হাই কমিশনারের সাথে আলোচনারত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

Country Director
ILO Country Office for Bangladesh

Message

Over the past year the Government of Bangladesh as well as employers' and workers' organizations have worked with the ILO to meet our common goal of attaining Decent Work for all.

Many milestones have been reached during this period. RMG factories are safer following the completion of structural, fire and electrical inspections. Of these, 1,549 were carried out by the national initiative supported by ILO. The priority now is for remediation work to take place without delay to ensure worker safety.

On the frontline to ensure worker safety and rights, the Department of Inspections for Factories and Establishments (DIFE) has continued its transformation into a more efficient, accountable and credible organization. The recent completion of foundational training for 160 inspectors was another important step in its reform.

A culture of Occupational Safety and Health (OSH) is being built with some 6,500 mid-level RMG managers trained to pass on OSH skills to almost 800,000 workers. Trade unions are also being supported in areas such as OSH, workplace cooperation and organizing.

The ILO/IFC Better Work programme is expanding rapidly. It now helps some 100 factories employing over 180,000 workers to improve conditions and productivity. A new initiative soon to be launched will foster increased dialogue between employers and workers to improve workplace rights and industrial relations. Meanwhile, efforts continue to develop an Employment Injury Social Protection scheme to provide timely support to workers in the event of an accident.

A skilled workforce is a productive workforce. ILO is continuing to bridge the gap between skills supply and demand as well as support efforts to help women and the disabled gain skills and employment. Furthermore, a National Skills Development System is now in place and ready for large-scale adoption.

May Day is also a time to recognise the contribution of Bangladeshi men and women working overseas. ILO has supported the government to create a stronger foundation for the overall management of labour migration. I am happy to announce that a new programme has recently been launched to build on these achievements.

In New York last September, world leaders came together to launch the 2030 Agenda for Sustainable Development, Goal 8 of which is to achieve Decent Work and Economic Growth. Together we must strive to achieve this ambitious target for our efforts will greatly benefit Bangladesh and all Bangladeshis.

I sincerely wish everyone a happy May Day.

Srinivas B. Reddy

সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

বাণী

প্রতি বছর মে দিবস ফিরে আসে। একশত ত্রিশ বছর পূর্বের ঘটনা। আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের মকরম্যাক রীপার ওয়ার্কাস নামের শিল্প প্রতিষ্ঠানে আট ঘণ্টা শ্রমের দাবীতে শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে জন্ম হয় মহান মে-দিবস। এ ঘটনার প্রায় তিন বছর পর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসের ১৪ তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশ। এ সমাবেশে মে মাসের ১ তারিখে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার এ দিবসটিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছে এবং প্রতি বছর দিবসটি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়ে আসছে।

মহান মে-দিবস স্মরণ করে বলতে হচ্ছে যে বিনিয়োগ না হলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না। তেমনিভাবে নিষ্ঠার সাথে শ্রম না দিলে শিল্পের উৎকর্ষ ঘটে না। অর্থাৎ মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ না হলে শিল্পোন্নয়ন হয় না এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে উন্নয়নের গতিধারা বৃদ্ধি পায়, বেকারত্ব দূর হয় এবং বাণিজ্য কর্মকাণ্ডের পরিধি বিস্তৃত হয়। সুতরাং শ্রমিক ও মালিক একে অপরের সমস্যা উপলব্ধির মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। সরকার শিল্পোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করুক, আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিধারা বেগবান হোক–এ প্রত্যাশা রইল।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

সালাহউদ্দীন কাসেম খান

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে আলোচনারত মাণ্যবর মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া ব্লুম বার্নিকাট মধ্যখানে উপবিষ্ট রয়েছেন শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

মায়ানমারের ইয়াঙ্গুনে অনুষ্ঠিত GITI Regional Conference on Transparency in the Global Garment Sector সম্মেলনে বক্তব্যরত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

Rana Plaza two years on: Toward a safer RMG Sector for Bangladesh অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শ্রম সচিব।

CPD কর্তৃক আয়োজিত FES Dialogue on Bangladesh Apparels Sector : Dose Margin Matter in Ensuring Compliance: অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

২০১৫ সালে জেনেভায় ILO এর বার্ষিক সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দল।

৩২৬ তম ILO গভর্নিং বডির সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

National Workshop on Strengthening Labour Inspection in Bangladesh : Role of Workers শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

Fundamental Training Programme For Labour Inspectors এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি , শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার এবং U.K ও CANADA এর হাইকমিশনার বৃন্দ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মান্যবর রাষ্ট্রদুত মার্সিয়া ব্লুম বার্নিকাটের সাথে আলোচনারত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট কোম্পানীর profit sharing এর চেক প্রদান অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

Rana Plaza two years on: Toward a safer Sector for Bangladesh অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি, সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও সাবেক উপদেষ্টা বেগম সুলতানা কামাল।

লন্ডনে British Council কর্তৃক আয়োজিত Skills Development Programme এ উপস্থিত মাননীয় প্রতি মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল।

হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শ্রম বিষয়ক কর্মশালায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২০১৫ সনে অনুষ্ঠিত ILC তে DG, ILO এর সাথে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল।

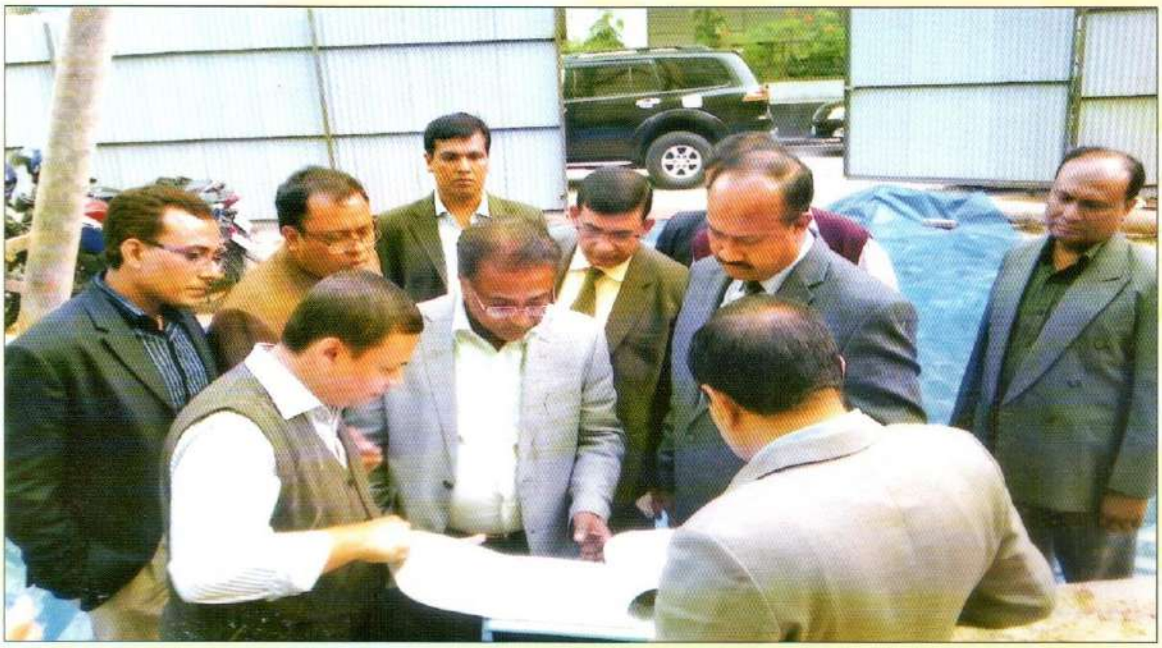

"শ্রম ভবন নির্মাণ" প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি, শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

গোষ্ঠী বীমার ক্ষতিপূরণের অর্থ হস্তান্তর করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী।

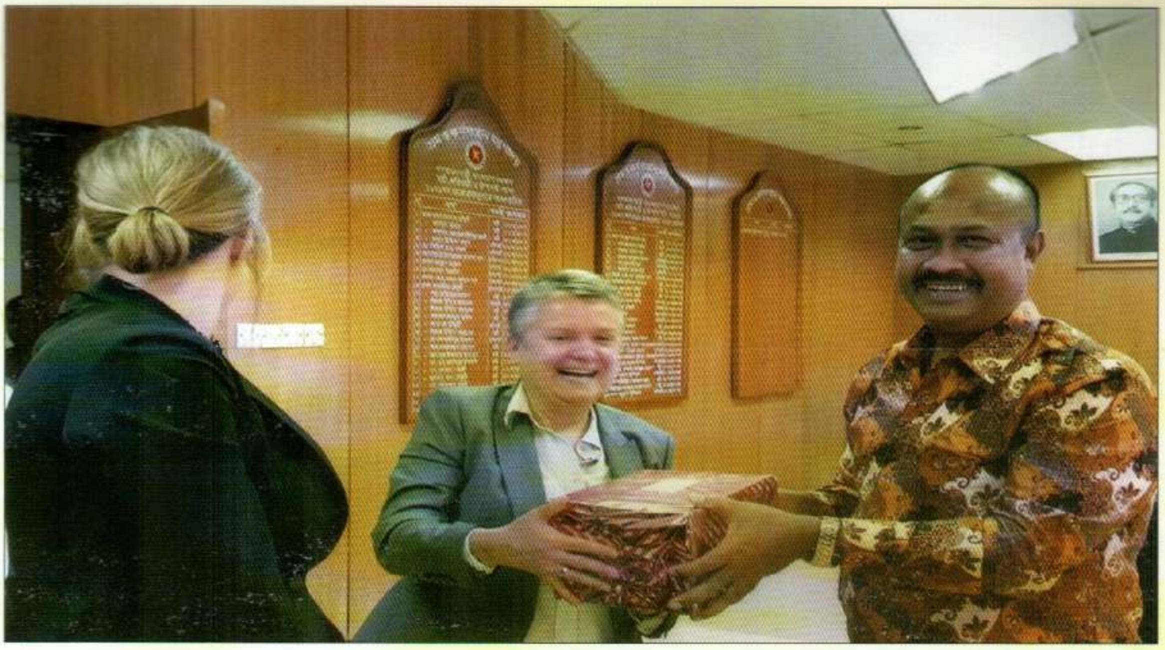

ILO Direct Contact Mission প্রতিনিধির সাথে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী ।

ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সভায় মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী ও শ্রম সচিব।

জার্মান সরকারের সাথে কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে শ্রম সচিব।

বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস' ২০১৫ এর জাতীয় সেমিনার।

আন্তর্জাতিক ত্রি-পক্ষীয় সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিকাইল শিপার ও বাংলাদেশের মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধি।

ACCORD এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সাথে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

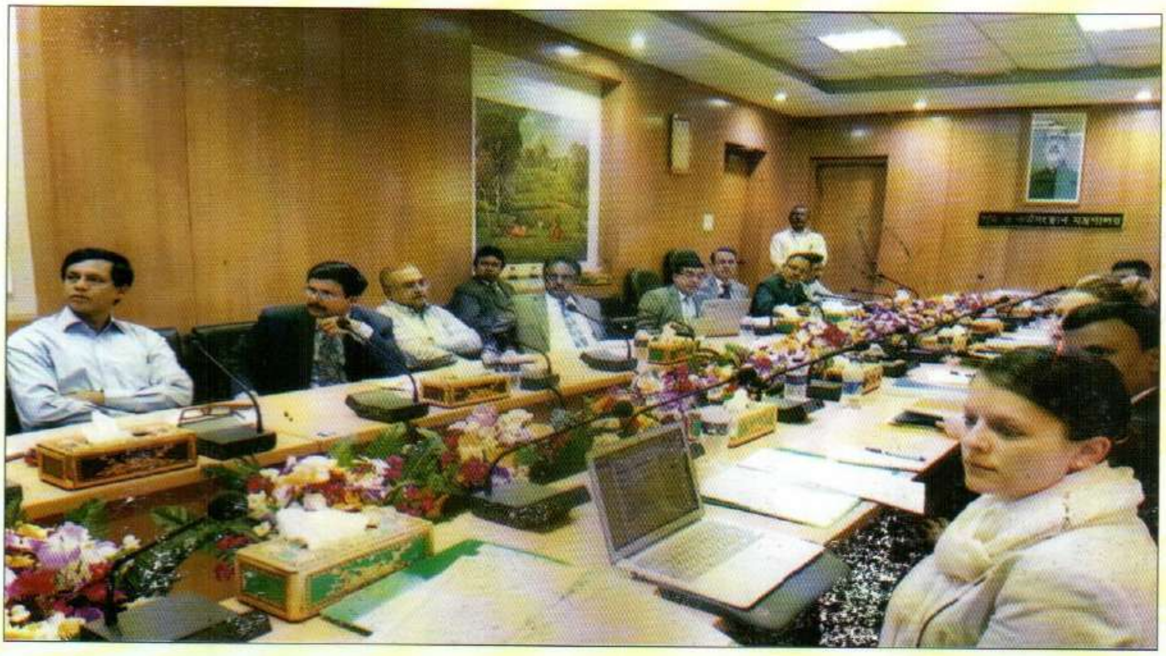

ILO ত্রি-পক্ষীয় মিশনের প্রতিনিধি দলের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে সভা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গাজীপুর জেলা কার্যালয় উদ্বোধনে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

ILO ত্রিপক্ষীয় মিশনের সাথে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি ও অন্যান্য কর্মকর্তা।

Canadian ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলের সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা।

বিজিএমইএ কর্তৃক আয়োজিত RMG সেক্টরে প্রতিবন্ধিদের কর্মসংস্থান বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে সুইডেনের সাথে শ্রম বিষয়ক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করছেন DG, ILO, সুইডেনের উন্নয়ন বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী এবং শ্রম সচিব। উপস্থিত আছেন সুইডেনের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

সিপিডি কর্তৃক আয়োজিত পোষাক শিল্পে কর্মপরিবেশ বিষয়ক সংলাপে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব ইসরাফিল আলম এম.পি ও শ্রম সচিব ।

নতুন নিয়োগকৃত কারখানা পরিদর্শকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রম সচিব।

ন্যাশনাল OSH প্রোফাইল বিষয়ক কর্মশালায় মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী ও মালিক, শ্রমিক এবং ILO প্রতিনিধিবৃন্দ।

বিজিএমইএ কর্তৃক আয়োজিত কারখানা নিরাপত্তা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী।

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
১	মে দিবসের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে পাকিস্তানসহ সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হোন	ঃ শাজাহান খান, এম.পি	০১-০৪
২	ক্ষমতার অংশীদারিত্ব গণতন্ত্রের ভিত্তি	ঃ শিরীন আখতার, এম.পি	০৫-০৭
৩	নীটওয়্যার শিল্পখাত ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণ	ঃ এ,কে,এম সেলিম ওসমান, এম.পি	০৮-১৭
৪	মে দিবসের মর্মবাণী, শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি	ঃ এস,এম,আশরাফুজ্জমান	১৮-১৯
৫	মহান মে দিবস ও শিল্পের বিকাশ	ঃ সালাহউদ্দীন কাসেম খান	২০-২১
৬	বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ও বিজিএমইএ'র শ্রমিক কল্যাণ কর্মসূচি	ঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	২২-২৪
৭	OSH: একটি পর্যালোচনা	ঃ মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া	২৫-২৯
৮	বাংলাদেশের শ্রমিক কল্যাণে মহান মে দিবস	ঃ আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ	৩০-৩১
৯	শ্রমের সেকাল একাল	ঃ এস, এম, জাহেদুল করিম	৩২-৩৩
১০	মে দিবসঃ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আর শেখ হাসিনার এগিয়ে চলা	ঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বীর মুক্তিযোদ্ধা)	৩৪-৩৬
১১	শিক্ষা, দক্ষ জনশক্তি ও টেকসই উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ঃ কাজী শাহজাহান	৩৭-৩৯
১২	শ্রমিকদের দাবী আদায়ের মাধ্যমেই শিল্প ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব	ঃ ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান	৪০-৪২
১৩	ভিয়েতনামঃ উন্নয়নের এক রোল মডেল	ঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন	৪৩-৪৪
১৪	মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ	ঃ ফজলুল হক মন্টু (বীর মুক্তিযোদ্ধা)	৪৫-৪৬
১৫	শ্রমিকের আত্মমর্যাদা	ঃ রওশন জাহান সাথী	৪৭-৪৯
১৬	গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় প্রয়োজন আইন প্রণয়ন ও নজরদারি বৃদ্ধি	ঃ এডভোকেট সালমা আলী	৫০-৫১
১৭	মহান মে দিবস স্মরণে	ঃ মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা	৫২-৫৩

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
১৮	মে দিবসে আজ মনে পড়ে যায়	ঃ আব্দুল মতিন মাষ্টার	৫৪-৫৯
১৯	বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন	ঃ জনাব রায় রমেশ চন্দ্র	৬০-৬৬
২০	মে দিবসের চেতনা ও শিল্পোন্নয়ন	ঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী	৬৭-৬৮
২১	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মহান মে দিবসের তাৎপর্য	ঃ মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া	৬৯-৭১
২২	"মহান মে" দিবসের তাৎপর্য	ঃ এডভোকেট মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান	৭২-৭৩
২৩	শ্রমিক দিবস ও বঙ্গবন্ধু	ঃ জেড এম কামরুল আনাম	৭৪-৭৫
২৪	মে দিবসের চেতনার নিরিখে নৌ-যান শ্রমিকদের জীবন ও সংগ্রাম	ঃ চৌধুরী আশিকুল আলম	৭৬-৭৮
২৫	উন্নত অর্থনীতি ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ	ঃ নইমুল আহসান জুয়েল	৭৯-৭৯
২৬	শিল্প সম্পর্ক বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরাপদ ও সবুজ কাজের ভূমিকা	ঃ এ.আর. চৌধুরী রিপন	৮০-৮২
২৭	মে দিবসের চেতনা বনাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	ঃ কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ	৮৩-৮৪
২৮	মে দিবস ও বর্তমান বিশ্ব	ঃ এম এ রশীদ	৮৫-৮৬
২৯	শিশুশ্রম প্রতিরোধ বিষয়ক এ্যাডভোকেসী কর্মশালা	ঃ মোঃ ইসরাফিল আলম, এম.পি	৮৭-৮৯
৩০	কৃষি শ্রমিকের রক্তে প্লাবিত সোহাগপুর	ঃ খান আখতার হোসেন	৯০-৯২
৩১	মহান মে দিবসের চেতনায় নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও শ্রম অধিকার সুরক্ষা হউক	ঃ আমিনুল হক ফারুক	৯৩-৯৪
৩২	শ্রম পরিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড	ঃ এস,এম, এনামুল হক	৯৫-১০০
৩৩	স্ব-নির্ভর বাংলাদেশের প্রয়োজনেই শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক	ঃ আলমগীর মজুমদার	১০১-১০৩
৩৪	উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শোভন কাজ	ঃ শহীদুল্লাহ বাদল	১০৪-১০৪

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
৩৫	মহান মে দিবস ও বিশ্ব নারী দিবস	ঃ মোঃ খোরশেদুল হক ভূঁঞা	১০৫-১০৬
৩৬	মে দিবসঃ শ্রমিকের ন্যায্য মানবাধিকার ও সংগ্রামের অবিস্মরণীয় মাইল ফলক	ঃ সিরাজুল ইসলাম রনি	১০৭-১০৭
৩৭	শিল্পায়নজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা ও উত্তরণ	ঃ ডাঃ আবু সালেহ মুহাম্মদ রিয়াজী	১০৮-১০৯
৩৮	আমরাই পারি	ঃ মাসুদা সুলতানা	১১০-১১২
৩৯	জার্মানীতে Workers Council এবং বাংলাদেশে অংশগ্রহণকারী কমিটিঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা	ঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম	১১৩-১১৪
৪০	শ্রমিকের সাফল্যের অন্তরালে	ঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	১১৫-১১৬
৪১	আমার পতাকা (কবিতা)	ঃ মোহাম্মদ আলী খান	১১৭-১১৭
৪২	আমাদের নাম (কবিতা)	ঃ মুহম্মদ কামরুজ্জামান ফিরোজ	১১৮-১১৮
৪৩	নবগানে নবপ্রাণে (কবিতা)	ঃ উম্মে আছমা শিখা	১১৯-১১৯
৪৪	বাংলাদেশের শ্রম আইনে নারী শ্রমিকের অধিকার	ঃ মোঃ শফিকুর রহমান	১২০-১২৩
৪৫	গরীবের বস্ত্র (কবিতা)	ঃ বেগম সুমাইয়া সফি	১২৪-১২৪
৪৬	Child Labour in Bangladesh	ঃ Mr. Mahabbat Hossain	১২৫-১২৬
৪৭	বাংলার শ্রমিক (কবিতা)	ঃ তানিয়া ইয়াসমিন	১২৭-১২৭
৪৮	মে দিবস গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমাজ বদলের চেতনা	ঃ রাজেকুজ্জামান রতন	১২৮-১২৯
৪৯	দক্ষ শ্রমিকই অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার	ঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	১৩০-১৩১
৫০	উন্নত দেশ গঠনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০০৯ থেকে ২০১৬	ঃ মিকাইল শিপার	১৩২-১৪৩

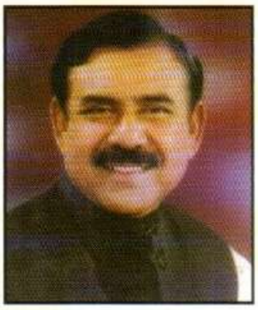

মে দিবসের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে পাকিস্তানসহ সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হোন

শাজাহান খান, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

পহেলা মে আজ শুধু শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দিনই নয়, বিশ্বের সকল শোষিত, নিপীড়িত জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচেতন ও সংগ্রামের দিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই মহান মে দিবসে শ্রমজীবী মানুষ অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়। মহান মে দিবসে শ্রমিকদের অবদান, আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতি ও অমরগাঁথা ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে।

মহান মে দিবসের সংগ্রামের ইতিহাস-শ্রমিকের শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের ইতিহাস। ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকদের অনুষ্ঠিত সমাবেশে মালিকদের লেলিয়ে দেয়া পুলিশের গুলিতে অসংখ্য শ্রমিক নিহত হয় । সৃষ্টি হয় এক রক্তঝরা ইতিহাস। প্রতিষ্ঠিত হয় দুনিয়াব্যাপী শ্রমিকদের জন্য ৮ঘন্টা কাজের সময়।

বিশ্বের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের বহু সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু ১ মে শ্রমিকের রক্তদানের ইতিহাস আজও মানুষকে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে। সংগ্রামের ইতিহাসের ধারায় যেখানে অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন, সন্ত্রাস এবং যেখানে মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব করে, সেখানেই মানুষ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে। বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের আন্দোলন ও সংগ্রাম ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

১৯৬৬ সালে স্বাধীকার আন্দোলনে তেজগাঁও'এর শ্রমিক মনু মিয়ার রক্তদান, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক' লিখে সড়ক পরিবহন শ্রমিক নুর হোসেনের রক্তদান, ১৯৯৬ সালে গণআন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে সরকার পরিবর্তন হয়। সরকার আসে সরকার যায়। প্রত্যেক সরকারের মতাদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড এক নয়। শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষের প্রতি দরদ এক নয়। আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের দলসমূহের সমন্বিত সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৯৮৪ সালে ছিল ৫৭০/- টাকা, দশ বছর পর ১৯৯৪ সালে করা হয় ৯৩০/- টাকা, এর ১২ বছর পর ১৯৯৬ সালে করা হয় ১৬৬২/- টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে ২০১০ সালে তা বৃদ্ধি করে ৩০০০/- টাকা ধার্য করেন। এর তিন বছর পর তা পুনরায় বৃদ্ধি করে ২০১৩ সালে ৫৩০০ টাকা পুন:নির্ধারণ করেছেন। তিনি গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের সমস্যা দূর করার জন্য নাম মাত্র সুদে মালিকদের ব্যাংক ঋণ দিয়ে ডরমেটরি করার সুযোগ দিয়েছেন। সকল রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) নারী শ্রমিকদের জন্য সরকারিভাবে ডরমেটরি নির্মাণ করছেন। ইপিজেড এর কারখানায় শ্রমিক কল্যাণ সমিতির বিধান রেখে বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন-২০১৬ মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন হয়েছে। এর ফলে ইপিজেড শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকরা অর্জিত ছুটি নগদায়ন, মূল বেতনের

সমপরিমাণ বছরে দু'টি উৎসব বোনাস, পূর্ণ বেতনে প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা, দুর্ঘটনার কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মৃত্যুজনিত দুই লাখ টাকা এবং স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার কারনে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা দেয়া হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রম কল্যাণ তহবিল গঠন করে দুস্থ, অসহায়, মৃত শ্রমিকদের আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন। এর মধ্যে দিয়েই প্রমানিত হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষকে ভালবাসেন এবং তার সরকার শ্রম ও শিল্প বান্ধব সরকার। তিনি দেশকে ভালবাসেন, জনগণকে ভালবাসেন এবং আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে কাজ করে চলেছেন। তাঁর সরকারের বিগত মেয়াদ কালেই সকল সেক্টরের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অপরদিকে ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় এলে পবিত্র রমজান মাসে গার্মেন্টস শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করলে খালেদা জিয়ার সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ১৭জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে। ২০০১ সালে বিএনপি'র নেতা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্টস শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করলে খালেদা জিয়ার সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে পবিত্র রমজান মাসে ২ জন শ্রমিককে হত্যা করে।

সরকারে থাকা অবস্থায় খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত যেমন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে শ্রমিক শ্রেণিকে হত্যা করেছে, তেমনি ক্ষমতার বাইরে এসে ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০১৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৯২জন ড্রাইভার ও হেলপারকে হত্যা করেছে। তারা গার্মেন্টস শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক, বালুর ট্রাকের শ্রমিক, ব্যাংক কর্মচারি, বীমা কর্মচারি, হকার, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক কর্মী, জনপ্রতিনিধি, নারী-শিশুসহ অসংখ্য যাত্রীদের বোমা, পেট্রোল বোমা মেরে, পুড়িয়ে, পিটিয়ে, কুপিয়ে হত্যা করেছে। পেট্রোল বোমায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছে প্রায় ৪০০ শ্রমজীবী মানুষ। অনেক কর্মজীবী মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

পেট্রোল বোমা, গান পাউডার দিয়ে কয়েক হাজার গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, ভাংচুর করা হয়েছে অসংখ্য গাড়ি। রেললাইনের ফিসপ্লেট তুলে রেল দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। পেট্রোল বোমায় রেলগাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষ্টীমার ও লঞ্চে আগুন দিয়েছে। ৬০ হাজার গাছ কেটে পরিবেশ নষ্ট করেছে। পবিত্র কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ, মসজিদের জায়নামাজ আগুনে পুড়িয়েছে। গরীব হকারদের মালামাল লুট করেছে, পুড়িয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মন্দির বাড়িঘর ভাংচুর করেছে। নারীদের সম্ভ্রমহানি করেছে। ভোট কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত ৫২৩টি প্রাইমারি স্কুল ও আসবাবপত্র পুড়িয়েছে। প্রিজাইডিং অফিসার হত্যা করেছে। ভোটারদের পায়ের রগ কেটেছে। জাতীয় পতাকা পুড়িয়েছে, শহীদ মিনার ভেঙ্গেছে, বাড়ীঘর, পত্রিকা অফিসে আগুন দিয়েছে।

এসব ধ্বংসাত্মক, সন্ত্রাসি ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড করার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা খর্ব করা, যুদ্ধাপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের রক্ষা করা এবং বাংলাদেশকে অকার্যকর করে জঙ্গী, সন্ত্রাসি ও ধর্মান্ধ রাষ্ট্রে পরিনত করা।

বিএনপি জামাতের তাণ্ডবে নিহত ও আহত ড্রাইভার, হেলপার, যাত্রী হিসেবে শিশু, নারী এবং ক্ষতিগ্রস্থ গাড়ির মালিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। আরো অনেকের অনুদানের বিষয়টি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অথচ বিএনপি নেতা খালেদা জিয়া অনুদান দেয়া তো দূরের কথা মানবিক কারণে দুঃখ ও অনুশোচনা প্রকাশ করেনি; বরং তিনি সন্ত্রাসিদের অর্থ অনুদান দিয়ে সন্ত্রাসিদের উৎসাহিত করেছেন।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুটমিলসহ প্রায় ৫ হাজার মাঝারি, ছোট, বড় কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্মচারি বেকার হয়েছে ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। অসংখ্য শহীদ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আজীবন শ্রমিকদের কল্যাণে ও তাদের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। তিনি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে পাকিস্তানী ও তাদের দোসরদের পরিত্যক্ত কলকারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে চালু করে শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সমবায় সমিতি গঠন করে ১০০টি ট্রাক সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের মালিকানায় দিয়ে তাদের আয় বর্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও বঙ্গবন্ধুর মত একজন শিল্প ও শ্রমিক দরদী মানুষ। ১৯৯৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১১টি টেক্সটাইল মিলের মালিকানা শ্রমিক-কর্মচারীদের দিয়েছিলেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান শ্রমিক বান্ধব সরকার খালেদা জিয়ার সরকার কর্তৃক বন্ধ হওয়া কলকারখানাগুলো একে একে চালু করছেন। ইতোমধ্যে ৫টি পাটকল চালু করেছেন।

এতে বহু শ্রমিক কর্মচারির চাকরির সংস্থান হয়েছে। এরই মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া বাবদ এক হাজার ২৫ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে কলকারখানাগুলোর নেওয়া ঋণ বাবদ আরো তিন হাজার কোটি টাকা সরকার মওকুফ করেছে।

বিগত চার দলীয় জোট সরকারের সময়, শ্রম আইন ২০০৬ সংসদে পাশ হয়েছে। সে আইনে শ্রমিক স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি। উক্ত আইনের উপর আমি ৫৬টি সংশোধনী সংসদে উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু তৎকালীন সরকার সংসদে আমাকে এক মিনিটের জন্যও কথা বলতে দেয়নি। এমনকি তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকেও কথা বলতে না দেয়ায় আমরা উক্ত আইনের বিরোধিতা করে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছিলাম। ৪ দলীয় জোট সরকার একতরফাভাবে সে আইন সংসদে পাশ করেছিল। বাংলাদেশের সকল শ্রমিক সংগঠন তা প্রত্যাখান করেছিলো। পরবর্তিতে শ্রমিকদের স্বার্থে শেখ হাসিনার শাসনামলে গত মেয়াদে ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকার শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন। শ্রমিক দরদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার শ্রমিকদের চাকুরীর বয়স সীমা ৬০ বছর করেছেন।

শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের এত অর্জন সব ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানিদের মদদে বিএনপি-জামাতের জঙ্গি ও সন্ত্রাসি তৎপরতা চালাচ্ছে। আর পাকিস্তান চালাচ্ছে কুটনৈতিক অপতৎপরতা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। সেজন্য আজ প্রয়োজন পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার শ্রমিক, কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধা সহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এ লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধি সেনাদের বিচার, পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা ৩৫ হাজার কোটি টাকা ফেরত আনা, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়, ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের সাথে সম্পাদিত দিল্লী চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সালের পাকিস্তানের কৃতকর্মের জন্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বন্ধ করতে বাধ্য করাসহ বাংলাদেশের শ্রমিক-কর্মচারী-পেশাজীবী-মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ গণবিচার আন্দোলনের ২১ দফা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে চলমান আন্দোলনকে বেগবান করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিচালিত সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করা সকলের দায়িত্ব।

যুদ্ধাপরাধিদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হবার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আবারো গভীর ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তাদের এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত প্রতিহত করার প্রত্যয় নিয়ে "আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ গণবিচার আন্দোলন" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ২১ দফা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছে। বিএনপি-জামাত ও পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এই সংগঠন আন্দোলনের কার্যক্রম শুরু করার ফলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এখন বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে।

২০০৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধী মানবতাবিরোধীদের বিচার করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি স্বাধীনতার পক্ষের দলগুলো নিয়ে গড়ে তোলেন মহাজোট। বাঙ্গালি জাতি এতে উৎসাহিত হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ টি আসনের মধ্যে বিপুল ভোটে ২৬২টি আসনে জয়ী হয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার গঠিত হয়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামাত জোট ৩৫ টি আসনে জয়লাভ করে এবং অন্যরা পায় ৩ টি আসন।

শেখ হাসিনা সরকার গঠন করে প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পূর্বঘোষিত ফাঁসির রায় কার্যকর করেন। 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন ১৯৭৩'-এর ভিত্তিতে গঠন করেন "আন্তর্জাতিক মানবতা বিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল"। এ ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায়ের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে কাদের মোল্লা, কামরুজ্জামান, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও মুজাহিদের ফাঁসি হয়েছে। আরো কয়েকজনের রায় কার্যকর অপেক্ষায় আছে। এর ফলে বাংলাদেশের মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করছে।

এবারের মে' দিবসের চেতনা হলো-শ্রমজীবী মানুষের অর্জন সুসংহত রাখা, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা, দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সেই সাথে সত্য, ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। আজ বাংলাদেশের শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষ এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত ও ঘোষিত রায় কার্যকর করা, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মান্ধতাকে মোকাবেলা করা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের চেতনাকে শানিত করে পাকিস্তান এবং তাদের দোসর বিএনপি-জামাত ও স্বাধীনতা বিরোধি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হবে। শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ আজ এগিয়ে চলেছে। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবেই-ইনশাআল্লাহ্।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
দুনিয়ার মজদুর এক হও,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

ক্ষমতার অংশীদারিত্ব গণতন্ত্রের ভিত্তি

শিরীন আখতার, এমপি
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
সদস্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ

মানব সভ্যতার উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মহান মে দিবস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পৃথিবীর উন্নয়ন সংগ্রামের ইতিহাসে মে দিবস শোষিত শ্রেণির প্রেরণার উৎস। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস অর্থাৎ এই মহান মে দিবস শ্রমিকের শ্রমের মর্যাদা ও মানুষের আত্মসচেতনতার দীপশিখা। ১৮৮৬ সালের ১লা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে শ্রমিক আন্দোলনে রক্তের বিনিময়ে সেদিন শ্রমিকরা শুধু কার্যসময় সম্পর্কিত অধিকারের স্বীকৃতিই পায়নি, পেয়েছে মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা। তেমনিভাবে মে দিবসের শ্রমিক আন্দোলনের পরে শ্রমিকেরা তাদের আন্দোলন শুধুমাত্র জীবন জীবিকার স্বার্থেই করেননি। পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমিকেরা তাদের স্বাধীকার, গণতন্ত্র, ভাষা, অর্থনৈতিক ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামেও অবদান রেখেছে। এই শ্রমিকদের আমরা দেখেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে। গ্রামীণ ও শহুরে মজদুর-ছাত্র-নারী শ্রমিকদের যৌথভাবে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছে সেটা আমরা সবাই জানি।

আমাদের কাছে মে দিবস সবসময় নতুন করে উদ্দীপ্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা। আমরা প্রতিবছর মহান মে দিবস পালন করি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মপ্রেরণা ও বেচেঁ থাকার ন্যায্য হিস্যা নিয়ে কথা বলি। নতুন ও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে শ্রমিকের মজুরি, শ্রমসময়, শ্রমপরিবেশ, নিরাপত্তা ও অবসর সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় নিয়ে কথা বলি। শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং দাবি আদায়ের জন্য অন্দোলন সংগ্রামই আমাদের কাছে মে দিবসের চেতনা। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে শ্রমিক, নারীশ্রমিক ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনসমূহের কাছে এ সকল বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই এই দিনটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরব এবং সংগ্রামের।

এবছর মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'মে দিবসের মর্মবাণী, শ্রমিক-মালিক ঐক্য জানি'। প্রতিবছরই এমন কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে মে দিবস পালিত হয়। সরকার-মালিক-শ্রমিক তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিতে শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একধরনের ঐক্য গড়ে তুলবার প্রক্রিয়া থেকে এ জাতীয় প্রতিপাদ্যগুলো বিবেচিত হয়। মানবসমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটাতে সমাজের যৌথ উদ্যোগ দরকার। এই যৌথ উদ্যোগ তখনই সম্ভব যখন স্বীকৃত দ্বন্দ্ব ও সংকটগুলো চিহ্নিত করা যায় এবং তা সমাধানের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। কথার আড়ালে সংকট মোচনে কোন কালপথ সমাধানের আলো দেখাতে পারে না। বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান মহাজোট সরকার এবং তার প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা এ সম্ভাবনার দ্বার খুলতে এক বিশাল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর যে স্বপ্ন বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়বার, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার তারই অঙ্গীকার সমৃদ্ধময় বাংলাদেশ।

প্রতিদিন লক্ষাধিক শ্রমিক তাদের ঘামে ভেজা শ্রমে গড়ে তুলছে দেশের এই সমৃদ্ধ অর্থনীতি। যেখানে তৈরি পোষাক শিল্প জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে সেখানে আজও অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকেরা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। এখনও শ্রমিকদের নায্যমজুরি, কর্মসংস্থান, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা ও আবাসন ব্যবস্থার জন্য লড়াই করতে হয়। রানা প্লাজা ও তাজরিন গার্মেন্টসের ক্ষত এখনো আমাদের মন থেকে শুকায়নি।

এখনো ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের পরিবারের কান্না থামেনি, অন্দোলন করছে ক্ষতিপূরণের জন্য। নির্মাণকালীন দুর্ঘটনা, ভবন ধ্বসসহ অনিরাপদ কর্মপরিবেশ ও অসাবধানতাবশতঃ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্মাণ শ্রমিকের। কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে আবার কোথাও পাচ্ছে না। গত কয়েক বছরে শতাধিক চাতাল শ্রমিক বয়লার বিস্ফোরণে ও কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছে। দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হচ্ছে রাসায়নিক শিল্প কারখানার শ্রমিকেরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেই ক্ষতি পরিমাপের কোন ব্যবস্থা । ক্ষতিপূরণ প্রচেষ্টার বাস্তবতা অনুদানের মত। নারীশ্রমিকরা লড়াই করছে সমমজুরির জন্য। নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারিনি তাদের জন্য। এখনো নারীশ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে অমর্যাদার শিকার হচ্ছে। ছয়মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির কথা আইনে থাকলেও অনেক প্রতিষ্ঠান তা যথাযথভাবে মানছে না। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশু কক্ষ বা শিশু পালন কেন্দ্র থাকার কথা থাকলেও অনেক প্রতিষ্ঠানে তা দেখতে পাওয়া যায় না। পত্রপত্রিকা খুললেই চোখে পড়ছে গৃহশ্রমিক নির্যাতনের খবর। গৃহকর্মী গুম, ধর্ষণ ও হত্যা এখন নিত্য দিনের সংবাদ।

এই যখন অবস্থা তখন শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের বিষয়টি বেশ দুর্বোদ্ধ । আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দরিদ্র ও শ্রমিকবান্ধব । তাঁর নেতৃত্বে এই সরকার শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিকদের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে; ক. তৈরি পোষাক শিল্পের ন্যূনতম মজুরি ৩০০০.০০ টাকা থেকে ৫৩০০.০০ টাকায় উন্নিত করেছে। খ. শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা প্রণয়ন এবং এই আইনের বিধান রাষ্ট্রীয়করণ ও বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাশ এবং গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে। গ. জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করেছে। ঘ. ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে। ঙ. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পাশাপাশি তাদের সুরক্ষার জন্য গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ প্রণয়ন করেছে। চ. নারীশ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ছ. শ্রমিকদের জন্য অল্প পরিসরে হলেও রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছে সরকার। ছ. বৈদেশিক শ্রমবাজারের প্রতিযোগিতায় জায়গা করে নিতে সরকার নিচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা।

সরকারের এত সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা, আইন ও উদ্যোগের পরেও কেন বাংলাদেশের শ্রমিকরা এখনও দুর্দশাগ্রস্ত? আমাদের আইন আছে কিন্ত আইনের প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই বাধাগস্ত। অসম ক্ষমতার সম্পর্কে আইন অনেক সময়েই অকার্যকর। শ্রমিক-কর্মচারিদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাঁদের সংগঠন ও রাজনীতি করার অধিকার অবাধ করাটা আজ বড় জরুরি। শিল্প-কলকারখানায় শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধান ৩৮ অনুচ্ছেদে সমিতি বা সংঘ করার যে অধিকার দেয়া হয়েছে, তার অধীনে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার স্বীকৃত। পাশাপাশি জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার দলিলে ২৩(৪) অনুচ্ছেদে এবং শ্রম সংস্থা (আইএলও) তে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কথা গুরুত্বের সাথে বলা আছে। বাংলাদেশের শ্রম আইন-২০০৬ এর ১৭৬ ধারায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেয়া হয়। সেখানে বলা হয়েছে, শ্রমিক এবং মালিকের সম্পর্ক অথবা শ্রমিক এবং শ্রমিকের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে সব শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সাপেক্ষে নিজস্ব পছন্দের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার থাকবে। একইভাবে মালিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারও দেয়া হয়েছে এ আইনে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে আরো সহজসাধ্য করাকে কৌশল হিসেবে নিয়ে শ্রমিককে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে সরকারকে কাজ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, কর্মক্ষেত্রে মালিক এবং শ্রমিক উভয়ই স্বাধীন। আইন দ্বারাই তারা তাদের এই স্বাধীনতা সুরক্ষা করে। শ্রমআইন বাস্তবায়ন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত করতে সংবিধানের আলোকে প্রণীত শ্রমনীতি ও আইন এবং বিধিমালা কার্যকর করাই মালিক ও শ্রমিকের মৌলিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

শোষণ, বঞ্চনা এবং বৈষম্যের নিগড় থেকে বের করে আনতে হবে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্কে শোষণ প্রক্রিয়া যত বেশি আইনের মারপ্যাচে বিদ্যমান থাকবে ততবেশি গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই দেশের উন্নয়নে যে অপার সম্ভাবনা আজ বিরাজমান তার জন্য প্রয়োজন সুস্থ ধারার মালিক-শ্রমিক সম্প্রীতি বা ঐক্য। আমাদের সকল কাজ পরিচালিত হোক এই লক্ষ্যে।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

নীটওয়্যার শিল্পখাত ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণ

এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি
সভাপতি
বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স
এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)

বিকেএমইএ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের নীট সেক্টরের উন্নতি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা ৩৯.৯৩ শতাংশ আসে নীট খাত থেকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানির পরিমান ছিল প্রায় ২৫.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮১.৭০ শতাংশ। একই সময়ে বাংলাদেশের নীটওয়্যার খাত থেকে রপ্তানির পরিমান ছিল প্রায় ১২.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানির প্রায় ৩৯.৮৩ শতাংশ এবং তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ৪৮.৭৫ শতাংশ। অন্যদিকে জিডিপিতে নীটখাতের মোট অবদান ৬.৩৮%। আর এখাতে দেশীয় মূল্য সংযোজনের পরিমান প্রায় ৮০%।

বিশ্বে যেসব দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মূলত আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীই আমাদের উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা খুবই জরুরি। আর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা স্থিতিশীলতা তৈরীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অবদান সবচেয়ে বেশী।

বাংলাদেশ বিগত দেড় দশক যাবৎ প্রায় ৬.১৫ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে; যা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধি করছে। তম্মধ্যে তৈরি পোশাক খাত মোট জিডিপির প্রায় ১৪.০৭%। একইসাথে এদেশের বিশাল জনসংখ্যার কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য হ্রাসে পোশাক শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পোশাক শিল্পে প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন শ্রমিক সরাসরি কর্মরত, যাদের মধ্যে ৮৫% নারী শ্রমিক। এছাড়াও ২০ মিলিয়ন জনসংখ্যা পরোক্ষভাবে তৈরি পোশাক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ২০১৪-১৫ বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের মধ্যে তৈরি পোশাক খাত থেকে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ২৫.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা মোট রপ্তানির ৮১.৭১%। পণ্য উৎপাদনের দক্ষতা ও পণ্যের গুনগত মানের কারণে বাংলাদেশ স্বল্পমূল্যে গার্মেন্টস পণ্য উৎপাদক ও সরবরাহকারী হিসেবে বিশ্ববাজারে পরিচিতি পেয়েছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতি ক্রমেই এক ঝুঁকির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মতো বড় অর্থনীতির দেশগুলোর আর্থিক খাতের ভূমিকা ক্রমশই বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় হয়ে উঠছে বলে সর্তক করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। ২০০৮ সালের অর্থমন্দা থেকে শিক্ষা নিয়ে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোকে তাদের ব্যাংক ও আর্থিক খাত যাতে দ্রুত সম্প্রসারিত না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ রাখার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি। নতুন এক গবেষণায় আইএমএফ জানিয়েছে, নীতিনির্ধারকরা যাতে তাল মেলাতে পারবেন, সেই ভাবেই আর্থিক ও ব্যাংক খাতের সম্প্রসারণ হওয়া উচিত। গবেষণায় আরো উল্লেখ করা হয়, একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থনীতির একটি বড় অংশ দখল করে রাখে। আর এ সময় আর্থিক স্থিতিশীলতায় এসব খাতের অবদান আরো কমে আসে। অথচ আর্থিক উন্নয়ন একটি দেশের বাণিজ্যের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এছাড়া একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক উন্নয়ন না হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাবও ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। বিপরীতে বাড়তে থাকে অর্থনৈতিক ও আর্থিক অস্থিতিশীলতা।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের আর্থিক খাত সংস্কারের ক্ষেত্রে আইএমএফ এর উক্ত সতর্কবানী যৌক্তিকভাবে পর্যালোচনা এবং অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের রপ্তানিখাতের শক্তি মাত্রাতিরিক্তভাবেই তৈরী পোশাক খাতের উপর নির্ভরশীল । একারনেই বিকেএমইএ থেকে বারবার বস্ত্রনীতি, শিল্পনীতি, আমদানি নীতি, রপ্তানি নীতি, ব্যাংক খাত সংস্কার কার্যক্রম, রাজস্বখাত সংস্কার কার্যক্রম এবং একইসাথে বন্দর ও কাষ্টমস্ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে ব্যবহারিক কৌশলের পাশাপাশি প্রায়োগিক ও নীতিগত সূত্রগুলো অন্তর্ভূক্ত করার আহবান জানানো হয়েছে। আমরা সবসময়ই এমন একটি শিল্পনীতি চেয়েছি, যার কারনে বাংলাদেশে তৈরী পোশাকখাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আইএমএফের গবেষণায় দেখা গেছে, 'অতিরিক্ত অর্থায়ন' এর কারনে অনেক দেশই তাদের আর্থিক সম্পদ খুব একটা দক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারে না। এসব দেশ অর্থ বেশি বরাদ্দ দিতে পারে না, ফলে উৎপাদন কার্যক্রমেও শ্লথ হয়ে আসে, এবং এরই প্রভাবে অর্থনীতিতে সার্বিক উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে পড়ে। একটি উন্নত ব্যবস্থাপনা আর্থিক খাতের দ্রুত সম্প্রসারণের নেতিবাচক প্রভাব অনেকটাই প্রশমিত করতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্কেলে আরো বেশী গবেষণা ও কৌশল প্রণয়নে আরো বেশী তাত্ত্বিক সূত্রের প্রয়োগ প্রয়োজন।

সামাজিক উন্নয়ন খাতে নীটওয়্যার সেক্টরের অবদান

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে ব্যাপক হারে কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারত্ব হ্রাস, শিশুশ্রম দূরীকরণ, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, অপুষ্টি দূরীকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনের ক্ষেত্রে নীটওয়্যার শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্প খাতে যে পরিমান মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ নীটওয়্যার খাতের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশের নীটওয়্যার খাতে প্রায় ২০ লাখ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল রয়েছে আরো প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ। যা বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৪.৭ শতাংশে, এ ক্ষেত্রে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমান প্রায় ৬.৮ শতাংশ। আর প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমানে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের নীট শিল্পখাত বিশাল ভূমিকা পালন করে আসছে।

নীটশিল্প প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের সুযোগ করে দেয় জাতীয় অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত হবার। বর্তমানে নীটশিল্পে মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৭৫ শতাংশই মহিলা শ্রমিক। ২০১২ সালে আইবিএ (ইন্সটিটিউট অব বিজনেস এ্যডমিনিস্ট্রেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, নীটশিল্পে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত মহিলারা তাদের এই আয় থেকে ঘর ভাড়া প্রদান, পরিবারের খাদ্য ক্রয় এবং ছেলে-মেয়ে ও ভাই-বোন এর লেখাপড়ার খরচও সাধ্যমত বহন করছেন। নারীর ক্ষমতায়নের এই চিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে ইউএনডিপি (ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) এর সর্বশেষ প্রকাশিত লিঙ্গ বৈষম্য সূচক ২০১৪ (জিআইআই)এ, যেখানে দেখা যায় ২০১৩ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ০.৫২৯ (ইউএনডিপি, ২০১৪)। অন্যদিকে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন অনুযায়ী লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে অন্যতম। এর স্বীকৃতি স্বরূপ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম থেকে বাংলাদেশ এ বছর ডব্লিউআইপি এওয়ার্ড ২০১৫ গ্রহণ করেছে।

নীটশিল্পের উৎপাদন (ভ্যালু চেইন) পদ্ধতি ও ভ্যালু এডিশন

সাধারণত নীট শিল্পের উৎপাদন পক্রিয়া বা ভ্যালু চেইন প্রক্রিয়া শুরু হয় তুলা আমদানি কিংবা দেশের মধ্য থেকে তুলা সংগ্রহের মাধ্যমে। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রথম স্তরে নীট শিল্পের ফ্যাক্টরিগুলো তুলা থেকে ইয়ার্ন তৈরি করে, পরবর্তীতে সেই ইয়ার্ন ব্যবহার করে নিটিং এর মাধ্যমে ফেব্রিক্স তৈরি করা হয়। এরপর সেই নিটেড ফেব্রিক্সকে

ডাইং এর মাধ্যমে রং এবং উইভিং এর মাধ্যমে বয়ন করা হয়। তারপর সেই ফেব্রিক্সকে কাটিং এবং সুইং এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত পণ্য (নীটওয়্যার) হিসেবে রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে লেবেলিং এবং প্যাকেজিং এর মাধ্যমে নীটওয়্যার পণ্য সমূহ রপ্তানির উদ্দেশ্যে জাহাজীকরণ করা হয়।

বাংলাদেশে নীটওয়্যার পণ্য তৈরি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে সাধারণত তুলা থেকে সুতা তৈরি এর কাজসমূহ সম্পন্ন হয় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল্স এসোসিয়েশন (বিটিএমইএ) অন্তর্ভুক্ত স্পিনিং মিলসমূহে। বর্তমানে বাংলাদেশের নীট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ইয়ার্ন বা সুতার ৯৫ শতাংশই দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয় (বিশ্বব্যাংক, ২০১৩)। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইয়ার্ন পরবর্তী ধাপ সমূহ যেমন নীটিং, ডাইং, প্রিন্টিং, উইভীং, কাটিং এবং সুইং সাধারণত নীট ওয়্যার ফ্যাক্টরি সমূহ তাদের নিজস্ব কারখানায় সম্পন্ন করে থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২০০টি নীট কম্পোজিট ফ্যাক্টরি রয়েছে যারা উপরোক্ত কার্যাবলীর পাশাপাশি নিজস্ব মেশিনে সুতাও তৈরি করে থাকে। যেহেতু নীট পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুলা হতে সুতা উৎপাদন থেকে শুরু করে প্যাকেজিং পর্যন্ত সকল কার্যাবলী দেশের অভ্যন্তরেই হয়ে থাকে এবং এই উৎপাদনের প্রতিটি স্তরেই কিছু মূল্য-সংযোজিত হয়, পাশাপাশি উৎপাদনের প্রতিটি স্তরেই বিশাল এক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের বিষয়টি জড়িত। সুতরাং বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীটওয়্যার খাতের মূল্য-সংযোজনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি

বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশকে নিয়ে তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করেছে। Citi Investment Research & Analysis এর মতে বাংলাদেশ, চীন, মিসর, ভারত, ইন্দনেশিয়া, ইরাক, মঙ্গলিয়া, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা এবং ভিয়েতনাম হল সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনাময় দেশ। Goldman Sachs মনে করে BRICS পরবর্তী ১১টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম। IMF বাংলাদেশের প্রাণোচ্ছল রপ্তানি এবং রেমিটেন্স প্রবাহকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও বহিস্থিত স্থিতিশীলতার মূল কারণ বলে মনে করে।

Wall Street Journal বাংলাদেশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও নিম্ন জন্মহার অর্থনীতির দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। JP Morgan Chase বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বৃদ্ধির মধ্যে চতুর্থ স্থানে মনে করে। Morgan Stanley বাংলাদেশকে বিনিয়োগ পরিস্ফুটন এর প্রাথমিক পর্যায় বলে মন্তব্য করেছে। New york Times বাংলাদেশকে এশিয়ার সম্ভাবনাময় প্রবৃদ্ধির শক্তিশালী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অর্থনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

HSBC তাদের "The world in 2050" শীর্ষক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ্য করেছে যে বাংলাদেশ ২০৫০ সালের মধ্যে শীর্ষ ৭ দ্রুত বর্ধমান আর্থনীতির একটি হবে। United Nations এর "World Economic Situation and Prospects 2013" তে বাংলাদেশকে শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। World Economic Forum (WEF) Gi "The Global Competitive Report 2013" অনুযায়ী বাংলাদেশ ৮ ধাপ উপরে উঠেছে। McKinsey & Co. তাদের সর্বশেষ জরিপে দেখেছে যে, বাংলাদেশ এখনো তৈরি পোশাক ক্রেতাদের পছন্দের তালিকার ১ নাম্বারে রয়েছে। জার্মানির The Deutsche Bank AG, বলেছে যে,বাংলাদেশের শক্তসমর্থ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঠামো ও স্বল্প বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব রয়েছে।

পরিশেষে ১ জুলাই ২০১৫ বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান দিয়েছে। যা অর্থনীতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রথমবারের মতো ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক ফিন্যান্সিয়াল টাইমস লিমিটেডের সহযোগী তথ্য সেবাকেন্দ্র এফডিআই ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ২০৪ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রেখেছে আর্থিক ও জ্বালানি খাতের ১৮টিসহ ২০টি প্রতিষ্ঠান। গত বছর এই ২০টি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত বিনিয়োগ ছিল ২০৩,০৮,০০০০০ ডলার। এফডিআই ইন্টেলিজেন্সের হালনাগাদ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ১৪টি খাতের ২৭টি প্রকল্পে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ২০টির বেশি প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ণ ও বাজার সম্প্রসারণ

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাতের জন্য এখন দরকার একটি সময় উপযোগী বাণিজ্যনীতি। বাংলাদেশের সরকার বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিদেশ হতে ঋণগ্রহন করে পাশাপাশি আমদানি করে প্রচুর পরিমানে মূলধণী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল পণ্য যার মূল্য ও ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য দরকার অভ্যন্তরীন আয়ের উৎস। আজ এই কাজটি নিরলস ভাবে করে যাচ্ছে বিদেশে নিয়োজিত বাংলাদেশী শ্রমিক এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি তৈরী পোশাক খাত। আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উচু করে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে এই তৈরি পোশাক খাত।

আজ আমরা শিল্পখাত হতে জিডিপি এর মোট ৪০ শতাংশ আশা করছি। দ্রুত অগ্রগতি সম্পন্ন তৈরি পোশাক শিল্পকে ভিত্তি ধরে GDP এর ৪০ শতাংশ কেবল একটি গানিতিক সংখ্যা নয়, এর সাথে জড়িত রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ব্যপক পরিশ্রম। রপ্তানিমূখী তৈরি পোশাক শিল্প পণ্য রপ্তানিতে যে সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হচ্ছে তা সমাধানের উপায় খুঁজতে হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি কিভাবে তা সমাধান করা যায় তার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রপ্তানি নীতিতে থাকা অত্যাবশ্যক। রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কারখানার উৎপাদন পরিবেশ ও কমপ্লায়েন্স বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে বিকেএমইএ পণ্যের গুনগুত মান যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং বাজার বহুমুখী করার উপর জোর দিচ্ছে।

একটি সময় উপযোগী রপ্তানি নীতিই পারবে দেশের বিদ্যমান সস্তা এ জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তুলনামূলক প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হারানো GSP কিভাবে ফিরিয়ে পাওয়া যায় তার পাশাপাশি শ্রম নির্ভর তৈরি পোশাক শিল্পকে উৎসাহিতকরণ, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহন, রপ্তানি কিভাবে বহুমূখী করা যায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরী করা জরুরী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে গবেষণার কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ বিশ্বে তৈরী পোশাক শিল্পে রপ্তানিখাতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। অথচ আন্তর্জাতিক পোশাক বাজারে বাংলাদেশের নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড নেই। এর মূল কারণ পরিকল্পিত গবেষণার অভাব। বর্তমান সময়ে আমেরিকা ও ইউরোপিয় ইউনিয়নে অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে আমাদের পোশাক শিল্পে। এমতাবস্থায় আমাদের পোশাক শিল্পকে স্বমহিমায় টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই লক্ষ্য শুধুমাত্র গবেষণার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

সহায়ক নীতি কৌশল প্রণয়ন

দেশীয় বিনিয়োগঃ তৈরী পোশাক শিল্পে বর্তমান সময়ে মোট বিনিয়োগের প্রায় ৯৫% হলো দেশীয় বিনিয়োগ। দেশীয় বিনিয়োগ স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি আমাদের শিল্প বিকশিত হবে। রপ্তানি মাত্রা বৃদ্ধির জন্য দেশীয় বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা বিশ্ব ব্যাংকের "Ease of Doing Business Index" এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৭৩ (২০১৪ সাল)। যেখানে আমাদের পার্শবর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, নেপালের অবস্থান যথাক্রমে ১৪২, ১২৪ এবং ১০৮।

দশটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরী এই Index এ বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে নিম্ন যে নির্দেশক, তা হল বিদ্যুৎ লাইন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে। সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি এবং চুক্তি বাস্তবায়ন এই দুই ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের প্রাপ্তি ১০ এর মধ্যে ৮। নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই সকল নির্দেশক উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরী করার মাধ্যমে দেশীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিঃ বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম অংশ হল দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি। অনেক সময় বহুপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা যায়। বর্তমানে যে Trade Block গুলো রয়েছে তাদের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজন। ফলে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে আমাদের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের যে সকল উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে তাদের সাথে সংলাপের মাধ্যমে রপ্তানিবান্ধব দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলোর সাথে "কর মুক্ত, কোটা মুক্ত" (Duty Free Quota Free) চুক্তি বাস্তবায়ণ করার মাধ্যমে রপ্তানি মাত্রা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি নিজেদের মধ্যে (ই২ই) চুক্তি সম্পন্ন করা সুযোগ রয়েছে।

ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো স্থাপন (NSW)ঃ বর্তমানে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি করার জন্য প্রায় ৪০০০ রকমের ফি প্রদান করতে হয়। এছাড়া অন্যান্য সার্টিফিকেট সংক্রান্ত জটিলতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানিকারকদের Lead Time বেড়ে যায়। যা আমাদের পণ্য এবং রপ্তানি শিল্পকে বিশ্ববাজারে অপ্রতিযোগী করে তোলে। সেক্ষেত্রে NSW স্থাপনের মাধ্যমে আমাদের Lead Time কমানো সম্ভব। সকল প্রবেশ পয়েন্টে একটি মাত্র ঐক্যবদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে কর অথবা ফি গ্রহণ। যেমনঃ ASYCUDA WORLD সকল পোর্ট, জল এবং স্থলে একই নিবন্ধন পদ্ধতি চালু করা। যাতে করে একবার নথিপত্র প্রদান করার পর বারবার না করতে হয়। এতেকরে জটিলতা এবং Lead Time দুটোই কমে আসবে এবং আমাদের রপ্তানি পণ্য বিশ্ব বাজারে আরো প্রতিযোগী হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে আমাদের দ্রুত NSW বাস্তবায়ন করতে হবে।

তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি পোশাকশিল্প কারখানার প্রথম কাঁচামাল হল তুলা বর্তমানে সুতাকলে বার্ষিক ৪২ লক্ষ বেল আশতুলার চাহিদা রয়েছে। অথচ ২০১৩-১৪ সালে আমাদের আশতুলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ লক্ষ বেল। আমাদের তুলা আমদানিতে বার্ষিক প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। অনেক সময় তুলা আমদানির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্বীকার হতে হয়; যা ব্যবসার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমাদের তুলার ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা কমানো এখন সময়ের দাবি। এজন্য মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাধ্যমে তুলা উৎপাদনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তুলার মান নিশ্চিত এবং উন্নত মানের তুলা উৎপাদনের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। এছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে তুলা উৎপাদনের সম্ভাবনাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর সাথে যৌথভাবে কাজ করার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।

বাণিজ্য চুক্তির সম্প্রসারণঃ বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান অংশ হল বাণিজ্যিক চুক্তির সম্প্রসারণ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্থাপনের চেষ্টা করা। দক্ষিণ এশিয়া এবং এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত দেশগুলোর সাথে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করা। সর্বোপরি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর বিভিন্ন ফোরামে আমাদের রপ্তানিকে শক্তিশালী করার জন্য রপ্তানিবান্ধব প্রস্তাবনা পেশ করা। এসকল চুক্তির সফলতা নির্ভর করে গবেষণার উপর। গবেষণার মাধ্যমে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় খাত এবং শক্তিশালী দিকগুলো বের করে এনে যে মোতাবেক চুক্তির নকশা গঠন করা।

তথ্য ভান্ডার (Data Base) ঃ তৈরী গবেষণার জন্য প্রথমে প্রয়োজন তথ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমানে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে তথ্যের প্রচুর অভাব রয়েছে। যদি কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। এজন্য সরকারি ভাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ আরম্ভ করা প্রয়োজন। ক্ষেত্রবিশেষে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে যৌথ উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ করা। BKMEA এবং সরকার যৌথভাবে নীট শিল্পের জন্য তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে পারে। যেখানে উৎপাদন, রপ্তানী বাজার ও প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য থাকবে। এক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সচেতনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন; যাতে নির্ভূল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility) ঃ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব।

পোশাক শ্রমিকদের একটি বড় অংশ হল মহিলা শ্রমিক। তাদের শিশুদের জন্য একটি Day Care Center তৈরী করা হলে তারা কাজে পূর্ণ মনোযোগ করতে পারে। দুপুরের খাবার কারখানা হতে সরবরাহ করা হলে শ্রমিকদের পুষ্টিমান বৃদ্ধি পাবে। মা তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। প্রতিটি কারখানায় একটি করে Medical Unit স্থাপন করা। CSR পালন করার ক্ষেত্রে কারখানা মালিকদের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টি করা। গবেষণার মাধ্যমে তথ্য বের করে আনা যে CSR এর মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এক্ষেত্রে একটি "জাতীয় CSR নীতিমালা" প্রণয়ন করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি উন্নয়ন ফান্ড (TUF) স্থাপনঃ

আমাদের পোশাক শিল্প প্রসারের জন্য অতি দ্রুত একটি প্রযুক্তি উন্নয়ন ফান্ড স্থাপন প্রয়োজন। পাকিস্তানে এই ফান্ডের আওতায় তাদের সরকার, নতুন কারখানা স্থাপনের জন্য নেওয়া ঋণের সুদের ৫০% পর্যন্ত ব্যয় বহন করবে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ১৯৯৯ সালে তাদের তৈরী পোশাক শিল্পের প্রসারের জন্য TUF স্থাপন করে। অথচ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনও TUF স্থাপন করা হয়নি।

বাংলাদেশ এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

বাংলাদেশ বর্তমানে ৪৭টি দেশ হতে ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি (DFQF) এবং অগ্রাধিকার মূলক বাজার সুবিধা পাচ্ছে যার প্রায় সবই এসেছে বহুপাক্ষিক আলোচনার ফলস্বরূপ এখানে বাংলাদেশের কোন একক প্রচেষ্টা ছিল না। বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি - সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) ফ্রি ট্রেড এরিয়া, দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি তে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা থেকে সুবিধা পাচ্ছে নিতান্তই কম । এই জন্য আমাদের নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোচনার দক্ষতা আরো শক্তিশালী করতে হবে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক এর পাশাপাশি দেশের সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ট্রেড বডিকে এগিয়ে আসতে হবে। সাধারণত প্রত্যেক দেশ কোন না কোন অর্থনৈতিক জোটের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। যদি কোন দেশের সাথে অন্য দেশের কাস্টমস্ ইউনিয়ন থাকে তা হলে কাস্টমস্ ইউনিয়নের কোন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে হলে সকল দেশের সাথে আলোচনা করতে হয়। যেমন এরকম কয়েক কাস্টমস্ ইউনিয়নের ধারণা নিম্নে দেওয়া হলো- বেলারুশ, কাজাকস্থান ও রাশিয়া'র মধ্যকার কাস্টমস্ ইউনিয়ন (CUBKR) সারা বিশ্ব থেকে ২০১৪ সালে ৩৬৪.২৬ বিলিয়ন মূল্যের পণ্য আমদানী করলেও বাংলাদেশ হতে আমদানী করেছে মাত্র ৭২০.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য।

আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে এবং বলিভিয়া'র সমন্বয়ে গঠিত কাস্টমস্ ইউনিয়ন MERCOSUR ২০১৪ সালে বাংলাদেশ হতে মাত্র ২১৪.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করেছে। যেখানে তারা বিশ্ব থেকে আমদানী করেছে প্রায় ৩৫৭.২৪ বিলিয়ন মূল্যের পণ্য সামগ্রী। আর একটি বিষয় উল্লেখ্য করা প্রয়োজন এই জোটটি বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাক আমদানি করেছে মাত্র ১৯১.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ তৈরী পোশাক হতে এত কম পরিমাণ বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনের কারণ হচ্ছে উচ্চ শুল্ক হার।

এমন আরএকটি কাস্টমস্ ইউনিয়ন হচ্ছে বতসোয়ানা, লেসোথো, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সোয়াজিল্যান্ড এর সমন্বয়ে গঠিত SACU (South African Customs Union) তার পাশাপাশি আমরা বহু-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য জোট এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো'র সমন্বয়ে গঠিত NAFTA; ওমান, আরব আমিরাত, সৌদিআরব, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত এর সমন্বয়ে গঠিত উপসাগরীয় সহযোগী কাউন্সিল (GCC) এর সদস্যদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করা যেতে পারে।

CUBKR আমাদের ২৮০০ পণ্যের জন্য ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি সুবিধা দিলেও বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য নীট ও ওভেনকে এই সুবিধার অন্তর্ভূক্ত করেনি। NAFTA এর সদস্য রাষ্ট্র আমেরিকা সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের জন্য বিদ্যমান জিএসপি সুবিধা বাতিল করেছে। বিদ্যামান সামষ্টিক প্রতিবন্ধকতা গুলোকে সঠিক

বিবেচনায় রেখে কাস্টমস্ ইউনিয়ন, বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক জোটের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করা সম্ভব হলে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ভিশন ২০২১ এর মূল লক্ষ্য মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে পরিণত হওয়া সম্ভব।

TPP ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশঃ

TPP এর আলোচনা শুরু হওয়ার সাথে সাথে এর প্রভাব বুঝতে পেরে দেশি এবং বিদেশী উদ্যোক্তারা ভিয়েতনামের তৈরি পোশাক খাতে বিনিয়োগ করা শুরু করেছে। এর থেকে বুঝা যায় এই বাণিজ্য চুক্তির ফলে ভিয়েতনামের তৈরি পোশাক খাতে কেমন ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। রুলস অব অরিজিনে বলা হয়েছে তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত সুতা নিজ দেশে কিংবা সদস্য রাষ্ট্রের যেকোন অঞ্চলে উৎপাদিত হলে চলবে। কিন্তু দেখা যায় বিশ্বের অন্যতম তৈরি পোশাক সরবরাহকারী দেশ ভিয়েতনাম তার চাহিদার প্রায় ৮৮ শতাংশ সুতা আমদানী করে চীন এবং দক্ষিণ কোরিয়া থেকে।

ভিয়েতনাম কেবল কাটিং ও সিউয়িং প্রথা অনুসরন করে ফিনিস্‌ড পণ্য তৈরি করে। যেহেতু TPP স্বাক্ষরিত হলে ভিয়েতনাম আর শুল্ক বাধার সম্মুখিন হবে না, তাই বলা যেতে পারে তারা স্বল্প মূল্যে সদস্য রাষ্ট্র হতে সুতা সংগ্রহ করতে পারে এবং প্রতিযোগিতা আরও দৃঢ় করতে পারবে কেননা তাদেরকে আরও বেশি মূল্যে চীন হতে সুতা আমদানী করতে হবে না। যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিক দিয়ে তুলা চাষে অনুকূল অবস্থায় আছে যে দেশের বস্ত্র খাতের নীতি নির্ধারকরাও এই সুফল গ্রহন করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

এই প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের যাবতীয় উদ্দ্যোগ গ্রহনের জন্য তারা প্রস্তুত আছে বলে জানা যায়। ভিয়েতনাম ও তাদের বস্ত্রখাতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে রুলস অব অরিজিন এ পরিবর্তন এনে তাদের তৈরি পোশাকের জন্য TPP এর যে কোন অঞ্চলে সম্পাদিত "Cutting and Sewing" কে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করার দাবী জানিয়েছে।

TPP আলোচনা অনেকটা শেষের পর্যায়ে। এই প্রক্রিয়ায় ভিয়েতনাম যেভাবে তাদের তৈরি পোশাক খাতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তার ফলে তারা অগ্রাধিকার মূলক অনেক সুবিধা গ্রহণ করবে। তার পাশপাশি আমেরিকার বাজারে পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে আর কোন বাঁধার সম্মুখিন তারা হবে না। এর ফলে বৈশ্বিক সরবরাহ প্রক্রিয়ার একটি বিশাল অংশ তারা গ্রহন করবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে ভিয়েতনাম ১৭% শুল্কের সম্মুখিন হয় আমেরিকার বাজারে প্রবেশ করতে। TPP সম্পাদনের ফলে তা শূন্যের কাছাকাছি চলে আসবে।

গত ফেব্রুয়ারীতে ভিয়েতনামের সর্ববৃহৎ তৈরি পোশাক কারখানা 'ভিনাটেক্স' জাপানের ট্রেডিং ফার্ম ইটোছু (Itochu) এর সাথে ডায়িং এবং অন্যান্য পরিপূরক পণ্য সরবরাহের জন্য একটি প্রজেক্ট স্বাক্ষর করেন। এর পাশাপাশি Vinatex সাপ্লাই চেইন বৃদ্ধির জন্য আরও ৭১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দেন যাতে ওয়েভিং এবং ডায়িং প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট থাকবে। এর পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়ান বিনিয়োগকারী ভিয়েতনামে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

সুষম শ্রম বিণ্যাসের নীটওয়্যার খাতঃ

বাংলাদেশের নীট শিল্পখাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং দ্রুত বিকাশমান শ্রমঘন শিল্প। এই শিল্পের ক্রমবর্ধনশীল অবস্থানকে ধরে রাখার জন্য শ্রম শৃঙ্খলা এবং শিল্প ব্যবস্থাপনায় একটি আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরী। নানাধরনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশের নীট শিল্প আজ আন্তর্জাতিক বাজারে একটি নিজস্ব ব্র্যান্ড ভেল্যু তৈরী করতে পেরেছে। এরই সাথে বিগত চার বছর ধরে নীট শিল্পখাতে শ্রম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি প্রায় শূন্যের কোঠায় থাকার কারনে এই শিল্পের ক্রমধাবমান উর্ধ্বগতি থেমে থাকেনি। এর পেছনে রয়েছে শিল্প মালিক এবং উদ্যোক্তাদের সাথে তাদের শ্রমিকদের পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি এবং সরকারি উদ্যোগগুলোকে আরো শক্তিশালীভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য বিকেএমইএ'র অব্যাহত প্রচেষ্ঠা। এ কারনেই নীট শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার এখনো বিরাট আকারের ঋণাত্মক মার্জিনে পরেনি।

তবে সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক বিশ্বে অর্থনৈতিক শ্লথগতির কারনে ক্রেতাদের ক্রয় সামর্থ্য কমে যাওয়া, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স, এনভায়রনমেন্ট কমপ্লায়েন্স, অগ্নি নিরাপত্তা এবং প্রতিরোধ কৌশলে বায়ারদের অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদানের কারনে বাংলাদেশের নীট শিল্প এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। শিল্প ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান নির্ভর কৌশলের পাশাপাশি শ্রম পরিকল্পনার সুষম বাস্তবায়নও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে বিশ্বে শ্রমঘন শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের শ্রম সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াতে মানবাধিকার, খাদ্যে পুষ্টিমান, পেশাগত নিরাপত্তা এবং শ্রম শক্তি বন্টনে নৈতিকতা বজায় রাখার প্রক্রিয়াগুলোকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে উৎপাদনশীল কারখানায় শ্রম প্রদানের সময় শ্রমিকের মানসিক ও শারীরিক শান্তির যাতে কোন ব্যত্যয় না ঘটে, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়াটা শ্রম শৃঙ্খলা বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। মূলত শ্রম নিবেদনের প্রক্রিয়াটিকে আরো অধিকতর মানবিক ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলাই আধুনিক শিল্প ব্যবস্থাপনার মূল উপজীব্য।

আমরা নির্দ্বিধায় বলতে চাই যে, বাংলাদেশের নীট শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রম শৃঙ্খল পরিবেশের যে উত্তরণ ঘটেছে, তার পেছনে একদল উদ্যোগী ও নিবেদিত শ্রমিক শ্রেণীর আত্মনিবেদনের বিশাল অবদান রয়েছে। শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে এই সুষম সমন্বয় ঘটানোর কারনেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। তবে স্মরতব্য যে, শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রম শৃঙ্খলা যেমন জরুরী, ঠিক তেমনিভাবে শ্রম শৃঙ্খলার জন্য শ্রমিকের শ্রম সচেতনতা বৃদ্ধিও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারন শ্রমিকের শ্রম, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক উৎপাদন কৌশলের সমন্বয়ের মাধ্যমেই একটি শিল্প কাঠামোর চাকা সচল থাকে। তাই কারখানা পর্যায়ে আধুনিক শিল্প ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলোতে শ্রমিকের অধিকার, শ্রম শৃঙ্খলা এবং শ্রম কল্যাণের মতো বিষয়গুলোকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে বিকেএমইএ বাংলাদেশ নীটওয়্যার শিল্পখাতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে কাজ করে যাচ্ছে।

বিকেএমইএ এর ইউএসজিবিসি সদস্যপদ প্রাপ্তিঃ

বিকেএমইএ বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে গ্রীন ইন্ডাষ্ট্রি উন্নয়ন ও স্থাপনের কাজ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিকেএমইএ বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে USGBC মেম্বারশিপ প্রাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, USGBC হল গ্রীন ইন্ডাস্ট্রি এর সার্টিফিকেট প্রদানকারী আমেরিকা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। বিকেএমইএ USGBC এর পক্ষ থেকে এই মেম্বারশিপ পেয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর'১৫ তারিখে বিকেএমইএ USGBC (Silver) মেম্বারশিপ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে এবং গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে বিকেএমইএ এর মেম্বারশিপ অনুমোদন করা হয়। এরফলে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে (বায়ার) বাংলাদেশের নীটওয়্যার শিল্পকারখানাগুলোর প্রস্তুতকৃত পণ্য সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারনা জন্ম নেবে।

বিকেএমইএ'র শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণে অনুদান প্রদানের ঘোষণা ঃ

গত ২৫ জানুয়ারী'১৫ রবিবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিকেএমইএ নারায়ণগঞ্জে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের বেদখলকৃত জায়গায় শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনের জন্য বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে ৩,০০,০০০,০০/- (তিন কোটি) টাকা অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এ ব্যপারে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে বিকেএমইএ'কে সাথে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস প্রদান করেছেন।

শ্রমিক কল্যাণের জন্য বিকেএমইএ'র আরো কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ক)	ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার প্রাক্কালে শ্রমিকদের নির্বিঘ্নে বাড়ি যাত্রার পথে যেন কোন ধরনের ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়তে না হয়, সেজন্য নারায়ণগঞ্জ পুলিশকে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা অনুদান দিয়ে বিশেষ সময়ের জন্য কমিউনিটি পুলিশ চালু করার ব্যবস্থা করেছে বিকেএমইএ।
খ)	বিকেএমইএ'র খাঁনপুরস্থ ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য ২৬,৮৫,০০০/- টাকার একটি এম্বুলেন্স অনুদান প্রদান করেন। এর ফলে নীটওয়্যারের শ্রমিকরা উক্ত হাসপাতালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা লাভ করবে।

গ)	বিকেএমইএ শ্রমিকদের উন্নয়নে চাঁনমারিতে একটি ডরমেটরী স্থাপনের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করে আসছে।
ঘ)	এছাড়াও বিকেএমইএ বিসিকে একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। খুব শীঘ্রই এটি উদ্বোধন করা হবে। এরফলে যে কোন ধরনের অগ্নিজনিত দূর্ঘটনা থেকে শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা সহজ হবে।
ঙ)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিকেএমইএ'র যৌথ উদ্যোগে চৌদ্দ হাজার শ্রমিকদের নিয়ে হেলথ ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে ওরস্যালাইন, সেভলন, সাবান ও খাবার দেয়া হয়েছে।
চ)	বিকেএমইএ বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় "কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল" এর আওতায় ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীট শিল্পে কর্মরত বিভিন্ন মহিলা শ্রমিককে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।
ছ)	রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে বিজিএমইএকে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
জ)	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় এবং বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিকেএমইএ ২০১৫-২০১৮ সালের মধ্যে ৫,০০০ (পাচঁ হাজার) নতুন নীটওয়্যার শ্রমিক প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে কাজ করছে।
ঝ)	এডিবি প্রজেক্টের আওতায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লায় চারটি ওয়ার্কার্স ট্রেনিং সেন্টার গঠন করা হয়েছে।
ঞ)	জিআইজেড এর সাথে সহযোগিতামূলক চুক্তির আওতায় প্রতিটি কারখানায় "ওয়াকার্স ট্রেনিং" সেশন এর আয়োজন করা হয়েছে।
ট)	বড় কারখানাগুলোতে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
ঠ)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং ইপিবি'র সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জের বিসিকে শ্রমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সদস্যভূক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের (মূলত হেলপার) ট্রেনিং প্রদান করে দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তর করার কাজ চলছে।
ড)	শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত যে কোন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য "লেবার এ্যাফেয়ার্স সেল" গঠন এবং এর আওতায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে শ্রম আইনানুসারে সমাধান এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
ঢ)	বিকেএমইএ বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ব্র্যাকের সহায়তায় "টি.বি প্রজেক্ট" এর মাধ্যমে কর্মরত নীট শ্রমিকদের যক্ষা প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরীর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
ণ)	কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত সুশ্রষা প্রদানের জন্য মেডিক্যাল ডাক্তার নিয়োগ দেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
ত)	নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লাস্থ বিসিকে "বিকেএমইএ হেলথ সেন্টারের" মাধ্যমে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ থেকে ৫০ জন শ্রমিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

থ)	নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লাস্থ বিসিকে "সানি সাইড ডে-কেয়ার" সেন্টারের মাধ্যমে বিকেএমইএ' কর্তৃক প্রতিদিন কর্মজীবী মায়েদের কমপক্ষে ৬০ জন শিশুকে বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া ও পড়ালেখার (কর্মকালীন সময়ে) ব্যবস্থা করা হয়েছে।
দ)	সদস্যভূক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজ নিজ শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিক উৎসব আয়োজন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
ধ)	নীট শিল্পে কর্মরত মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শিল্প ব্যবস্থাপনা ও শ্রম অসন্তোষ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "দ্বন্দ্ব নিরসন ও শৃঙ্খলা নীতি" শীর্ষক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।

নীট শিল্পের বিকাশে শ্রমিকের অবদান ঃ

কোন সন্দেহ নেই যে, নীট শিল্পে বিরাজমান সুশৃঙ্খল শ্রম পরিবেশ এবং শ্রমিকদের শিল্পের বিকাশের জন্য আত্মনিবেদনের মানসিকতাই আমাদের এই শিল্পকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাচ্ছে। মহান মে দিবসে শিল্পের বিকাশে শ্রমিকদের এই আত্মনিবেদন এবং অবদানকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তবে একইসাথে যুগোপযোগি প্রযুক্তি কৌশল ও যন্ত্র কৌশলে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের দেশের শ্রমিকরা শিল্প ব্যবস্থাপনার সাথে আরো ওতপ্রোতভাবে জড়িত হবে-- এই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা প্রত্যয়ের সাথে বলতে চাই নীট শিল্প উদ্যোক্তারা আগামী দিনগুলোতে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা ও শ্রম শক্তির সুষম বিকাশে আধুনিক সব বিজ্ঞান কৌশল যুক্ত করে বালাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অগ্রগন্য ভূমিকা রাখবে।

সমাপ্তি বক্তব্য ঃ

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুতে উন্নয়নের প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতার হারকে বিবেচনায় নেয়া হয়। কিন্তু তারপরেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলো সেই সব দেশে ধারাবাহিকভাবে কখনো স্থিতিশীল থাকেনি। এর মূল কারন হচ্ছে বাজারের চাহিদার ধরন সময় থেকে সময়ে পরিবর্তিত হয় এবং হয়েছে। আর চাহিদার পরিবর্তনের কারনে উন্নয়নের সূচক এবং উৎপাদনশীল তার কাঠামোতেও পরিবর্তন আসে। অর্থনীতির এই পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্যের কারনে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানী কৌশলে ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হয়।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পলিসিতে ধারাবাহিক পরিবর্তনের কারনে শিল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত ব্যবস্থাপনা, সঠিক বিপনন কৌশলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের ব্র্যান্ডিং পাবলিসিটি সংযুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের শিল্প কৌশলেও আধুনিক ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে পাশে পাওয়ার আশা রাখছি এবং ২০২১ সালের মধ্যে নীটওয়্যার সেক্টর থেকে কমপক্ষে ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমানের পণ্য রপ্তানি করার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, তা বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

১৬

মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি

এস.এম.আশরাফুজ্জামান
শ্রম পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
শ্রম পরিদপ্তর, ঢাকা।

এককালে ইউরোপে মে দিবস ছিল বসন্তোৎসবের দিন। বসন্তের আগমনে ১লা মে সারা ইউরোপই মেতে উঠত মে-রাণীর উৎসবে। মে বৃক্ষরোপন করে কোন এক তরুনীকে মে-রাণী সাজিয়ে মে ফুলের সমারোহে চলত নাচ, গান, উৎসব । সেটাই ছিল মে দিবসের উৎসব। আমেরিকায় ১৮৮৬ সালের অবিস্মরণীয় ঘটনাবলীর পর মে দিবস দেখা দিল এক নতুন অর্থ ও নতুন তাৎপর্য নিয়ে। আজ মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতীক। শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে শ্রমিক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অহংকার ও প্রেরণা হচ্ছে এ মে দিবস। এ দিনটি শ্রমিকদের একদিকে যেমন করে অধিকার সচেতন, তেমনি করে তোলে অধিকার আদায়ের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতির এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করছে। "মে দিবসের মর্মবাণী, শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি" এবারের এ শ্লোগানের প্রেরণা ও প্রত্যয়কে উপজীব্য করে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মহান মে দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি সুখী সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গতি সঞ্চারের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। তাই এবারের মে দিবসের শ্লোগানের বাণী বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে শ্রমিক-মালিক ঐক্য অপরিহার্য।

আধুনিক সভ্য জগতে মানব সমাজের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তোলার মূল কারিগর হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রচলিত শ্রম আইন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের শ্রম প্রশাসন দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে শ্রম বিষয়ক আইন প্রণয়ন হলেই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হয়ে যাবে না। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বিত প্রয়াস, পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা প্রয়োজন। নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হতে হবে। মে দিবসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাইকে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার আঙ্গিকে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে একটা আত্মনির্ভর দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অভিযাত্রায় সবাইকে অংশ নিতে হবে।

দেশের শিল্প সেক্টরে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখতে সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সক্রিয় সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ ৩৫টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। শ্রমিকদের মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ৮টি কোর কনভেনশন এর মধ্য থেকে ৭টি কোর কনভেনশন বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে। অনুসমর্থিত কনভেনশনসমূহের আলোকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে প্রচলিত শ্রম আইনগুলো প্রণীত হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উল্লিখিত দপ্তর দু'টি শ্রম আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে স্থিতিশীল শিল্পোৎপাদন ও কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও শ্রম প্রশাসন বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। শান্তিপূর্ণ পন্থায় শিল্প

বিরোধ নিষ্পত্তি করা, সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্পর্ক উন্নয়ন এবং দেশের প্রচলিত শ্রম আইনের আওতায় ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম তদারকি, শ্রমিকদের নানাবিধ কল্যাণ, সহযোগিতা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শ্রম পরিদপ্তর পরিচালনা করছে।

শ্রম পরিদপ্তরের অধীন শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহ মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে দেশের প্রচলিত শ্রম আইন, শ্রম অর্থনীতি, শ্রম প্রশাসন, শিল্প সম্পর্ক, শ্রমিক শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করছে এবং অব্যাহত উন্নয়ন তৎপরতায় দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শ্রমিকদের কল্যাণে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে এ পরিদপ্তরের ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র আছে। শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, কল্যাণমূলক কার্যক্রম, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য পৃথক "চা-বাগান শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ড" চালু আছে । এসব কর্মসূচী শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মালিক-শ্রমিক সুষ্ঠু সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই মহিলা। বাংলাদেশের মতো সমস্যাবহুল একটি উন্নয়নশীল দেশে নারী ও পুরুষের সমানভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে মহিলা শ্রমিকদের প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাসহ পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য সমপরিমাণ কাজে সমমজুরী প্রদান সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন (কন-১০০) বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে। বাংলাদেশ শ্রম আইনেও তার প্রতিফলন হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দেশের শ্রম শক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য আমাদের সকলের ভূমিকা নেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৫৮৬টি ট্রেড ইউনিয়ন, ৮৪টি শিল্প ভিত্তিক ফেডারেশন, ৪০টি গার্মেন্টস ফেডারেশন এবং ৩২টি জাতীয় ভিত্তিক ফেডারেশন রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি চমৎকার ঐতিহ্য রয়েছে বাংলাদেশে। এখানে শিল্প ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সদস্য ও নেতৃবৃন্দ উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌছার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়। মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস এ কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। শতকরা ৭৬ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প হচ্ছে তৈরী পোশাক শিল্প। দেশের রপ্তানী বৃদ্ধির পাশাপাশি এ দেশের জনগনের বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থানে এ শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য।

বিপুল সম্ভাবনাময় এ শিল্প আজ বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই এ শিল্পের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে গ্যাস এবং বিদ্যুতের অপ্রতুলতা অনেকাংশেই লাঘব করা হয়েছে। এ ছাড়া রানা প্লাজা ধসের পর তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের কল্যাণ, জীবন মান উন্নয়ন ও উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় ত্রি-পক্ষীয় সহযোগিতা, ইউরোপীয় ক্রেতা জোট Accord এবং আমেরিকান ক্রেতা জোট Alliance কাজ করে যাচ্ছে। একইভাবে Compact partner বাংলাদেশ সরকার, ইইউ, ইউএস এবং আইএলও কর্তৃক Sustainability Compact এর অগ্রগতি প্রতি বছর পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

নতুন বিশ্ব গড়ার আহ্বানে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া আমাদের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিশ্ব মানের তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার, অধিক উৎপাদন ও টেকসই উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। সকল উদ্যোক্তাবৃন্দকে আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর শ্রম বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগি হতে হবে। শিল্পের প্রাণ শ্রমিকদের কর্মউদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে হবে। শ্রমিক সমাজকে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে আরো দক্ষ করে তুলতে হবে। দেশ ও জাতীয় উন্নয়নে আমাদের সকলের দৃষ্টি প্রসারিত করাসহ পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে হবে। ভিশন ২০২১ এর মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। তবেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

মহান মে দিবস ও শিল্পের বিকাশ

সালাহউদ্দীন কাসেম খান
সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

শ্রমিক শ্রেণীর আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণ করে রাখার উদ্দেশ্যে মহান মে দিবসের সূচনা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মহান মে দিবস উদ্‌যাপন হয়ে আসছে। মহান মে দিবসে আমি দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং কল্যাণের প্রতি সব সময় সমর্থন প্রদান করে আসছে। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের শ্রম আইনে তথা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শ্রমিকের অধিকার ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কারণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের অবদান অনস্বীকার্য। যে কোনো পণ্য-দ্রব্যের বাজারে এর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নির্ভর করে ঐ পণ্যের গুণগতমান ও উৎপাদন ব্যয়ের ওপর। কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উপাদানের সঠিক ও কাম্য ব্যবহার নির্ভর করে অনেকাংশে শ্রমিকের দক্ষতা, আগ্রহ ও সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ওপর।

বর্তমান বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ সকল প্রকার কর্মকাণ্ড দেশের ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশে উৎপাদিত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে সঠিক মানসম্পন্ন পণ্য তুলনামূলক কম ব্যয়ে উৎপাদন করে বিশ্ব বাজারে নিজেদের অবস্থান অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় সমুন্নত রাখতে হয়। অবাধ বাণিজ্যের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমশই সমন্বিত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যাকে একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ' বলা হয়ে থাকে।

আমরা দেখতে পাই যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক অগ্রগতির কারণে বিশ্ব অর্থনীতির একটি অংশে যা ঘটছে তার প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য দেশেও। দেশের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ব বাজারে বৃদ্ধি পেলে অধিকহারে দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ হয়ে শিল্পায়নে অগ্রগতি হয়, অপরদিকে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, ফলে বেকার সমস্যা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায়। এরূপ একটি সার্বিক অর্থনৈতিক ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির অনেকটা অগ্রগতি সাধিত হতে পারে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শিল্পায়ন ও পুঁজি বিনিয়োগ প্রধানত নির্ভর করে দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিল্প সম্পর্কের স্থিতিশীল অবস্থা ও পরিবেশের ওপর। বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাজার অত্যন্ত গতিশীল। যে দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করে এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের যোগান সহজলভ্য হয়, সে দেশেই অধিকহারে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। সুতরাং, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির পূর্বশর্ত হিসাবে বিনিয়োগে প্রতিকূল অবস্থা চিহ্নিত করে তা দূর করতে হবে এবং শ্রমিকের পেশাগত দক্ষতা এবং সাথে সাথে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর সব দেশেই মানবসম্পদ উন্নয়ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অনেকাংশে কম, যদিও সাম্প্রতিককালে এ সম্পদের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। তবে বিশেষ পরিকল্পনা ও লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচির এখনও অভাব রয়েছে।

সুতরাং উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটাতে হলে যেমন বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিতে দেশি ও বিদেশি পুঁজি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, পাশাপাশি উপযুক্ত প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কৌশলসম্পন্ন দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এ দুটির সমন্বয় অপরিহার্য, অন্যথায় বাংলাদেশের ন্যায় একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে মুক্ত বাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হবে।

মালিকপক্ষ গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে দেশের শিল্পোন্নয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর ঐকমত্যের ভিত্তিতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই শ্রমিক, মালিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। সরকার এ বিষয়ে সহযোগিতার হাত প্রসার করতে আগ্রহী। সরকারের এ আগ্রহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে সামাজিক ও শিল্পোন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা প্রয়োজন। আমরা দেখতে পাই সাম্প্রতিককালে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধুনা শিল্পোন্নত দেশসমূহ সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। এ দৃষ্টান্ত আমাদেরও অনুসরণ করা উচিত।

প্রতিবছর মে দিবস আসে এবং গতানুগতিকভাবে তা উদ্‌যাপনও করা হয়। কিন্তু এই মহান দিবস পালনের লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অগ্রগতি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা মনে করি, প্রতিবছর মে দিবস পালন উপলক্ষে পূর্বের বছরে পরিচালিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মূল্যায়নের পাশাপাশি নতুন বছরের জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা বা কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের পথ উন্মোচিত করতে পারে। এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য, অন্যথায় মে দিবস উদ্‌যাপন কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

বর্তমান সরকার বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা বাস্তবায়িত হলে শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথ উন্মোচিত হতে পারে। সুদের হার কমানো, নতুন শিল্প স্থাপনে সুবিধা ও উৎসাহ প্রদান, শ্রম আইন প্রণয়ন, বিধি প্রণয়ন, সেক্টরভিত্তিক মজুরি ঘোষণা, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ইপিজেডে নতুন শ্রম আইন প্রণয়ন, জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠনসহ বহুবিধ বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে শিল্প ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ও বিজিএমইএ'র শ্রমিক কল্যাণ কর্মসূচি

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সভাপতি
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক এবং
রপ্তানীকারক সমিতি (বিজিএমইএ)

গত দুই দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশাল পরিবর্তন এসেছে। এ সময়ে দেশে জনসংখ্যা এবং জীবন যাত্রার মান ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি আমাদের জাতীয় আয় বিশেষ করে বৈদেশিক অর্থ আয়ের ব্যাপ্তিও বেড়েছে। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে এদেশের রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাক শিল্প। গার্মেন্টস শিল্পে বিনিয়োগকারীদের দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা আর অভিজ্ঞতা এবং এই শিল্পে নিয়োজিত ৪৪ লক্ষ শ্রমিকের রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম গার্মেন্টস শিল্পকে দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

এই শিল্প থেকে দেশ গত অর্থবছর ২৬ বিলিয়ন ডলার আয় করছে যা দেশের মোট রপ্তানী আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ। পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ। এই শিল্পটি শুধু আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির পথটিই সুগম করেনি একই সাথে এই শিল্পটি দেশের নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছে। সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীও আজ তার মত প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে। এই শিল্পটি নারী শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে নারীর মতামত, নারীর জীবনের পুষ্টিমানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।

এই শিল্পের একজন উদ্যোক্তা হিসেবে আমি মনে করি, দেশের শ্রমিক ভাই-বোনদের নিরলস পরিশ্রম ব্যতিত এই শিল্পটি কখনই এ পর্যায়ে আসতে পারতো না। তারা এ শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর তাই আমরা এই শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিক ভাই-বোনদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টিকে সবসময় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আসছি। বিজিএমইএ শ্রমিক ভাই-বোন এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবন মান উন্নয়নে নানা উদ্যোগ গ্রহন করেছে। আমি এর কিছু অংশ তুলে ধরছি।

- বিজিএমইএ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, শারীরিকভাবে সুস্থ্য একজন মানুষ পারিবারিক, কর্মক্ষেত্র এবং সামাজিক জীবনে তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। এ কারনে বিজিএমইএ পোশাক শ্রমিক ভাই-বোনদের স্বাস্থ্যগত বিষয়ে সবসময় সজাগ। এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ভাইবোনদের জন্য বিজিএমইএ এ পর্যন্ত ঢাকায় ৮টি এবং চট্টগ্রামে ২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৬০ হাজার পোশাক শ্রমিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ দেয়া হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রে বিনামূল্যে এইচআইভি/এইডস, যক্ষা চিকিৎসা সেবা, পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- গার্মেন্টস কর্মীদের স্বল্প খরচে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিজিএমইএ'র তত্ত্বাবধানে ঢাকার মিরপুরে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে এবং চট্টগ্রামের হালিশহরে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।
- সুস্থ্য প্রজনন স্বাস্থ্য একজন মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। বিজিএমইএ গার্মেন্টস কর্মীদের সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিজিএমইএ ইউএনএফপিএ'র সহযোগিতায় পোশাক শিল্পের কর্মজীবী নারী ও পুরুষদের স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, জেন্ডার সমতা, (নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ), এইচআইভি/এইডস, শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক ভাই-বোন এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

- পোশাক শিল্পে কর্মজীবী ভাই-বোনদের কল্যাণের দিক বিবেচনা করে বিজিএমইএ ২০০২ সালে প্রথম বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু করে। এর আওতায় বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত কারখানার কোন শ্রমিক চাকুরীরত অবস্থায় যেকোন স্থানে মারা গেলে তার পরিবার দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে এবং দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হলেও একই পরিমান ক্ষতিপূরণ পাবে।

- শ্রমিকদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা সমাধানের জন্য বিজিএমইএ ২৬ এপ্রিল ১৯৯৮ সনে কনসিলিয়েশন-কাম-আরবিট্রেশন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়। এই কমিটির মাধ্যমে শ্রমিকদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান এবং জেলা ও দায়রা জজ এ কমিটির প্রধান। শ্রমিক ফেডারেশনের এবং মালিকপক্ষের সমসংখ্যক প্রতিনিধি এ কমিটির সদস্য। এ পর্যন্ত কমিটি ৮৯৭৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে, ফলে ৩৬৭২৫ জন শ্রমিক উপকৃত হয়েছে, ১৩,৭৫,৬৯,১৮৪ টাকা শ্রমিকদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

- শ্রম পরিদপ্তরের একজন অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম শ্রম পরিচালক-কে দ্বায়িত্ব প্রদান করে ট্রেড ইউনিয়ন এডভাইজরী সেল নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এ সেল ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করছে।

- শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই স্বার্থ রক্ষার্থে বিজিএমইএ প্রতিটি ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক ভাই-বোনদের সামগ্রিক তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডাটা বেইজ চালু করেছে।

- পোশাক শিল্পের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী করার উদ্দেশ্যে বিজিএমইএ ১৯৯৯ সালে ঢাকার উত্তরায় প্রথম ফ্যাশন ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়েছে। চট্টগ্রামেও উক্ত ইনষ্টিটিউটের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শাখা রয়েছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইনষ্টিটিউটে এমবিএ, সম্মানসহ পোস্ট-গ্রাজুয়েট এবং ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- বিজিএমইএ সরকারের সাথে সেনাবাহিনী ও জনশক্তি ব্যুরোর সহযোগিতায় গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, বগুড়া ও লালমনিরহাটে পাঁচটি ট্রেনিং সেন্টার ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় ২৭টি সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ণের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

- বিশ্ব ব্যাংক ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর-এর অর্থয়নে বিজিএমইএ দুইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। ২০১৪ সাল থেকে উক্ত দুইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ১৯২০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন কারখানাতে কর্মরত রয়েছে। প্রতি ব্যাচ প্রশিক্ষণ কালঃ ০১ মাস। প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ সোয়েটার নিটিং ও লিংকিং মেশিন অপারেশন। প্রশিক্ষণার্থীঃ প্রতি ব্যাচ-৬০ জন।

- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়-এর অর্থায়নে বিজিএমইএ ৩৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। প্রশিক্ষণের নামঃ বেসিক অপারেটর কোর্স (সোয়েটার নিটিং/লিংকিং এবং বেসিক মেশিন অপারেশন)। এ পর্যন্ত ৫০টি ব্যাচ -এ ১৫০০ জন প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। পরবর্তী ৫২ ব্যাচ-এর প্রশিক্ষণ চলছে। এ ছাড়াও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য নিউ এন্ট্রেন্স এবং আপ-স্কিল প্রোডাকশন প্লানিং, প্রোডাকটিভিটি, ফায়ার সেইফটি, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে।

- বিজিএমইএ ও জিআইজেড যৌথ উদ্যোগে পোশাক শিল্প কারখানার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। তিন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে- বাংলাদেশ শ্রম আইন ও সোস্যাল কমপ্লায়েন্স মোট ব্যাচ- ১৫টি অংশগ্রহণকারী- ৫৩৯ জন। বিএসসিআই কোড অব কনডাক্ট (BSCI Code of Conduct) মোট ব্যাচ- ৫টি অংশগ্রহণকারী- ১৮৬ জন। র‌্যাপ কোড অব কনডাক্ট (WRAP Code of Conduct) অংশগ্রহণকারী- ৩২ জন।

- পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের সন্তানদের বিনামূল্যে লেখাপড়ার সুবিধার্থে বিজিএমইএ ৫টি স্কুল পরিচালনা করে আসছে।

- শ্রমিক ভাই-বোনদের কল্যাণমূখী কর্মকাণ্ডের প্রয়াসে আমরা মে ২০০৭ হতে পোশাক শিল্প শ্রমিক ভাই-বোনদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং দক্ষ কর্মীদের সনদপত্র প্রদানের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।

- কর্মজীবী মায়েদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পোশাক শিল্পের মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে যারা গর্ভবতী বা শিশু-সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এবং মাসিক আয় ৫,০০০/- টাকার নীচে, তাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় মাসিক ৩৫০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

- বিজিএমইএ'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিজিএমইএ'র সদস্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের শ্রম আইন ও শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে এক দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫২৯টি কারখানার ১২৫১ জন কর্মকর্তা ও শ্রমিক এ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছে। এ প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া।

- আইএলও'র সহযোগিতায় ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে "কর্মক্ষেত্রে কার্যকর সহযোগিতা শীর্ষক দুই-দিন ব্যাপী চারটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ২৮টি কারখানার ১১২ জন কারখানার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা ও অংশগ্রহণকারী কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। চলতি ২০১৬ সালে অনুরূপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে।

- আইএলও'র সার্বিক সহযোগিতায় বিজিএমইএ'র সদস্য কারখানাতে "পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা" সংক্রান্ত একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জুন, ২০১৫ থেকে শুরু করে এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত ৪৫০টি কারখানার (বিজিএমইএ-২৭৫ বিকেএমইএ-১৭৫) ৮,০০০ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাকে (বিজিএমইএ ৪,৫০০ বিকেএমইএ ৩,৫০০) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি বছরের মে, ২০১৬ মাস থেকে কারখানা পর্যায়ে আট লক্ষ শ্রমিককে এ প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম শুরু হবে।

- বিজিএমইএ'র সেইফটি শাখা ১৯৯৭ সাল থেকে অগ্নি সংক্রান্ত যে কোন দুর্ঘটনা হতে রা পাবার জন্য প্রতিটি পোশাক কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাগণকে প্রতিনিয়ত অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ২০১৩ সালে এ শাখায় আরও ৩৫ জনকে প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাক্তন সেনা সদস্য। উক্ত প্রশিক্ষকগণ এ পর্যন্ত ১,০৩,০৬৮ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় এ পর্যন্ত ২০,১৮৮ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আমরা প্রতিটি কারখানায় এ কর্মসূচী সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

- শ্রমিকদের চিত্ত বিনোদন এবং উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পোশাক কর্মীদের গানের প্রতিযোগিতা "সর্ব" এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনসহ চট্টগ্রামে আব্দুল আজিজ স্টেডিয়ামে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক ভাই-বোনদের নিয়ে এবং ঢাকার কমলাপুরে বীর শ্রেষ্ঠ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম-এ এক লক্ষ শ্রমিক ভাই-বোনদের নিয়ে দুইটি পোশাক শ্রমিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বিজিএমইএ মনে করে, এ বিশ্বায়নের যুগে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে উদ্যোক্তা, ক্রেতা, শ্রমিক ভাই-বোন সবারই শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে। শ্রমিক ভাই-বোনেরা যাতে উন্নত জীবনের অধিকারী হয়, সেজন্য উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ক্রেতাদেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে শিল্পে যাতে শান্তি শৃংখলা বজায় থাকে, সেক্ষেত্রে শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে জাতিকে পোশাক খাত থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের অঙ্গীকার আমরা করেছি, তা বাস্তবায়নের জন্য সকল উদ্যোক্তা, ক্রেতা, শ্রমিক ভাই-বোন, সরকার সবাইকে একযোগে শিল্পের জন্য কাজ করতে হবে।

OSH:একটিপর্যালোচনা

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
(অতিরিক্ত সচিব)
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ভূমিকা: OSH এর পূর্ণাঙ্গরূপ Occupational Saftey and Health বাংলাদেশ শ্রমআইন-২০০৬-এরধারা২-এ এর কোনো সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা বাংলা করলে দাঁড়ায়: পেশাগত স্বাস্থ্য বলতে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদ সংক্রান্ত সকল প্রকার ঝুঁকির প্রাথমিক প্রতিরোধ করা (occupational health deals with all aspects of health and safety in the workplace and has a strong focus on primary prevention of hazards)। পেশাগত স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত একটি বহুমাত্রিক বিষয় যা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিককে কর্মক্ষম রাখে যাতে স্বাস্থ্যের ন্যূনতম ক্ষতি হয়।

১৯৫০ সাল হতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা পেশাগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি সাধারণ সংজ্ঞাকে যৌথভাবে প্রতিপালন করে আসছে যাকে প্রথম ১৯৫০ সালের প্রথম অধিবেশনে এবং ১৯৯৫ সালে বারোতম অধিবেশনে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ:

The main focus in occupational health is on three different objectives: (i) the maintenance and promotion of workers' health and working capacity; (ii) the improvement of working environment and work to become conducive to safety and health and (iii) development of work organizations and working cultures in a direction which supports health and safety at work and in doing so also promotes a positive social climate and smooth operation and may enhance productivity of the undertakings.

The concept of working culture is intended in this context to mean a reflection of the essential value systems adopted by the undertaking concerned. Such a culture is reflected in practice in the managerial systems, personnel policy, principles for participation, training policies and quality management of the undertaking."

বিস্তৃতি ও ইতিহাস: পেশাগত স্বাস্থ্যে ব্যাপক এরিয়া সম্পৃক্ত যাতে medicine, psychology, epidemiology, physiotherapy ও rehabilitation,occupational therapy, occupational medicine, human factors ও ergonomics এবং অন্যান্য আরো বিষয়।

পেশাগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য: সকল পেশায় শ্রমিকদের সর্বোচ্চ মাত্রায় শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ; কর্মাবস্থার কারণে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবনতিতে কর্মস্থল ত্যাগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; সুস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহের কারণে উদ্ভূত ঝুঁকি থেকে শ্রমিকদের কর্মস্থল ত্যাগে সুরক্ষা প্রদান এবং শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার সহিত খাপ খাবে এমন পেশাগত পরিবেশের সাথে শ্রমিকদের নিয়োগ প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, বিভিন্ন সূতাকলে কর্মরত শিশুদের দুর্বল স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ১৮৩৩ সালে তৎকালিন বৃটিশ সরকার Factory Acts প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য Factory Inspectorate স্থাপন করে। এই ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরেটের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিলো সূতাকলে কর্মরত শিশু ও

তরুণদের কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করে দেয়া যাতে অতিমাত্রায় অতিরিক্ত খাটুনিতে দুর্বল ও বিকলাঙ্গ না হয়ে যায় এবং উচ্চ হারের দূর্ঘটনা কমানো যায়। পরবর্তীতে সূতাকলে নারী শ্রমিকদের একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ১৮৪৪ সালে আরেকটি আইন প্রণয়ন করা হয়; এই আইনে সূতাকলে যন্ত্রের সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অপরদিকে ১৮৪০ সালে একটি Royal Commission খনিশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রকাশ করে, যাতে বলা হয় যে, খনিশিল্পের কর্মপরিবেশ খুবই ভয়াবহ রকমের খারাপ এবং সেখানে উচ্চ হারে দূর্ঘটনা ঘটছে। এই প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৪২ সালে প্রণীত আইনের মাধ্যমে খনিসমূহে পরিদর্শনের জন্য একটি ইন্সপেক্টরেট স্থাপন করা হয়। এই ইন্সপেক্টরেট আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বহু মামলা দায়ের করে, যাতে খনিসমূহে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়।

পেশাগত বিপদ বা Occupational hazard: পেশাগত বিপদ বা Occupational hazard যাকে কর্মস্থলের বিপদ (Workplace hazards) বলা যায় যা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের বিপদের মধ্যে আছে রাসায়নিক ও জৈবিক প্রভাবক, শারীরিক বিষয়, প্রতিকূল অরগানোমিক অবস্থা, এলার্জেন, নিরাপত্তা ঝুঁকির জটিল নেটওয়ার্ক এবং মানসিক ঝুঁকি ফ্যাক্টরের ব্যাপক এরিয়া। অধিকাংশ হ্যাজার্ড ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে এড়ানো যায়।

শারীরিক বিপদ বা Physical hazards কর্মক্ষেত্রে বহু শ্রমিককে আক্রান্ত করে। শারীরিক হ্যাজার্ডের অন্যতম হলো শ্রবণ শক্তি হ্রাস পাওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর কমপক্ষে দুই কোটি কুড়ি লক্ষ (২২ মিলিয়ন) শ্রমিক শব্দ দুষণে আক্রান্ত হয় এবং প্রতিবছর শ্রবনশক্তি হারানোয় ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৪ কোটি ২০ লক্ষ (২৪২ মিলিয়ন) ইউএস ডলার ব্যয় হচ্ছে। যে সকল কারখানায় উৎপাদনের জন্য উচ্চ শব্দের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেসব কারখানায় মারাত্মক শব্দদূষণ থাকে। শারীরিক হ্যাজার্ডের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু উপর থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হওয়া বা মৃত্যুবরণ করা। এমন দূর্ঘটনা ঘটে থাকে নির্মাণ, নিষ্কাশন, পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিল্ডিং পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে। যন্ত্রাংশ পরিবর্তনকালে, কোনো যন্ত্রের তীক্ষ্ণ অংশ, মেশিনের উত্তপ্ত উপরিতল এবং এরকম অন্যান্য হ্যাজার্ড শ্রমিকদের শারীরিকভাবে নিয়মিত ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

জৈবিক বিপদ বা Biological hazards (biohazards) বিভিন্ন ছোঁয়াচে অনুজীব যেমন ভাইরাস ও বিষাক্ত পদার্থ বিভিন্ন জীবাণু যেমন এনথ্রাক্স দ্বারা হয়ে থাকে। অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিকগণ বায়োহ্যাজার্ড দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা। কারখানার বাইরে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকরা হরহামেশা বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন অপ্রচলিত সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গাছ, প্যাথোজেন, বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগ ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

কারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থও কর্মক্ষেত্রে রাসায়নিক বিপদ বা chemical hazard এর কারণ হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের বিপদসংকুল রাসায়নিক পদার্থ আছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য- neurotoxins, immune agents, dermatologic agents, carcinogens, reproductive toxins, systemic toxins, Asthmagens, Pneumoconiotic agents, and sensitizers. কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে যা নিম্নমাত্রায় অন্যকোনো রাসায়নিক পদাথের সাথে মিশ্রিত করলেও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রায় ক্ষেত্রে ক্যান্সার হয়ে থাকে।

মানসিক বিপদ তথা Psychosocial hazards বলতে চাকরির স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা, অতিরিক্ত খাটুনি, অসামাঞ্জস্যপূর্ণ বেতন, অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনা ঘটা ও যেকোনো অজুহাতে মালিক কর্তৃক কারখানা বন্ধ করে দেয়ার দুশ্চিন্তা ইত্যাদি বুঝায়। বিশেষ সেক্টর ও কারখানার উপর ভিত্তি করে বিশেষ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির ফ্যাক্টর বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ভবন নির্মাণ কাজের ঝুঁকি হলো উপর থেকে পড়ে যাওয়া, অপর দিকে মৎস শিকারিদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, নির্মাণ, মাছ ধরা, নভশ্চরণ, কাঠ বা ভারি জিনিস বহন, ধাতব বস্তু নিয়ে কাজ, কৃষি, খনিতে কাজ ও পরিবহন সেক্টরে কাজ করা অধিকতর

অধিকতর বিপজ্জনক। আর কর্মক্ষেত্রে সন্ত্রাস মানসিক হ্যাজার্ডসমূহের মধ্যে বেশি বিপজ্জনক। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বিপজ্জনক পেশা হলো নির্মাণকাজ, যাতে সবচেয়ে বেশি দূর্ঘটনা ঘটে পঙ্গুত্ব বরণ করে অথবা মারা যায়। যথোপযুক্ত দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যেমন-মজবুত মই, খাঁচা, হেলমেট, ইত্যাদি ব্যবহার করা হলে বিপদের ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে আনা যায়। প্রয়োজনে কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এ সেক্টরে কঠোর আইন করা যেতে পারে।

কৃষি খামারের শ্রমিকরা কৃষিকাজ সম্পর্কিত জখম, ফুসফুসের প্রদাহ, শব্দদূষণের জন্য শ্রবণশক্তি হারানো, চামড়া রোগ, বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক/দীর্ঘসময় ধরে রোদে থাকায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। যান্ত্রিক কৃষি খামারে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে শ্রমিকরা বিভিন্ন সময়ে জখম হতে পারে, তাছাড়া চাষের জন্য ব্যবহৃত ট্রাক্টরে বহু শ্রমিক আহত হয়ে থাকে। এসব হ্যাজার্ড থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য মেশিনে যথোপযুক্ত গার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

খনি, তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে কাজের ধরণটাই ঝুঁকিপূর্ণ; তাছাড়া হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল ব্যবহারের কারণে শ্রমিকদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। এসব ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকরা বাষ্প, গ্যাস, ধূলিকণা, ধোঁয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের খনিতে কর্মরত শ্রমিকরা সপ্তাহে ৬০ ঘন্টার বেশি কাজ করে থাকে এবং ভাগাভাগি করে ধূমপান করে থাকে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

একইভাবে স্বাস্থ্য সেক্টরে কর্মরত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী শ্রমিকরা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করতে হয় বিধায় ঐসব রাসায়নিক পদার্থে ঝুঁকিতে থাকতে হয় ওদের। কঠোরভাবে দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী শ্রমিকরা ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পারে।

ব্যবস্থাপনা: ২০০১ সালে বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা করার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ILO-OSH ২০০১ প্রকাশ করে যাকে "Guidelines on occupational safety and health management systems" বলা হয়। এই গাইডলাইন বিভিন্ন কারখানার মালিককে কর্মক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করে আসছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশভিত্তিক আন্তর্জাতিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্পেসিফিকেশন তৈরি করা হয়েছে; যেমন- OHSAS 18000, OHSAS 18001, BS OHSAS 18001। ISO standards series এর ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে বৃটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের উপাদানের স্ট্যাণ্ডার্ড BS OHSAS 18001 প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ISO সনদপ্রদান করা হয়ে থাকে। ISO 9001 পণ্যেরমান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি এবং ISO ১৪০০১ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের পদ্বতির জন্য সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে। OSH ব্যবস্থাপনার নীতি ও দায়দায়িত্ব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যা তা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিন্ন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ড সনাক্তকরণ: OSH এর ক্ষেত্রে এই টার্মিনোলোজি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হলেও সাধারণভাবে বলা যায় যে,

- হ্যাজার্ড এমন একটি বিষয় যা নিয়ন্ত্রণ না করলে ক্ষতিকর;
- অনিয়ন্ত্রিত হ্যাজার্ডের ফলাফল হলো ক্ষতি যাকে আউটকাম বলা হয়ে থাকে; এবং
- ঝুঁকি বা রিস্ক হলো নির্দিষ্ট আউটকামের সম্ভাব্যতা ও ক্ষতির ব্যাপকতার সম্মিলিত রূপ।

অন্যক্ষেত্রে পরিবেশগত বিনাশ বা যান্ত্রিক বিনাশ বর্ণনার জন্য "Hazard", "risk" ও "outcome" শব্দ তিনটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। OSH ব্যবস্থাপনায় Harm বা ক্ষতি বলতে কোনো শ্রমিকের শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক হিতের অস্থায়ী বা স্থায়ী সরাসরি বা প্রকারান্তরে হ্রাস। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কর্মক্ষেত্রে ক্রমাগত কোনো ভারি বস্তু হাতের সাহায্যে (Manual) স্থানান্তর করা/তোলা একটি হ্যাজার্ড।

এর আউটকাম হতে পারে musculoskeletal disorder বা প্রখর পিঠ ব্যথা বা জয়েন্টের জখম। রিস্ক বা ঝুঁকি গাণিতিকভাবে এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, বছরে এর ফলাফল ০.০৫ বা ৫০/৫০।

বিপদ সনাক্তকরণ (Hazard identification): ঝুঁকি নির্ধারণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্বতিতে হ্যাজার্ড সনাক্তকরণ বা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পেশাগত দূর্ঘটনা ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে হ্যাজার্ড সনাক্তকরণ প্রয়োজন সর্বাগ্রে। হ্যাজার্ড কি বা কোনটা তা যদি বুঝা না যায় বা সনাক্ত করা না যায়, তাহলে দূর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধি কমিয়ে আনা যাবে না। তাই প্রত্যেক কারখানায় কাজের ধরন অনুযায়ী হ্যাজার্ড কি বা কি কি কারণে পেশাগত হ্যাজার্ড আছে বা হতে পারে, তা সনাক্ত করা প্রয়োজন, তাহলে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব।

ঝুঁকি নির্ধারণ (Risk assessment) : ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিকে এমন লেভেলে নিয়ে আসতে হবে যাতে কর্মক্ষেত্রে তা সহনীয় অবস্থায় থাকে এবং শ্রমিকরা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। এর জন্য প্রথমে ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হবে। ঝুঁকি নির্ধারিত হয়ে গেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা কমানো বা দূরিভূত করা যায়। ঝুঁকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয় গুলোর উপর নজর দিতে হবে:

- বিপদ বা হ্যাজার্ড সনাক্ত করা
- হ্যাজার্ড আক্রান্ত সকলকে সনাক্ত করা এবং কেনো আক্রান্ত হলো তা বের করা
- ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা; এবং
- নিয়ন্ত্রণের উপায় বের করা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা।

ক্ষতির সম্ভাব্যতা ও ফলাফলের ভয়াবহতার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি গণনা করা হয়ে থাকে। সংখ্যা তত্ত্বের ভিত্তিতে নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ-এই তিন ভাগে ঝুঁকি নির্ধারণ করা যেতে পারে। একটি নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর এই ঝুঁকি নির্ধারণ করে যেতে হবে। কখনো কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিলে তা পর্যালোচনা করতে হবে। ঝুঁকি নির্ধারণ কার্যক্রমে তা নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ থাকতে হবে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ প্রয়োগ করা হলে, নির্ধারিত সময় পর ঝুঁকি পুনরায় গণনা বা নির্ধারণ করতে হবে এবং সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া এমন হবে যেমন উচ্চমাত্রা থেকে মধ্যম মাত্রা, মধ্যম মাত্রা থেকে নিম্ন মাত্রা।

সমকালীন উন্নয়ন: বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা যৌথভাবে উন্নয়নশীল দেশেগুলোয় শ্রম পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশে শ্রমিকদের কর্মসংশ্লিষ্ট দুর্বলতা ও দূর্ঘটনায় অধিক অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ২০০৭ সালের এক জরিপে দেখা গিয়েছে যে, যে সকল দেশে OSH ব্যবস্থাপনা দুর্বল, সেসকল দেশে কর্ম-সংশ্লিষ্ট দুর্বলতা ও দূর্ঘটনায় জিডিপি'র একটি উচ্চ পরিমাণ অংশ ব্যয় করা হচ্ছে এবং এ খাতে ব্যয়ের জন্য অর্থ গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনক্ষম খাত থেকে উঠিয়ে আনতে হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গবেষণা করে বলেছে যে, ল্যাটিন আমেরিকায় কর্ম-সংশ্লিষ্ট দুর্বলতা ও দূর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য জিডিপি'র ১০% অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নে ২.৬% থেকে ৩.৮% মাত্র। কিছু উন্নয়নশীল দেশে কারখানায় এখনো এসবেস্টস ব্যবহার করা হচ্ছে, যা খুবই খারাপ একটি হ্যাজার্ড। এই এসবেস্টস ব্যবহারের কারণে এসবেস্টস-সংশ্লিষ্ট পেশাগত ব্যাধি আগামীতে মারাত্মক আকার ধারন করতে পারে।

Nanotechnology: ন্যানোটেকনোলজি সাম্প্রতিককালের একটি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি। ২০০৬ সালে সুইস সার্ভে এক শত কোম্পানিতে ৪০টি প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্নপত্র বিলি করে ন্যানোপার্টিকুলেট ম্যাটার (Nanoparticulate Matter) উৎপন্ন বা ব্যবহার বিষয়ে ৬০ ভাগ কোম্পানি বলেছে যে, ন্যানোপার্টিকুলেট ম্যাটার ব্যবহারে তাদের কোম্পানিতে আনুষ্ঠানিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নেই। উন্নত দেশগুলোয় OSH প্রফেশনালদের জন্য ন্যানোটেকনোলজি একটি নতুন ইস্যু যা, আগামীতে দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে কারণ, ন্যানোস্ট্রাকচার আরো জটিল হবে। তখন ব্যক্তিগত দৈহিক

নিরাপত্তা সরঞ্জাম অকেজো হয়ে যাবে।

ন্যানোপার্টিকুলেট ম্যাটারের কারণে কারখানায় ব্যবহৃত ম্যাক্রো আকারের শিল্প-সম্পর্কিত বস্তুর টক্সিকোলোজি মূল্যমাণ সঠিক থাকবে না। কারণ, নাটকিয়ভাবে ন্যানোপার্টিকুলেট ম্যাটারের আকার কমতে থাকে এবং এর সারফেস বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারখানায় এই ন্যানোপার্টিকুলেট ম্যাটার বর্তমানে নুতন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এই ন্যানোপার্টিকুলেট ম্যাটারের আক্রমণ থেকে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সমকালীন নিয়ন্ত্রণের উপায় বের করতে হবে।

বিশ্ব পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য দিবস (World Day for Safety and Health at Work): কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার উদ্যোগে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল বিশ্ব পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য দিবস পালন করে আসছে। ২০০৩ সাল থেকে এই দিবস উদযাপন করা হচ্ছে।

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ: ১৭৫৭সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর বৃটিশ শাসনামলে পাক-ভারত উপমহাদেশে শিল্প-কারখানা স্থাপন শুরু হলেও বাংলাদেশ অংশে কোনো কারখানা স্থাপিত হয়নি-পাকিস্তান শাসনামলে গুটিকয়েক পাট ও বস্ত্রকল স্থাপিত হয়ে ছিল মাত্র। স্বাধীনতার পর আশির দশক থেকে পোষাকসহ বিভিন্ন ধরনের কারখানা স্থাপিত হতে থাকে। কিন্তু কারখানার মালিকগণ ব্যবস্থাপনায় অনভিজ্ঞ থাকায় কর্মস্থলের নিরাপত্তা তথা পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিয়ে তেমন ভাবেননি। বাংলাদেশে কলকারখানায় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- ২০১৩ সালে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় পর্যায়ে OSH Council গঠন করা হয়েছে।
- OSH Kits প্রণয়ন করা হচ্ছে।
- DIFE-তে OSH Unit গঠন করা হয়েছে।
- কারখানাগুলোয় গঠিত সেইফটি কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।
- এ বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহার: শিল্প-কারখানা গুলো Compliance হলেও OSH ব্যবস্থাপনায় সুশাসন না থাকলে কর্মরত শ্রমিক গণ পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত ও কর্মস্থলে দূর্ঘটনায় পতিত হতে থাকবে। একজন শ্রমিক পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে প্রথম দিকে তা বুঝা না গেলেও পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় এবং তখন কারখানার মালিক চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করলেও শারীরিক যন্ত্রণা শ্রমিককেই ভোগ করতে হয়। একই ভাবে কর্মক্ষেত্রে কোনো শ্রমিক দূর্ঘটনায় পতিত হলে মালিক চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করলে ও ভোগান্তি ও ক্ষতি শ্রমিকেরই হয়ে থাকে। কারখানার কাজের ধরন অনুযায়ী দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে রক্ষা পাওয়া যায়। চিকিৎসা গ্রহণের চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম। এর জন্য প্রয়োজন শ্রমিকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা। এ দায়িত্বটা মালিকপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

১৬

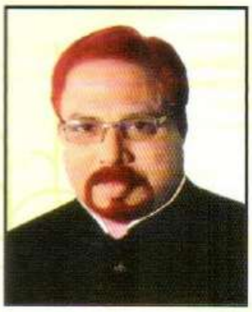

বাংলাদেশের শ্রমিক কল্যাণে মহান মে দিবস

আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ
সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

আট ঘন্টা কাজ, আট ঘন্টা বিশ্রাম-বিনোদন, আট ঘন্টা নিদ্রা। মে দিবসের রক্তাক্ত আন্দোলনের এই ছিল মর্মবাণী। শ্রমজীবী মানুষের দাবী আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ ১লা মে ১৮৮৬। তারপর ১৩০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। ২০১৬ সালের মহান মে দিবস আমাদের সামনে সমাগত। যে দাবী ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের পূর্বসূরীরা বুকের তাজা খুন ঢেলে দিয়েছিলেন, তারই সফল বাস্তবায়নের স্বর্ণ যুগে আমাদের বসবাস।

বাংলার ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসনের ২০০ বছরের শোষণ-বঞ্চনার যুগ না পেরুতেই বাংলার মানুষের উপর নেমে আসে পাকিস্তানী সরকারের দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের কালো অধ্যায়।

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান পাকিস্তানী শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষে ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর বাংলার মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের প্রিয় সংগ্রামী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর শোষণের শৃঙ্খল ভাঙতে বঙ্গবন্ধু ডাক দেন স্বাধীনতার। ঐক্যবদ্ধ করেন শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতাকে। বিজয় অর্জিত হয় বাঙালি জাতির। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষে শ্রমিক-কৃষকদের সাথে নিয়ে শুরু করেন নতুন এক অর্থনৈতিক বিপ্লব ও খাদ্য ঘাটতি কমানোর জন্য কৃষি বিপ্লব।

কিন্তু ১৯৭৫ সাল, ১৫ আগস্ট, কালো রাতে বাঙ্গালী জাতির জীবনে নেমে আসে এক কলঙ্কময় ইতিহাস। স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক উচ্চভিলাসী সামরিক কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। শোষণ-বঞ্চনাহীন, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যহীণ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, খুনী-ক্ষমতালোভীরা বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে দেয় নি। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাদেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য ১লা মে "মহান মে দিবস" সরকারি ছুটির ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু শ্রমজীবী মানুষের জন্য অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের পথ সুগম করেন এবং শ্রমিকদের কল্যাণে International Labour Organization (ILO) এর তৎকালিন সকল কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেন। তিনি উৎপাদনের লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশ নিশ্চিত করতে এদেশের সকল কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা খাত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় খাতে অধিগ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করে শ্রমিকদের মালিক বানিয়ে দেন।

বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের দ্বিতীয় মেয়াদেও ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ৩য় মেয়াদেও তিনি দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছেন।

দেশের সর্ববৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন সহ সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকদের চাকরির বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছর বাস্তবায়ন করেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

করেছেন। ইতোমধ্যে কর্মচারীদের জন্য দুই দুইবার জাতীয় পে-স্কেল ঘোষণা করেছেন। প্রায় প্রতিটি শিল্প সেক্টরে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন করেছেন। রাষ্ট্রীয়াত্ত খাতের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠন করেছেন। বিএনপি-জামাত জোট সরকার আমলে তড়িঘড়ি করে ঘোষিত বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও আইএলও কনভেনশনের আলোকে একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন মহান জাতীয় সংসদে পাশ করেছেন।

২০১৩ সালে জুলাই মাসে মহান জাতীয় সংসদে এ আইন সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন, শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন ও প্রণয়ন করেছেন। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন, নাবিকদের জন্য মেরিটাইমস আইনের সংশোধন, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন, জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন, শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করছেন।

ব্যক্তিমালিকাধীন বেসরকারি সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন, শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যাক শ্রম গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে এক গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শ্রমিকদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৮ ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাস্তবমূখী বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। দীর্ঘ দিনের জঞ্জাল মুক্ত করে প্রগতি ও অগ্রগতির আলোকরশ্মি দেখতে একটু সময় লাগবে- এটাই সমাজ বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়ম। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা রয়েছে অনেক। যদিও গত কয়েক বছরে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান কমে এসেছে জ্যামিতিক হারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্রে উন্নত দেশে পরিণত করার কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন।

তথাপি মহান মে দিবস ২০১৬ এর পাদমূলে এসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ রত্ন শেখ হাসিনার কাছে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আবেদন, পে-কমিশন ও মুজুরী কমিশনের বাইরে দেশের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সেক্টর Informal Economy (নির্মান, রিকসা-ভ্যান, পরিবহন, দর্জি, কুলি, নৌকা মাঝি, গৃহ শ্রমিক, দোকান পাট, হকার্স)-তে কর্মরত শ্রমিকদের Social Security এর আওতায় এনে অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা করা এবং কর্মক্ষম ও বার্ধক্যে উপনীত অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য পর্যায়ক্রমে পেনশন স্কিম চালু করা, নারী শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় নারী শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি হাউস ও ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মান এবং জেলা পর্যায়ে শ্রম আদালত গঠন সময়ের অপরিহার্য দাবী।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের যে কোন ন্যায় ও যুক্তি সংগত প্রত্যাশা পূরণে অতীতের ন্যায় সকল ক্ষেত্রে সদয় দৃষ্টি প্রদান করবেন।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

শ্রমের সেকাল একাল

এস.এম.জাহেদুল করিম
যুগ্ম সচিব (বাজেট)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সব সময় ছোট বেলার কথা ভাবতে ভাল লাগে। ভাল লাগবেই না কেন, কারণ এখন যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে জীবনটাকে যান্ত্রিক মনে হয়। কোথাও অবসর নেওয়ার ফুরসত নেই। নেই খোলা মাঠ প্রান্তর, নদী পাখী ফসলের হাতছানি, পথে মাঠে ঘাঠে নাম হারা ফুলের বাহার। তবুও কিছু কিছু আকন্দের গাছ বেগুনি ফুলে ফুলে ভরে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকতে এখনো দেখা যায়।

একটি গৃহস্থ বাড়িতে থাকার ঘর ছাড়াও থাকত বৈঠকখানা। সামনে কোণায় গোয়াল ঘর। খড়ের উঁচু পালা। এসব আর চোখে পড়ে না। বাড়ীতে থাকতো বছর ওয়ারী শ্রমিক, যাকে বলতাম আমরা "বছর কামলা"। ঘর গেরস্থ বাজার ঘাট গোয়াল গরু সামলানই ছিল তার দায়িত্ব, এছাড়াও ফসলের মাঠেও তার ছিল নিয়মিত উপস্থিতি। গৃহস্থের সাথে সে বিকালে হাটে বাজারে যেত। বাজার খরচগুলি ডালা ঝুড়ি বা ঝাকায় করে সন্ধ্যায় ফিরতো। রাতে গরুগুলি গোয়ালে উঠাতো। আর জোছনা রাতে বসে বাঁশের চটা দিয়ে টোপা অথবা টুপরি বানাতো কেউ কেউ। খেত আমাদের পাশাপাশি বসে। বিশেষ করে রাতের খাবার। মাদুর বা সপের পাশে পিড়ি নিয়ে বসে খেত। আমরা যা খাই তাই খেতো। আমরা যদি দুধ-ভাত খেতাম, সেও দুধ ভাত-ভাত খেত। রাতে থাকতো বৈঠক খানায়। আরো দুই এক জন বছর কামলা যারা অন্য গৃহস্থ বাড়ীতে থাকতো তাদের সাথে। বৈঠকখানা মূলত ছিল আত্মীয়-মেহমানদের জন্য। তবে আত্মীয়-মেহমান আসলে তাদের (বছর কামলা) থাকার ব্যবস্থা অন্যত্র করা হতো। যাহোক রাতে ঘুমাবার আগে বছর কামলার অনেককে সুন্দর করে কিসসা বলতে দেখেছি। ওরা আমাদের চেয়ে বয়সে বেশ কিছুটা বড় ছিল। তাই ওদের কিসসা বলা মন্ত্র মুগ্ধের মতো শুনতাম। আর রুপকথার রাজ্যে হারিয়ে যেতাম।

দিনের বেলা দৈনিক হিসেবে যারা মজুর খাটতো এরা গ্রামের অথবা আশে পাশের গ্রামের। মোটামুটি গৃহস্থ নির্দিষ্ট করা থাকতো। সামান্য মজুরী পেতো দু-তিন টাকা হতে পারে। আর তিন বেলা খাওয়া পেতো। তবে তার মধ্যে রাতের খাবার তারা না খেয়ে আন্দাজ মতো চাল নিয়ে যেত, সেটা দিয়ে তার নিজের বাড়িতে সন্তানদের সাথে খেতো।

শিকাগো শহরে গুলি চললো। রক্তাক্ত হলো। শ্রমিকের রক্তে তাদের অধিকার আদায় হলো ঠিকই কিন্তু কৃষি শ্রমিকদের ভাগ্যে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

এখন অবশ্য কৃষি শ্রমিকদের মজুরী বেড়েছে, তা ৩০০ টাকার মতো হতে পারে। তবে আগের আন্তরিক কর্ম পরিবেশ দেখা যায় না। সব জায়গায় Bargaining পদ্ধতি। আন্তরিকতা যেখানে নিম্নমূখী। কল-কারখানার শ্রমিকদের বিশেষ করে আমাদের দেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের কল্যাণে আর্ন্তজাতিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষে এ দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের।

সব সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য তাদের কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করে বিশেষ করে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও জিডিপিতে অবদান রাখার কাজগুলি এ মন্ত্রণালয় দেখভাল করছে। এ ছাড়াও শ্রমিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের জন্য এ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য কাজ করে থাকে।

এ ছাড়াও শিশু শ্রম নিরসন করা, আহত, নিহত শ্রমিক সাহায্য সহায়তা প্রদান, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে থাকে। অনেক কলকারখানায় Day Care Center ও Breast Feeding Corner- চালু করা হয়েছে। দুর্ঘটনা মুক্ত রাখার জন্য এবং কলকারখানায় শ্রমমান বজায় রাখার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থাসহ সকল বিষয়ে নজর রাখছে সরকার। ৩৮টি শিল্প সেক্টরে সম্মানজনক মজুরী নির্ধারণ করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের আবাসস্থল নির্মাণের বিষয়টি সরকারের চিন্তায় আছে। শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি ও তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও চিত্ত বিনোদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়টিও সরকারের চিন্তা চেতনায় অবশ্যই আছে। কোন কোন বিষয়ে ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সময়ের প্রয়োজনে শ্রমিকদের চাহিদা বাড়বে এবং তার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গৃহীত হবে উৎপাদন বাড়বে জিডিপি বাড়বে। উন্নয়নের ছোয়া লাগবে সর্বত্র। তবে একটি বিষয়ে আমাদের ভুললে চলবে না যে, সেটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি তা হলো শ্রমিক যেখানে কাজ করবে সেখানে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পূর্বে উল্লেখিত কৃষি শ্রমিকেরা কাজ করতো আন্তরিক পরিবেশে। তেমনি সকল কারখানা মিল ফ্যাক্টরীতে আন্তরিকতা বজায় রাখতে হবে। আইন করে বা বেশী বেতন/মজুরি দিয়ে সেটি সম্ভব নয়।

কৃষি শ্রমিকরা যেমন ফসল উৎপাদন, ফসল মাড়াই ও বাজারজাত করনে সহায়তা করে কৃষকের সেবা নিশ্চিত করে, সাথে সাথে দেশেরও সেবা করে থাকে। তেমনি করে কলকারখানা শ্রমিকদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে রফতানী বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি করে দেশের সেবা নিশ্চিত করতে হবে।
রচডেলের তাতীদের কথা আমরা জানি ছোট্ট পরিসরে উৎপাদন শুরু অত:পর নানা সমস্যা পেরিয়ে সমবায় পদ্ধতি উদ্ভাবন করে অবশেষে শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছিল, তেমনি করে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে একটি আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে তাকে যেন নিভে না দেই সেভাবে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের শ্রম, আমাদের ঘাম উৎপাদন উন্নয়ন যেন হয় সভ্যতার সোপান।

প্রথমে আমি যেভাবে শুরু করেছিলাম সেটি হলো সেকালের দিনগুলি মধুময় ছিল কারণ মানুষের সরলতা ছিল। গৃহস্থের ছিল শ্রমিকের ছিল। মেলা এখনও হয় তখনও হতো। এখন মেলার ধরণ বদলে গেছে। যেমন- কম্পিউটার মেলা, টেক্স মেলা, কর্ম মেলা। কিন্তু তখনকার মেলা গুলিতে একটা মেলা মেলা ভাবের রস পাওয়া যেত, সেগুলি সব বয়সের মানুষকে আনন্দ দিত। কারণ মেলায় থাকতো হাস্যরস গান বাজনা, খেলা বিনোদনের ব্যবস্থা।

এখনকার মেলা গুলি অনেক সময় কাজ নির্ভর দায়িত্ব নির্ভর হয়, যেখানে হাস্যরস গান বাজনা, খেলা বিনোদন অনুপস্থিত। কাজেই আনন্দ ঘন পরিবেশ নিশ্চিত করলে বিশেষ করে শ্রমিকদের আনন্দ ঘন পরিবেশে কাজ করাতে পারলে তারা বেশী মনোযোগী হয়। আমি একটি উদাহরন দিয়ে লেখার ইতি টানছি।

ছেলের নাম লিতু। বয়স ৬ বছর ৬ মাস। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। প্রচন্ড পড়াশুনার চাপ। জোর করে তার স্কুলের পড়া টিউটর দিয়ে সেখানো হচ্ছে। কিন্তু সে পড়াশুনায় একেবারে অমনযোগী। স্কুলে যেতে চায় না। সে শুধু বাবা-মার সাথে বাইরে যেতে চায়। অথচ বাইরে যাওয়া হয় না। মাঝে মধ্যেই সে দোতালার বাসা থেকে জানালা দিয়ে জিনিস পত্র নীচে ফেলে দেয়। একদিন মোবাইল ফেলে দিল। এমন কেন করছে? একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে নেওয়া হলো। মনোবিজ্ঞানী বাবাকে বললো আপনি কি ছোট বেলায় শুধু স্কুলেই যেতেন নাকি মাঠে খেলতেও যেতেন?? নদীধারে যেতেন? ফুল দেখতেন? পাখী দেখতেন? বাবার উত্তর সবটাতে 'হ্যা'।

মনোবিজ্ঞানী বললো তাহলে ওর বেলায় 'না' কেন? পড়াটাকে খেলার সাথে যোগ করে দিন। আমার গল্পটি এখানেই শেষ। তবে শ্রমিকদের আনন্দঘন কর্ম পরিবেশ দিন ও কাজের সাথে আনন্দকে যোগ করে দিন।

১৬

মে দিবস ঃ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আর শেখ হাসিনার এগিয়ে চলা

মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক লীগ

বিশ্ব বিবেকের সর্বোচ্চ ফোরাম জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দাঁড়িয়ে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত- শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে'। শ্রমজীবী মানুষের সাথে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করতে তাঁর এ দুঃসাহসী চ্যালেঞ্জ উচ্চারণ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি এতটুকু। স্বৈরাচার এরশাদ তার সামরিক আইন থাকা কালে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের আহ্বান জানালে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ফিরিয়ে না দিলে তিনি সামরিক সরকারের সাথে কোন সংলাপে অংশ নেবেন না'। কারণ শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার আর তাদের জীবন মান উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতি আশা করা যায় না। ইতিহাসের গতিধারা তা শিক্ষা দিয়েছে।

১৮৮৬ সালের পহেলা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য আর দৈনিক আটঘন্টা কাজের দাবিতে শ্রমিক সমাবেশে ঘটে যাওয়া রক্তস্নাত ঘটনা শুধু শ্রমিক অধিকারই প্রতিষ্ঠিত করেনি, মানবাধিকারের জয়গানেরও পতাকা উড়িয়েছে। তাই আজ যারা বিশ্বের শ্রমিক অধিকার আদায়ের স্বর্ণোজ্জ্বল দিন হিসেবে পহেলা মে স্বীকৃত। সংগত কারণে বাংলাদেশেও এর যথার্থতা রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানী নরপিশাচ সরকার এদিনটিকে অবহেলা করলেও বঙ্গবন্ধু এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেননি। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে তাই শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বরোপ করেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশে প্রথম পহেলা মে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন এবং দিনটি যথাযথভাবে পালনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, শ্রমজীবী-মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। এদেশের শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে প্রচলন করেন অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকদের কল্যাণে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেছেন। তিনি মেহনতী শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ন্যায় সংগত মজুরী নির্ধারণ, পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, উন্নত কর্মপরিবেশ রক্ষা, শ্রমিকদের চাকুরির বয়স ৫৭ থেকে ৬০ বছরের উন্নীতকরণ, কর্মজীবী নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস থেকে ছয়মাস বৃদ্ধি, হোস্টেল নির্মাণ, মাতৃত্ব ভাতা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, শিশু শ্রম নিরসনে জাতীয় শিশু শ্রম নীতি- ২০১০ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিধানানুযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণে যুগোপযোগি আইন, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ কে ২০১৩ সালে সংশোধন করেছেন। শুধু তাই নয়-অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে দক্ষ শ্রম শক্তি ও মানব সম্পদ সৃজনের লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (National Skills Development Council) গঠন করেছে তার সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে যতগুলো সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে তার মধ্যে বঙ্গবন্ধু কণ্যা দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারই শ্রমিক বান্ধব সরকার হিসেবে সর্বাগ্রে বিবেচিত। বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের অধিকার আর জীবন সংগ্রামের যে অনুভূতির তাড়নায় শ্রমিক কল্যাণে কাজ শুরু

করেছিলেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা তা বাস্তবায়নে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর মতোই তিনি যথাযথই উপলব্ধি করেছেন। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি অভাবজনিত মানুষের অফুরন্ত শ্রম। তাই তাঁর সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব শ্রেণী ও পেশার মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নিরলসভাবে কাজ করছেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার রাষ্ট্রীয় খাতকে বেসরকারি খাতের পাশাপাশি শক্তিশালী করতে অনেক কল-কারখানা, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করেন। জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। বর্তমান শ্রমবান্ধব শেখ হাসিনার সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে স্বীয় দর্শন বাস্তবায়নের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করেছে।

মালিক শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্নমূখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলছেন। দেশের শিল্প খাতের উন্নয়নে সরকারের কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেছেন-এর জনবল তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। কিন্তু পথচলা অত্যান্ত দুর্গম কন্টকাকিণ্য। পদে পদে শুধু বাধাই না জীবন নাশের ঘটনাও ঘটেছে। সন্ত্রাস, নাশকতা আর সম্পদ ধ্বংস করার নানা কৌশলও চলছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে বিএনপি-জামায়াত এদেশের মানুষকে নিয়ে জীবন নাশের যে খেলা খেলেছে তা শুধু অবাক করাই নয় ভীতিকরও বটে। ২০১৪ সালে নির্বাচন বানচাল করার নামে বিএনপি-জামাত যেভাবে গাড়িতে আগুন দিয়ে পেট্রোল বোমা ছূড়ে মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, দেশ ও রাষ্ট্রকে মৃত্যুপুরী বানিয়ে নিজেরা ক্ষমতার মসনদ দখল করার চেষ্ঠা করেছে। যে মানুষের মুক্তির জন্য রাজনীতি সেই মানুষকে হত্যা করার এমন হীন খেলা কি কেউ কখনো, কোথাও দেখেছে?

রক্তগঙ্গা পাড়ি দেয়া ১৯৭১ এ ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তদান আর দু'ল মা-বোনের সম্ভ্রমহানির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করতে না করতেই ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ডের শিকার হয়ে স্বপরিবারে শহীদ হলেন। খুনীদের দাপটে চারিদিক কম্পমান হলেও জনতার রায়ে তার কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার শুরু করেন। আদালত খুনীদের ফাঁসির রায় দেয়। ২০০১ সালে শেখ হাসিনা সরকারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর পরবর্তী নির্বাচনে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর না করে স্বাধীনতা বিরোধী ও জামায়াতের সাথে গাটছড়া বাধেন। জনগণের কল্যাণ ও অগ্রগতির চেয়ে লুটপাট করে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে ওঠে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। ফলে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা পুনরায় ক্ষমতায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফাঁসির রায় কার্যকর করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেন। সাথে শুরু করেন যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচার প্রক্রিয়া। গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। ট্রাইবুনাল এ পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যুদণ্ড, দু'জনের আমৃত কারাদণ্ড রায় ঘোষণা করেছে। ইতোমধ্যে তিন জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। আমৃত্যু করাদণ্ডের দু'জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শুধু দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই নয়, দেশকে উন্নয়ন অগ্রগতির শিখরে নিয়ে পৌঁছেছেন। তাঁর আমলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ বহু উন্নয়ন হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দারিদ্র দূরীকরণ, কৃষি, শিক্ষা, খাদ্য,স্বাস্থ্য, পরিবহনসহ সব ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এরই মধ্যে জনগনের মাথাপিছু আয় দ্বিগুন হয়েছে। রিজার্ভের পরিমাণ সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আর আশ্চর্যজনক আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা একসময় কেউ

স্বপ্নেও কল্পনা করেনি, সেই পদ্মাসেতু আজ নিজ তহবিলেই তৈরী হচ্ছে - অন্যের সাহায্য ছাড়া।

শ্রম মর্যাদা যেমন শ্রমিককে কাজে উৎসাহিত করে, তেমনি কর্মদিপ্ত করে। তাই মে দিবসের চেতনায় উজ্জীবিত বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা। সত্য, ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী মানুষ সকল অবিচার অনাচার দূর করতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ ঐক্যবদ্ধ। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বেন দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা। আর তার সেই এগিয়ে যাবার পথে থাকবে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশ তার স্বাবলম্বিতার জন্যে বিশ্ববাসীর কাছে আলোচিত হবে।

“মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি”

শিক্ষা, দক্ষ জনশক্তি ও টেকসই উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

কাজী শাহজাহান
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা এবং উন্নয়ন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। স্বাধীনতার উত্তোরকাল থেকেই বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নের ইফসিত লক্ষ্যে পৌছাতে না পারলেও একটি সম্মানজনক পর্যায়ে পৌছেছে। সাড়ে সাত কোটি জনগোষ্ঠী থেকে আজকে বাংলাদেশ ১৬ কোটি জনসম্পদের দেশ। আশির দশক থেকে জাতিসংঘের বিভিন্ন শর্তাদি প্রতিপালন করে বাংলাদেশ তার উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ১৯৮৭ সালে ব্র্যান্ডল্যান্ড কমিশন উন্নয়নের নতুন মাত্রা যোগ করে। অর্থাৎ শুধু উন্নয়ন নয়, উন্নয়ন হতে হবে টেকসই। অন্যথায় কোন দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হবে এবং অনাগত প্রজন্মের জন্য তা শুভকর হবে না। এই কমিশন টেকসই উন্নয়নের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা প্রদান করে তাতে বলা হয়েছে "Sustainable development is a development that meets the need of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." এর সারকথা হলো বর্তমান এবং ভবিষ্যত এর সংযোগ করা। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন হবে ত্রিচক্রকাল ব্যাপি এবং আবশ্যিকভাবে কল্যাণকর। মূলত কল্যাণকর অর্থনীতিও টেকসই উন্নয়নের সাথে অঙ্গাআঙ্গিকভাবে সম্পর্কিত।

Will কনফারেন্স (১৯৯২), Earth Summit, UNESCO টেকসই উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেননা শিক্ষাই টেকসই উন্নয়নের একমাত্র নিয়ামক/প্রভাবক। শিক্ষা নাগরিককে তার অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। শিক্ষার টেকসই উন্নয়নের যে কয়টি অনুঘটক রয়েছে অর্থাৎ Biodiversity, Climate Change, Disaster risk Education, Culture Diversity, Poverty Reduction, Gender Equality, Health Promotion, Sustainable Lifestyle, Peace and Human Security, Access to Pure Drinking Water ও টেকসই নগরায়ন উল্লেখযোগ্য। এই কয়টি অনুঘটক টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করে। UNESCO ২০০৫-২০১৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের জন্য লিডিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশেও এটি লক্ষ্যনীয়। কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের চিন্তাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের পাশাপাশি ইউনেসকো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এর প্রমাণ মেলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১০ সালের শিক্ষানীতি।

শিক্ষার মূল লক্ষ্য মানুষকে তাঁর অন্তরআত্মা বিকশিত করার পাশাপাশি সামাজিক জীবনে সম্মান, মর্যাদা এবং সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে বেঁচে থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টা। মূলত এই মর্মকথাকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। সংগত কারণে এই শিক্ষা ব্যবস্থাপনা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কতটুকু টেকসই। আমরা জানি যে, বিশ্ব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে আরও উপভোগ্য এবং চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমরা তার জন্য কতটুকু প্রস্তুত। কিংবা আমাদের কী করণীয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দিকে তাকালে একনজরে আমরা দেখতে পাবো যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ব্যবস্থাপনার কোথায় যেন একটি ফারাক রয়েছে। হতে পারে পাঠক্রমে কিংবা ব্যবস্থাপনায়। যদি আমরা পাঠক্রমকে ধরে নিই তাহলে দেখতে পাই আমরা খুব একটা পিছিয়ে নেই। পিছিয়ে আছি কিছুটা বাস্তবায়নে। আবার যদি বলি ব্যবস্থাপনায় তাহলে স্বীকার করতেই হবে অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ।

গত ২৮ মে দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচেনে World Education Forum একটি ঘোষণা দিয়েছে। অংশগ্রহণকারী

সকল দেশকে ঐ ঘোষণার কয়েকটি বিষয় অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য Inclusive Education, Equitable Quality Education and Life-Long Learning আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্পষ্টত ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে তা প্রতিপালন করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সরকার গত এক দশক যাবৎ Inclusive Education বাস্তবায়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মূল সমস্যা হলো আমাদের সংস্কৃতি এবং মানসিক চাহিদা। আমরা সহজলভ্য এবং লাভজনক বিষয়ের প্রতি সহসাই আকৃষ্ট হই। ভবিষ্যতের কথা একেবারেই চিন্তনে রাখতে পারি না। এক্ষেত্রে বিখ্যাত গবেষক Hofstede (১৯৮০) এর Cultural Theory প্রণীধানযোগ্য। তার গবেষণায় দেখিয়েছেন জাতি হিসাবে বাঙ্গালী Short-time Oriented অর্থাৎ যা করি তা বর্তমানকে প্রাধান্য দিয়েই করি ভবিষ্যতকে বিবেচনায় না এনে। এজন্য Inclusive Education এর বিষয়টি আমাদের আরও নিবিড়ভাবে বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ করতে হবে। অন্যথায় টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আর একটি বিষয় হলো ইকুইটেবল কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করতে হলে মাধ্যমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত আমাদেরকে বড় ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এইক্ষেত্রে নগরায়ন এবং শিল্পায়ন বড় বাধা। কেননা নগরায়ন এবং শিল্পায়নকে ধরে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে পক্ষান্তরে মফস্বল শহরে কিংবা গ্রামে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে নগর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাম্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রদান এবং শিখনফলের ভিতর অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও সরকার নগর এবং গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমান্তরাল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু এটি অতিশয় সহজসাধ্য নয়। তবুও মানসম্পন্ন এবং সমসুযোগসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এর ব্যত্যয় ঘটলে অর্জিত এবং অনার্জিত উন্নয়ন আনয়ন করা রীতিমতো কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। আর একটি বিষয় হলো জীবনব্যাপী শিক্ষা (লাইফ লং লার্নিং)। এটি নতুন কোন বিষয় নয় সক্রেটিসের কাল থেকে অদ্যাবধি চলমান কিন্তু এর আবেদনটা অন্যদিকে।

বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষা অনেকটা বাণিজ্যিকিরণ করা হয়েছে বা হয়ে গেছে ফলে শিক্ষা গ্রহণ এবং পেশাগত জীবনে তার ব্যবহার দুটোই ক্ষেত্রভেদে ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যই বোধ করি বিশ্বনেতারা জীবনব্যাপী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী রয়েছে। প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। কেননা সবার জন্য শিক্ষা আমরা ইতোমধ্যেই সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছি। আর একটি বড় বিষয় হলো লাইফ লং এডুকেশন যে অর্থে ঘোষিত হয়েছে তার নিকটবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার যে প্রস্তুতি তা আমাদের রয়েছে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। তবে, বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভিন্ন মাত্রায় কোন ইনস্টিটিউট কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় করা যায় কিনা তা নিয়েও ভাবতে হবে।

একবিংশ শতাব্দির শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নতুন কিছু বিষয় যুক্ত হয়েছে যা আমাদেরকে ব্যাপকমাত্রায় অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিংশ শতকের শেষ দিকে বিশেষত দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, রাশিয়া, প্রতিবেশি দেশ শ্রীলংকা শিক্ষাক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধন করেছে তার মূল চালিকা শক্তি ছিল শিক্ষা প্রদানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার। তারা জোর দিয়েছে কোল্যাবরেশন, ইনোভেশন, কানেকটিভিটি, নেটওয়ার্কিং এবং গবেষণার ওপর। শিক্ষালয়ে ব্যবসা বা শিল্প উদ্যোক্তা তৈরী করতে হবে। নিজস্ব উদ্ভাবনী ও নেতৃত্বের গুণাবলীতে বলিয়ান হয়ে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ক্রিটিক্যাল থিংকিং এবং কমিউনিকেশন কে প্রাধান্য দিয়ে প্রশ্ন করা, উত্তর অন্বেষণ করা এবং উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানমনস্ক, সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব হওয়া কে অগ্রগণ্য করে ঢেলে সাজাতে হবে। এগুলোর সংমিশ্রণের ফলে উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে উপরে অবস্থান করবে।

আশাব্যঞ্জক এই যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনেকাংশে অর্জন করে আমরা নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বাংলাদেশ স্বল্প মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া, জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এবং তা অর্জনের জন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৯ সালে রূপকল্প-২০২১ অর্থাৎ মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হওয়ার যে কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল তার ফল ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী প্রথম ধাপ অর্জন করেছে। এছাড়াও সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রে উপনীত হতে হলে টেকসই উন্নয়নকে আরো বেগবান করতে হবে এবং সেটি করতে হলে

গুণগত শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। গুণগত শিক্ষা বিস্তার এবং মূল্যায়ন করতে হলে জাতীয় অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে মর্মে জানা যায়। আর একটি বিষয় না বললেই নয় যে, পপুলেশন ডিভিডেন্ট আমাদের জন্য সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ দুটিই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ১০-২৪ বৎসরের কর্মক্ষম জনসংখ্যা হবে ৪৯,৪১৫,৫৬২ জন অর্থাৎ ৩০.৮%, ২০২১ সালে হবে ৫১,৪৭০,৫৫৪ জন অর্থাৎ ৩০.২০% এবং ২০৪১ সালে হবে ৪৩,৪০৮,৪৯৪ জন অর্থাৎ ২১%। এই জনসংখ্যা ডিভিডেন্ট কে কাজে লাগাতে হলে তাদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগ। জাতীয় বাজেটের ১১ শতাংশ বিনিয়োগ এর জন্য যথেষ্ট নয়। বিশ্বের যারাই উন্নত রাষ্ট্রের ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছে শিক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমেই হয়েছে। উন্নত রাষ্ট্রের ক্যাটাগরিতে যেতে হলে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর সর্বনিম্ন ৫০% শিক্ষার্থী অধ্যয়নের প্রয়োজন। যা বাংলাদেশে ১৬-২০ ভাগের বেশী নয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উন্নত রাষ্ট্রের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো ৬০% এর উপরে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। জাপানে ১২ কোটি জনগোষ্ঠীর জন্য ১২০০ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে বর্তমানে ১৬ কোটি জনগণের জন্য মাত্র ১১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

সুতরাং উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার যাচাই করে নতুন নতুন বিষয় চালু করে জনসম্পদ (হিম্যান রিসোর্স) তৈরী করতে হবে)। শুধু ডিগ্রি সর্বস্ব শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। নতুন নতুন প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সময়োপযোগী দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নৈতিক মানদন্ডে নিরূপিত শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থাপনা। আলোকিত মানুষ এবং নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনসমাজ গড়তে হলে টেকসই উন্নয়ন অপরিহার্য। কেননা আর্থিক ভিত্তি নৈতিক মনোবলকে সুদৃঢ় করে। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দারিদ্রের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তার শক্ত হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। সে শিক্ষা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিস্তরণের মাধ্যমে সুসংহত করা সম্ভব। পরিশেষে বলা প্রয়োজন শিক্ষা জিডিপি'র কমপক্ষে ৪% বিনিয়োগ করে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। অন্যথায় টেকসই উন্নয়ন কখনো সম্ভব হবে না। তাই দ্রুত শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর মধ্য দিয়ে আমাদের টেকইস উন্নয়ন সুসংহত করতে হবে।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

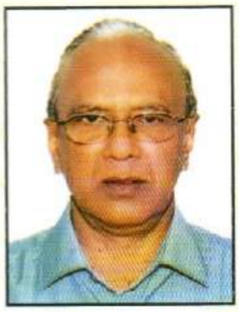

শ্রমিকদের দাবী আদায়ের মাধ্যমেই শিল্প ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব

ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

মহান মে দিবস। শ্রমিক শ্রেণীর শোষণমুক্তির সুদীর্ঘ যাত্রাপথে প্রথম পদক্ষেপের দিন। ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শ্রমিকরা সে যুগের বৃহত্তম শ্রমিক ধর্মঘটের আয়োজন করেছিল মূলত '৮ ঘণ্টা শ্রম, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম এবং ৮ ঘণ্টা বিনোদন'– এই দাবিতে। তৎকালীন মার্কিন সরকার এবং মালিক পক্ষ স্বভাবতই শ্রমিকদের এই আন্দোলনকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। পুলিশ এবং মালিকদের পেটোয়া বাহিনী নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছিল, রক্ত ঝরিয়েছিল। হে মার্কেটের শ্রমিকদের রক্তরাঙা পতাকা হাতে নিয়ে ১৩০ বছর ধরে দুনিয়াব্যাপী শ্রমিকরা শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-সংগ্রামের নতুন নতুন অধ্যায় রচনা করে চলেছে।

নানা উত্থান-পতন ও জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন আজ এক বিশেষ সন্ধিণে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকরা তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের শ্রমশোষণ করে মালিকরা একতরফাভাবে মুনাফা ভোগ করে কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্যে জোটে শুধু অসীম দুঃখকষ্ট। তবে তারা কোনো কিছুতেই হার মানে না, বরং ন্যায্য মজুরি পাওয়া তথা একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামের পথ ছাড়া তাদের সামনে বিকল্প কিছু থাকে না। তারা ধুঁকে ধুঁকে মরে কিন্তু মৃত্যুভয়ে লড়াই-সংগ্রামের কাফেলা থেকে দূরে সরে যায় না। এটাই শ্রমিক শ্রেণীর বড় বৈশিষ্ট্য। শ্রমিক শ্রেণীর এই অভ্যন্তরীণ শক্তির দিকটাই মে দিবসে প্রবলভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

শ্রমিক শ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষের দুরবস্থার কথা, তাদের শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-নির্যাতনের কথা কারো অজানা নয়। শ্রমিকরা বাঁচার মত মজুরি এবং আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ নানাবিধ সামাজিক মর্যাদা ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। মুক্তবাজার অর্থনীতি আর নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যমূল্যের কারণে স্বল্প ও সীমিত আয়ের মানুষদের পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পাশাপাশি প্রকৃত মজুরী নিম্নমুখী হচেছ। ভাত-কাপড়-মাথা গোজার ঠাঁই, শিক্ষা চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও আমাদের দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের বিশাল অংশ এখনো এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রয়োজনীয় ক্যালরী ও পুষ্টির অভাবে ন্যূনতম মানসম্মত খাবার খেতে না পারায় শ্রমিক কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। তারা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখে কিন্তু স্বপ্ন পুরণের কোন পথ খুঁজে পায়না। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত। শ্রমিকরা বিশেষভাবে মহিলা শ্রমিকরা কাজ করতে গিয়ে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসতে পারবেন কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। এখানে অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবেশে মৃত্যুকে আলিংগন করে কাজ করতে হয়।

আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণী শোষণ-বঞ্চনার যাতাকলে পিষ্ট হলেও দেশে সেভাবে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছেনা। যদিও আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য রয়েছে, আমাদের দেশের শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব দাবী দাওয়ার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও বিরাট ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৯৬৬ সালে স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মনুমিয়ার আত্মাহুতি স্বাধীনতার আন্দোলনের সুচনায় একটি মাইলফলক। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে শহরে যেমন মানুষের ঢল নেমেছিল ঠিক তেমনি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরাও ঘেরাও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের দাবী আদায়ে বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। এই

ঘেরাও আন্দোলন তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। এটাও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা ধারা হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে।

শ্রমিক বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও দেশ বাঁচাও এই শ্লোগান নিয়ে শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সুস্থ ধারার শ্রমিক আন্দোলনে যারা বিশ্বাসী তারা সবসময় সচেতন। বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের একটি ঐতিহ্য আছে। তারা শ্রমিকদের দেনন্দিন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি একটি উন্নয়ন এবং প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে আসছে। গত ৮০'র দশকে বামধারায় বিশ্বাসী প্রথমে ৬টি পরে শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্রোতধারার ১১টি জাতীয় ভিত্তিক শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা হিসাবে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ (স্কপ) গঠিত হয়েছিল। ক্ষমতা জবরদখলকারী সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলে স্বপের নেতৃত্বে একাধিক ঐতিহাসিক ও সফল শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণী শোষণ বঞ্চনার যাতাকলে পিষ্ট হলেও বর্তমানে সেভাবে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছেনা।

সুস্থ্যধারার শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আইএলও কনভেনশন '৮৭-তে পরিস্কারভাবে বলা আছে, শ্রমিকরা সংগঠন করার অধিকার পাবে। শ্রমিকরা যাকে পছন্দ করবে তাকে ইউনিয়নের নেতা নির্বাচন করতে পারবে। এটা আইএলও কনভেনশন '৮৭-এর মূল চেতনা। কনভেনশন '৯৮ অনুযায়ী একাধিক ইউনিয়ন যেখানে থাকে, সেখানে সিবিএ নির্দ্ধারনের জন্য সব ইউনিয়নের মধ্যে নির্বাচন হবে। যে ইউনিয়ন নির্বাচিত হবে, সে ইউনিয়নটি সকল শ্রমিকদের পক্ষে দরকষাকষি করবে। ইউনিয়ন করার অধিকার, নেতা নির্বাচন, সংগঠন করা, নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ধারার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অপরাপর ইউনিয়নগুলো তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বার্থে ওই সিবিএ-কে সহযোগিতা করবে। আর যে প্রতিষ্ঠানে একাধিক ইউনিয়ন নেই, সে প্রতিষ্ঠানের একমাত্র ইউনিয়নটিই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে দরকষাকষি করার একমাত্র বৈধ মাধ্যম। এটা আইএলও কনভেনশনে '৮৭ ও ৯৮ কর্তৃক স্বীকৃত, যা শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই মানতে বাধ্য। উভয়ক্ষেত্রে বৈধ প্রতিনিধিই শ্রমিকদের দাবিনামা তৈরি করে তা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে। কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই দাবিনামা নিয়ে শ্রমিকদের বৈধ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবে। আলোচনা যদি ফলপ্রসু না হয় অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ যদি শ্রমিকদের দাবি মেনে না নেয়, তখন উভয় পক্ষ থেকে সরকারের কাছে সমাধানের জন্য উক্ত দাবিনামা পাঠানো হয়। সরকারের পক্ষ থেকে শ্রম পরিচালক মধ্যস্তার ভূমিকা নিয়ে মালিক, শ্রমিক ও সরকার-এই ত্রিপীয় বৈঠকের আয়োজন করেন। ওই বৈঠকেও যদি শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মেনে নেয়া না হয়, তাহলে শ্রমিকদের ভোটাভুটিতে ৮০ শতাংশ শ্রমিকদের সমর্থনে আইনগতভাবে শ্রমিকরা ধর্মঘট আহ্বান ও পালন করতে পারে। অন্যদিকে দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকরা আদালতেও যেতে পারে।

উভয় পদ্ধতিই বাংলাদেশের শ্রম আইনে সিদ্ধ। এরপরও শ্রমিকদের দাবি মানা না হলে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরা স্বত:স্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে আন্দোলনে ইউনিয়ন নেতৃত্ব থাকলে আন্দোলনের সুফল বা সমাধানের পথ খুজে পাওয়া যায়, আর তা না হলে নেতৃত্বহীন আন্দোলন নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এটা শিল্প শ্রমিক সম্পর্ককে অবনতি করে। শ্রমিকদের নেতা নির্বাচন, দাবিনামা পেশ এবং যৌক্তিক দাবিগুলো আদায়ের জন্য উল্লিখিত পন্থায় আন্দোলন পরিচালনা করার প্লাটফর্ম। এটাকেই বলা হয় সুস্থধারার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন।

আমি মনে করি, শ্রমিকদের অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে। আদর্শিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছাড়া শ্রমিক আন্দোলনকে সঠিক সুস্থ ধারায় পরিচালিত করা যেমন সম্ভব নয়। পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হলে শ্রমিকরা তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। তবে রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে নয় অর্থাৎ নিরঙ্কুশ দলীয় প্রভাব মুক্ত থাকা বাঞ্চনীয় । মননে আদর্শিক রাজনৈতিক চিন্তা কিন্তু কর্মে দলীয় প্রভাবমুক্ত শ্রমিক আন্দোলন, এটাই হওয়া উচিত বিপ্লবী ধারার শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট।

একথা ঠিক যে, স্বাধীনতার আগে ১৯৬৬-৬৯ সালে এবং স্বাধীনতার পরে ১৯৮৪-৮৫ সালে এমনকি ১৯৯৪ সালে যেভাবে শ্রমিক আন্দোলন চলছিলো, এখন তা নেই। অনেকে মনে করেন, এটা বর্তমান শ্রমিক নেতৃত্বের দুর্বলতা। আমি মনে করি, এটা ঠিক নয়। শ্রমিক আন্দোলনে সবসময় সুবিধাবাদী ধারার কিছু নেতা থাকেন। এদের কারণে শ্রমিক আন্দোলনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সত্য কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে উক্ত সুবিধাবাদী ধারার শ্রমিক নেতারা আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয় না যা ১৯৮৪-৮৫ সালে ও বাংলাদেশে উত্তাল শ্রমিক আন্দোলনের ফলে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে তদানিন্তন স্বৈরশাসক শ্রমিকদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয় যার ধারাবাহিকতা চলে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত।

তখন বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চলগুলো ছিল মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত খাত নির্ভর। কিন্তু পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশনে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত হ্রাস পেতে থাকায় সংগঠিত সেক্টরের শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি অসংগঠিত সেক্টর গড়ে উঠার কারণে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের উপর শোষন নির্যাতনও বাড়ছে। এইসব শ্রমিকদের সংগঠিত হতে দিচ্ছেনা মালিকেরা। অথচ কর্মক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন করা শ্রমিক-কর্মচারীদের একটি মৌলিক দায়িত্ব।

তাই শ্রমিক আন্দোলনের গতি সঞ্চারের জন্য প্রয়োজন অধিকার সম্পর্কে ধারণা ও সচেতন করে তোলা। এজন্য সংগঠন করতে হবে। আইএলও-র '৮৭ ও ৯৮ সনদ মোতাবেক দাবি আদায়ে শ্রমিকদের সচেতন করতে হবে। শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ইউনিয়ন হলো শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণ বা পূর্বশর্ত। একইভাবে ইউনিয়ন শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইউনিয়ন কোন সময়ই শিল্প উন্নয়নের অন্তরায় নয়। আমরা যদি একটি সুষ্ঠ এবং দায়িত্বশীল ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারি, তাহলে নিয়মতান্ত্রিক পথে শ্রমিকদের দাবী আদায়ের পথও সুগম হবে। ইউনিয়ন গড়ার ক্ষেত্রে যে বড় বাধা, তাহলো মালিকরা। সেক্ষেত্রে মালিক ও সরকারের কাছে আমাদের দাবী থাকবে শিল্পের স্বার্থেই ইউনিয়ন গড়ার সুযোগ দিন। এক্ষেত্রে শিল্পকে ইতিবাচক পথে পরিচালনা এবং শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবির বিষয়ে একটা ফয়সালা খুঁজে পাওয়ার জন্য মালিক বা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের একটি বৈধ যোগ্য প্রতিনিধি পাবে, যারা শিল্প ও শ্রমিক স্বার্থ উভয়ই দেখবে।

শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে শাসক-শোষক ও মালিক পক্ষ পরাজয় মানতে বাধ্য। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হাতের চেয়ে শক্তিধর আর কিছুই নেই। শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমেই আন্দোলনকে বেগবান এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্ভব।

শ্রমিক না বাঁচলে যেমন শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে তেমনি শিল্প ধ্বংস হলে শ্রমিক বাঁচবে না, কাজেই একদিকে যেমন শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন করার জন্য মজুরির সংগ্রাম থাকতে হবে তেমনি শিল্প বিকাশের দিকটিও শ্রমিক সংগঠনকে দেখতে হবে। বর্তমানে এই ধারার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা খুব প্রয়োজন। অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শিল্প রক্ষা করা, শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ, বঞ্চনা এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে লড়াই-সংগ্রাম করে দাবি আদায় করার বিকল্প নাই।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

১৬

ভিয়েতনাম ঃ উন্নয়নের এক রোল মডেল

মোঃ মোশাররফ হোসেন
উপসচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
mosharraf196421@yahoo.com

১০২তম এসিএডি কোর্সের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে ২৩ শে ডিসেম্বর'১৫ থেকে ২রা জনুয়ারী'১৬ সময়ে ১০দিনের জন্য ভিয়েতনাম সফরে যাই। এ সফরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৩২জন উপসচিব ছিলেন। সুন্দর দেশ ভিয়েতনাম। প্রধানত হ্যানয়, নামদিনহ এবং হাইফং সিটিতে আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছিল। NATIONAL ACADEMY FOR PUBLIC ADMINISTRATION (NAPA) পুরা কর্মসূচিটা নিয়ন্ত্রণ করে। ভিয়েতনামের আবহাওয়া একবারেই বাংলাদেশের মতো।

চিত্র- রাজধানী হ্যানয়ের লেকের একাংশ

জনসংখ্যা আমাদের অর্ধেক মানে ৯ কোটির কাছাকাছি। আয়তন আমাদের দ্বিগুণ মানে ৩,৩২,৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার। আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি ২ বার, প্রথম তাড়ালাম ইংরেজদের তারপর পাকিস্তানীদের। ভিয়েতনামের বেলায় তাই। তারা তাড়াল ফ্রান্স এবং আমেরিকানদের। আমাদের স্বপ্ন দ্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমান আর ভিয়েতনামের হো চি মিন। দু'জনই জাতির অবিসংবিদিত নেতা।

স্বাধীনতা অর্জনে আমরা ৪০ বছর পার করেছি। ভিয়েতনাম করেছে ৩০ বছর। স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের লেগেছে ৯ মাস তাদের লেগেছে অনেক বছর। তারা যুদ্ধ করে নিঃস্ব হয়েছে।

ভিয়েতনামে হো চি মিন মানে দেবতুল্য। প্রতিটি সরকারী অফিসে হো চি মিনের প্রতিচ্ছবি ও তার মর্মকথা বাধাই করে সযতনে দপ্তরের সুনির্দিষ্ট এক জায়গায় বসানো আছে ' তোমরা জাতির জন্য কাজ করো, দেশের জন্য কাজ করো। ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দাও, তাহলে দেশের উন্নতি হবে'।

নিঃস্ব হয়ে আবার ঘুরে দাড়িয়েছে। আমাদের পরে স্বাধীন হয়েও ভিয়েতনাম অনেক বেশি উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। তা সম্ভব হয়েছে কেবল হো চি মিনের উক্ত নির্দেশ মানায়। উন্নয়নের ছোয়া লেগেছে প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, প্রতিটি জনমনে এবং সমগ্র ভিয়েতনামের অলি গলিতে। আন্তঃপ্রদেশ কিংবা আন্তঃজেলা সড়ক যোগাযোগ কত সহজ করেছে। প্রতিটি জেলায় এবং সিটি সদরে এক্সপ্রেস ওয়ের ছড়াছড়ি। হ্যানয় সিটিতে ট্রাফিক জ্যাম আছে তবে ঢাকার মত এত ভয়াবহ নয়। সকলেই ট্রাফিক আইন মেনে চলে। আইন মেনে চলা জাতির উন্নয়নের একটি মাপকাঠি।

ভিয়েতনাম এখন চাল রফতানীতে শীর্ষে। শুধু চালে নয়, কফি, রাবার, আরএমজি, মরিচ, চিংড়ি এবং সেমি কনডাক্টর সার্ভিসেস ইত্যাদিতেও। তাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম ২০২৫ মার্কিন ডলার, আমাদের ১৩১৬ ডলার ।

তাদের জিডিপি ৬.৬% আর আমাদের ৬% মাত্র। প্রায় সব দেশের সাথে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি চোখে পড়ার মত কিন্তু ভিয়েতনাম বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত। বছরে তারা রফতানী করে ১২৮.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানী করে ১২১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বেইজ ইয়ার ২০১০)। তারা ১৯টি দেশের সাথে শিক্ষা, জনশক্তি রফতানী, ব্যবসা বাণিজ্যের চুক্তি করেছে। আমরা পারিনি।

৬৩টি প্রভিন্স ও ৭০০ টি ডিষ্ট্রিককে তারা পর্যটন নগরীতে পরিনত করেছে। হালং বে বিশ্বের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ পর্যটক এখানে ভ্রমনে আসেন। কত রকমের সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে হালংবে তে। বিচিত্র খাবার, আরামদায়ক ও বিলাসবহুল ট্রান্সপোর্ট, নিরাপদ হোটেল এবং সহজলভ্য বিনোদনের সুবিধা ভিয়েতনামকে করে তুলেছে পর্যটকদের অতুলনীয় স্থান সবই হয়েছে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ ব্যবস্থাপনায়।

চিত্র- প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য হালংবে'র একাংশ

রাজধানী হ্যানয় সিটিতে কোন ভিক্ষুক নাই। ভিক্ষার থালা নাই। নগরের প্রতিটি অলিগলি অত্যন্ত পরিষ্কার। টয়লেট গুলি পরিচ্ছন্ন। টয়লেট থেকে কোন দুর্গন্ধ বের হয় না । হোক তা পাবলিক বা সরকারী বা বেসরকারী বা করপোরেট।

স্থানীয় সরকার অত্যন্ত শক্তিশালী। এক দলীয় কমিউনিষ্ট শাসনের যাতাকলে দেশ পিষ্ট নয় বরং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অর্থনীতির চাকা ঘুরছে। শীর্ষ পর্যায় থেকে ১৯টি উন্নয়ন ধাপ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে প্রভিন্স, জেলা এবং কমিউন পর্যায়ে। ৬৩টি প্রভিন্স , ৭০০ টি ডিষ্ট্রিক এবং ১১০০০ কমিউন মিলে সেই ১৯টি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করছে।

কমুনিষ্ট দেশে বিদেশী বিনিয়োগ অনেকটা আশ্চর্যজনক। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ভিয়েতনাম তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। নিজ এলাকায় বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রভিন্স ও জেলা পর্যায়ের নির্বাহীকে অগাধ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। তৈরী পোষাক ও সেমি কন্ডাক্টর সার্ভিস রফতানীতে বিশ্ব বাজারে ভিয়েতনাম একটি ব্রান্ড।

আম, জাম, কাঠাল, কলা, লিচু, ড্রাগন ফলের সমারোহে পর্যটক কি আর ভিয়েতনাম ছাড়ে! আবহাওয়া কি চমৎকার! খুব শীত, না, তা নয়। আবার খুব গরম , না তাও নয়। ধূলা বালিও খুব একটা নাই। সত্যিই আরামের এক দেশ ভিয়েতনাম। ইতিহাস খুজলে সহজেই দেখতে পাব আশির দশকে ভিয়েতনাম ছিল এক বাঙালের দেশ। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান আর মেধা অর্জনে ভিয়েতনাম এখন এক মহাকাব্য যা বর্ননা করে শেষ করা যাবে না।

ভিয়েতনামের মানুষ বিনয়ী, পরিশ্রমী, বিশ্বস্ত এবং সরল। প্যাসিফিক সাগরের পাশ ঘেরে সর্পিল চেহারার দেশটায় প্রকৃতি দুহাত দিয়ে তাকে সমস্ত সম্ভার দান করেছে।

মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ

ফজলুল হক মন্টু (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
কার্যকরী সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

১ মে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীকী দিবস। শাসক আর শোষক এর বিরুদ্ধে অধিকার বঞ্চিত মানুষের লড়াইয়ে মে দিবস এক অনন্য প্রেরণা। আধুনিক শিল্প সভ্যতা বিকাশের সূচনা পর্বে শ্রমিকদের অধিকার বলতে তেমন কিছু ছিল না। তাদের ন্যায় সঙ্গত বেতনের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তারা দিনে কত ঘন্টা কাজ করবে তাও নির্ধারন ছিল না। একে তো নিম্ন মজুরি তদুপরী শ্রমিকদের খাটানো হতো মানবেতর জীবের মত। কোনো কোনো শ্রমক্ষেত্রে ২০ ঘন্টা পর্যন্ত- কাজ করানো হতো। প্রাচীন মিশরের শ্রমদাসদের চেয়ে তাদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার নির্যাতন যখন অসহনীয় পর্যায় চলে যায় তখন শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত শ্রমিক সমাজ রুখে দাড়াতে বাধ্য হয়। ১৮৭৭ সাল থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি, ৮ ঘন্টা কর্ম দিবস এবং উন্নত কর্মপরিবেশের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ মালিকদের পক্ষ নিয়ে এসব সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নিষ্ঠুর দমন-নীতি চালিয়ে যেতে থাকে।

১৮৮৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ শ্রমিক দাবি আদায়ের সংগ্রামে প্রাণ দেয়। অতঃপর ১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবর আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার তাদের জাতীয় সম্মেলনে গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘোষণা দেয় দাবি না মানা হলে ১৮৮৬ সালের ১ লা মে সারা দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ ধর্মঘট পালন করা হবে। এই প্রেক্ষাপটে মালিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমিক আন্দোলন নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আন্দোলনকে ভেঙে দেয়ার জন্য তারা স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যে শিল্প কারখানায় ভয়াবহ নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের ব্যাপারে তারা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে এবং প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের গ্রেফতারসহ বিভিন্ন নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা কতিপয় পুলিশ কর্মচারিকে ঘুষ প্রদান করে তাদের পক্ষে কাজ করাতে সক্ষম হয়। একদিকে শ্রমিকরা তাদের মে দিবসের ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশকে সফল করার জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে থাকে। অন্যদিকে তাদের এই কর্মসূচিকে ভন্ডুল করার জন্য মালিক পক্ষ সরকারের আনুকূল্যে পুলিশ বাহিনীকে কব্জা করে ফেলে। তাদের এই ষড়যন্ত্র মানব ইতিহাসে নারকীয় ঘটনার জন্ম দেয়। ১৮৮৬ সালের পহেলা মে কর্মঘন্টা আট ঘন্টার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাড়ে ১১ হাজারেরও বেশি শিল্পকারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশ নেয়। ৩ মে রিপার কারখানার ধর্মঘটি শ্রমিকদের ওপরে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে ছয়জন শ্রমিক নিহত ও অনেকে আহত হয়। এর প্রতিবাদে ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারে আহ্বান করা হয় এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশ। এ সমাবেশেও পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে শ্রমিকরা রুখে দাঁড়ায়। শ্রমিক পুলিশের সংঘর্ষে ৪ জন শ্রমিক ও ৭ জন পুলিশ নিহত হয়। আহত ও গ্রেফতার হয় অনেকে। আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অপরাধে গ্রেফতার হন আগস্ট স্পাইজ, স্যামুয়েল ফিলডেন, মাইকেল স্কোয়াব, জর্জ এঙ্গেল, অ্যাডলফ ফিশার, লুই লীংগ, অস্কার নীবে ও অ্যালবার্ট পার্সন। বিচারের নামে শুরু হয় প্রহসন। স্পাইজ, ফিশার, এঙ্গেল ও পার্সনের ফাঁসি হয়। ফিলডেন ও স্কোয়াবের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। অন্যদের ১৫ বছরের কারাবাস হয়। লীংগ করাগারেই নিহত হন।

ফাঁসির দিন ঘোষিত হয় ১৮৮৭-র ১১ নভেম্বর। স্পাইজ, ফিশার, এঙ্গেল ও পার্সন ফাঁসির মঞ্চে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিলেন। শ্রমিক আন্দোলনে তারা হয়ে গেলেন অমর শহীদ। প্রকৃত পক্ষে হে মার্কেটের ঘটনাবলির পরই

শ্রমিক আন্দোলনে নতুন দিগন্ত শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া না মেনে পারা যায়নি। মেনে নিতে হয়েছিল শ্রমিকদের মূল দাবি ৮ ঘন্টা কাজের দাবিও। ফরাসি বিপ্লবের শত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফেডারিক এনগেঞ্জেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় কমিনিস্ট আন্দোলনে ১৮৯০ সাল হতে প্রতিবছর মে এর প্রথম দিনকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

সেই থেকে সারা পৃথিবীর শ্রমিকরা পহেলা মে পালন করে আসছে। তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে প্রতীকী দিবস হিসাবে। সে নিরিখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মে দিবস পালিত হয়ে আসছে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে স্মারক দিবস হিসেবে। জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসন শোষনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরর রহমান রাষ্ট্রীয়ভাবে মে দিবস পালন ও এই দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। তিনি শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ILO এর মৌলিক ৭টি কনভেনশনসহ মোট ৩৩টি কনভেনশনে অনুসমর্থন করেন। ১৯৭৩ সালে ২৫শে জুন ILO এর ঢাকা অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ILO এর ৩৫টি কনভেনশনে অনুস্বক্ষার করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মজুরী ও বেতন কমিশন গঠন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতি অনুস্মরণ করে তারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান শ্রমবান্ধব সরকার বিএনপি-জামাত জোট আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানা পর্যায়ক্রমে চালু করে লক্ষ লক্ষ বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। জাতীয় মজুরী কমিশন গঠন করে তার সুপারিশের আলোকে শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী আরএমজি সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ৫৩০০ টাকা পুনঃনির্ধারণ করেছেন। জাতীয় শিশু শ্রমনীতি ২০১০ এবং জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করেছেন। কর্মজীবী নারীদের মাতৃত্বকালিন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত এবং মাতৃত্ব কল্যাণ ভাতা চালু করেছেন। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, প্রকল্প গ্রহণ ও ৮১ ধরণের কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খেটে খাওয়া দুঃখী মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে বহিঃবিশ্বের কর্মসংস্থানের পথ সহজীকরণ করে বর্হিগমন পদ্ধতি আধুনিকায়ন, ব্যয় সংকোচন ও ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। তিনি শ্রমিকদের চাকুরীর বয়স ৬০ বছর এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের চাকুরীর বয়স ৫৯ বছরের উন্নীত করেছেন। একই সাথে মুক্তিযোদ্ধা চাকুরিজীবীদের চাকুরীর বয়স ৬০ বছর করে তাদের ভাতা বৃদ্ধি করেছেন। সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য পে-কমিশন ও সার্ভিস কমিশন গঠন করে তাদের বেতন প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি করেছেন। নতুন পে-স্কেলে নববর্ষ ভাতা ও পেনশন সুবিধা বৃদ্ধি করেছেন। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সরকারের এতসব অর্জনকে নসাৎ করার জন্য বিএনপি-জামাত মরিয়া হয়ে উঠেছে। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে ও ২০১৫ সালে আন্দোলনের নামে পাকিস্তানি কায়দায় জ্বালাও পোড়াও ও মানুষ হত্যা করে যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল, এদেশের শ্রমজীবী মানুষ তা প্রতিরোধ করেছে।

মে দিবসের চেতনা ধারণ করে মালিক-শ্রমিক পরস্পর সু-সম্পর্ক বজায় রেখে কল-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সুনিশ্চত করতে হবে। এটাই এ দিবসে আমাদের প্রত্যাশা।

১৬

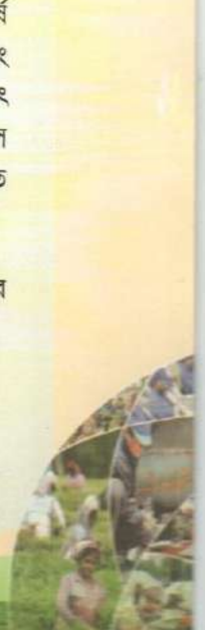

"শ্রমিকের আত্মমর্যাদা"

রওশন জাহান সাথী
সাবেক সংসদ সদস্য
সভাপতি, মহিলা শ্রমিকলীগ

১ লা মে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। সারাবিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ দিনটি পালন করে থাকে। মেরুদন্ড সোজা করে চলতে শেখায় দিনটি। শুধু তাই নয় মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ এক দূর্লভ মাইল ফলক। শ্রমিকের শ্রম শোষণের ভয়ঙ্কর পদ্ধতি ও কলাকৌশলের বিরুদ্ধে এমন মারমুখী, জোটবদ্ধ, বিক্ষুব্ধ লড়াই তাঁরাই করতে পেরেছিল। যারা কোন চাবুক এবং রক্তচক্ষুকে গ্রাহ্য করেনি, আপোষ করেনি কোন প্রলোভনের সাথে, বিক্রি হতে জানতো না কোন অন্যায়ের কাছে, উঁচু মাথা সমুন্নত রাখার সাধনা ছিল মনে প্রাণে। আমাদের দেশসহ পৃথিবীর সকল দেশের যাবতীয় কাজ, কায়িক পরিশ্রম শ্রমিকরাই করে থাকে। অথচ শ্রেণী বিভক্ত সমাজে তাদের শ্রম শোষণ করা হয়েছে। শ্রমের মূল্য দেওয়া হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে শ্রমিক নির্যাতন প্রচন্ডভাবে বাড়তে থাকে। পুরনো পৃথিবীর ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি শ্রম ঘন্টার কোন বিধি ব্যবস্থা তো ছিলই না, উল্টো ছিল অত্যাচার নির্যাতনের মহা-উৎসব। মানুষ সংগঠিত হতে থাকে, চোখে চোখে মনের ভাষা বিনিময় হয়। ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তোলে, বাচাঁর মন্ত্র খুঁজে পায়, লড়াই করতে থাকে, প্রতিবাদ করতে থাকে, চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, এসবের ধারাবাহিকতায় ১৮৮৪ সালে নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা, ন্যায্য মজুরী, ভাল কর্মপরিবেশ ও অন্যান্য দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন এগিয়ে চলে।

কিন্তু সংগঠন ছাড়া তো আন্দোলন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না, এ বোধ থেকে শ্রমিকরা একটি সংগঠন গড়ে তোলে, "আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার" নামের এই সংগঠনের মাধ্যমে তারা দূরন্ত গতিতে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যায়, তারা মালিক পক্ষের কাছে সময় বেঁধে দিয়েছিল, ১৮৮৬ সালের ১লা মে পর্যন্ত। মালিক পক্ষ ছিল অনড়, অটল, শ্রমিকদের দাবী দাওয়াকে তারা গ্রাহ্যই করেনি। প্রচন্ড বিপরীতমূখী এই অন্যায় আচরণ আন্দোলনকে বেগবান করে। আন্দোলনকারীদের উপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার। এ কাহিনী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর আমেরিকার শিকাগো শহর বারুদ্ধে পরিণত হয়।

শ্রমিকদের নির্ধারিত সময়সীমা যত কাছে আসছিল ততই সংঘর্ষ অবধারিত হয়ে উঠছিল। কারণ মালিকরা তাদের দাবী মানবে না, সেদিনের মালিকরা মানতে পারে না। ব্যবসায়ী, মালিকরা আন্দোলন'কে দমন করার জন্য অনেক অস্ত্র কিনে পুলিশদেরকে দিয়েছিল। বরাবরের মত অত্যাচার চালাতে লাগলো, গুলি করে তাদেরকে হত্যা করতে লাগলো, ১লা মে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিন থেকে চার লাখ শ্রমিক কাজ ফেলে নেমে আসে রাস্তায়, শিকাগোর হে মার্কেটে পুলিশের সাথে শ্রমিকদের সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়, এ ঘটনায় ১১ জন শ্রমিক মারা যায় বলে উল্লেখ আছে, আহত হয়েছিল অনেকে, গ্রেফতার করে অনেককে অকথ্য নির্যাতন করেছিল। আন্দোলনরত শ্রমিকরা একেবারেই দমে যায়নি বরং তারা মরণপণ লড়াই করেছিল। ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের এই রক্তঝরা দিনটি সারা বিশ্বের শ্রমিকদের কাছে দাবী আদায়ের দিকনির্দেশনা হয়ে রয়েছে। মালিকরা তাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাই শ্রমিকদের এই মহান আত্মত্যাগ সংগ্রামী মানুষ কোনদিন ভুলতে পারবে না।

যেমন করে আমরা ভূলতে পারবো না আদমজীর মনুমিয়াকে। আমাদের দেশের শ্রমিকরা এ দেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাঁথা সৃষ্টি করেছে।

আমাদের দেশের গর্বের অহঙ্কারের স্থাপনাগুলো কত মমতায় মূর্ত প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছে, আমাদের শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, জাতীয় সংসদ তারই স্বাক্ষ্য বহন করে। প্রত্যেক বিভাগে, জেলায় জেলায় আরও কতশত সংগ্রামের চিহ্ন গড়ে তুলছে প্রতিনিয়ত।

আমাদের শ্রমিকরা দেশপ্রেমিক বলেই বিভিন্ন শিল্পে, কল-কারখানায় দায়বদ্ধতার পরিচয় দিচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পে নারী পুরুষ সমান তালে কাজ করে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। আজ নারী শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। একই কারখানায় একসাথে কাজ করার মধ্য দিয়ে সবাই নিজের নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। বদ্ধ পরিবেশ আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। সরকার-মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক এবং বৈঠক অর্থাৎ দরকষাকষি সচল রাখতে হবে এবং চর্চা করতে হবে। মালিকের যেমন কল কারখানা গড়ে তুলতে হবে, শ্রমিকের তেমন কাজ করে জীবন চালাতে হবে। দুই পক্ষের কাছে দুই পক্ষই জরুরী, গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কোন অংশে কম নয়। কালের পরিক্রমায় চিন্তার বদল হয়। সংগ্রামে সংগ্রামে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। এখন বিশ্বাস করতে হবে মানুষ আছে বলেই মাটির দাম আছে। মানুষ ছাড়া মাটি মূল্যহীন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশকে ভালোবাসেন মানুষকে ভালোবাসেন। এ সবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিক-ছাত্ররাই প্রথম যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছে। পল্টন ময়দানে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সেদিন তারাই গার্ড অব অনার দিয়েছিল।

শ্রম আইন ও নীতিমালা প্রনয়ন ও সংশোধন সম্পর্কে কিছু কথা নিম্নে উল্লেখ করতে চাই

১। শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন, কমপ্লায়েন্স ও পারস্পারিক সম্পর্কের আইনগত ভিত্তি সুদৃঢ় করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগি করা। ২০১৩ সালে জুলাই মাসে মহান জাতীয় সংসদে এ আইন সংশোধনের মাধ্যেম শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আশা করছি সংশোধিত এ শ্রম আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

২। শ্রমিকদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি- রাষ্টায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সের সাথে বেসরকারি সেক্টরের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সের সামঞ্জস্য বিধান ও তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য শ্রমজীবী মানুষের দাবীর প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বেসরকারী সেক্টরের শ্রমিকদের অবসর গ্রহনের সময়সীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও কার্যকর করা হয়েছে।

৩। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন- দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ণ করা হলেও আইনের বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় এ আইনের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছিল না। এর প্রেক্ষিতে সরকার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং এ আইনের বিধান স্পষ্টীকরণ ও বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে এবং ১৭/০২/২০১৩ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

৪। শিশুশ্রম নিরসন নীতির উপর জোর দিয়ে পরিকল্পনা প্রনয়ন হয়েছে। ১৪ বছর বয়স পূর্ণ হয়নি এমন শিশুকে শ্রমে নিয়োগ এবং অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের কিশুরকে ঝুঁকিপুর্ন কাজে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৫। গৃহকর্মী- গৃহকর্মীদের সুরক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আমরা কাজ করছি। এ ব্যাপারে শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে

সম্প্রতি নীতিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে। তাদের উপর কেউ কোনভাবে যেন নির্যাতন করতে না পারে, তাদের কাজের যেন যথাযথ মূল্যায়ন হয়। তবে গৃহকর্মীকে ভাবতে হবে এটা তার চাকুরি।

৬। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সেক্টরের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণে মহাজোট সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে যে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, যে আইনের হাত ধরে আমরা সামনের দিকে যেতে পারবো, শ্রমিকরা এখন ৫,৬০০/- (পাচঁ হাজার ছয় শত) টাকা মজুরি এবং প্রান্তিক সুবিধাদি পেয়ে থাকে। নানাভাবে শিল্পে এবং শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় আরও অনেক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেমন- গার্মেন্টস শিল্প পল্লী স্থাপন, ডরমিটরি গড়ে তোলা, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, শিল্প পুলিশ গঠন, অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠি বীমা কার্যক্রম চালু করা, কারিগরি শিক্ষা চালু করা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা, মোটকথা এসবের ধারাবাহিকতায় আমরা অর্থনৈতিক মুক্তির আলো দেখতে পাই। উন্নত বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাড়াঁবার শক্তি আর প্রেরণা পাই। স্বাধীন বাংলাদেশের শ্রমিকরা আমাদের সম্পদ। গাই তাদেরই জয়গান। শ্রমের মর্যাদা তারাই প্রতিষ্ঠা করবে।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় প্রয়োজন আইন প্রণয়ন ও নজরদারি বৃদ্ধি

এডভোকেট সালমা আলী
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

মাত্র ১৩ বছর বয়সী হ্যাপির যখন বই হাতে স্কুলে যাওয়া এবং সমবয়সীদের সাথে দুরন্তপনায় মেতে ওঠার কথা ছিল তখন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত পরিবার তাকে একটু সুখের আশায় গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়। দেশের একজন সুনামধন্য ও দায়িত্বশীল খেলোয়াড়ের বাসায় গৃহকর্মী হিসাবে সে সবদিক থেকে নিরাপদ এবং সুখী জীবন যাপন করবে এ স্বপ্ন দেখাটাই ছিল, তাদের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে কি তাই ঘটেছে? যার অনবদ্য নৈপুন্য ক্রিকেট বিশ্বে হয়েছে সমাদৃত, বাংলাদেশের ভাবমুর্তিকে করেছে উজ্জ্বল এবং তরুণ সমাজ যাকে রোল মডেল হিসাবে অনুকরণ করে সেই ক্রিকেটার ও তার স্ত্রী কর্তৃক গৃহকর্মী হ্যাপী অমানবিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা আমাদেরকে শুধু মর্মাহতই করেনি বরং গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করেছে। আশঙ্কার কথা গৃহকর্মী নির্যাতনের মত ঘৃণিত কাজের সাথে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অনেকে জড়িত থাকলেও তার বেশীরভাগই থেকে যায় অপ্রকাশিত। আবার গৃহকর্মী নির্যাতনের প্রকাশিত অনেক ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয়ে ধামাচাপা পড়ে যায়। কারন গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় পৃথক আইন নেই।

একটি দেশের উৎপাদন, উন্নয়ন ও সামগ্রিক অগ্রগতিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অস্বীকার করা অসম্ভব যাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োজিত। গৃহকর্মী আমাদের ব্যস্ত নগর জীবনে স্বস্তি নিয়ে আসলেও কোথাও কোথাও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং শ্রমের প্রাপ্য মূল্য বা মর্যাদা থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। অবহেলিত ও নিগৃহীত গৃহশ্রমিক পেটের দায়ে কাজ করতে এসে ধর্ষণ ও হত্যার শিকারও হচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যায়। যেসব গৃহকর্মী বাসাবাড়িতে পূর্ণকালীন কাজ করে থাকেন তাদের নির্দিষ্ট কোনো কর্মঘন্টা নেই। কাজ করতে করতে কখন যে মধ্যরাত এসে যায় তা তারা টেরও পায় না। অথচ সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বেশিরভাগ গৃহকর্মীদের মেঝেতে শুয়ে রাত পার করতে হয়। গরম শিক বা ইস্ত্রীর ছেঁকা দিয়ে নির্যাতন করার মত বর্বর ঘটনাও ঘটছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংকলিত তথ্যমতে ২০১৫ সালে গৃহকর্মী নির্যাতনের ১০০টি ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে শারীরিক নির্যাতন ৩০টি, অগ্নিদগ্ধ ১টি, অস্বাভাবিক মৃত্যু ৩টি, ধর্ষণ ২১টি, গণধর্ষণ ৩টি, ধর্ষণের পর হত্যা ৫টি, হত্যা ২৭টি এবং আত্মহত্যা ১০টি। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০০১-২০১০ পর্যন্ত শুধুমাত্র হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে ৩৯৮ জন গৃহকর্মী ।

আমরা জানি শ্রমিকদের সুরক্ষায় শ্রম আইন, ২০০৬ ও শ্রমিক কল্যাণ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা, ২০১৫ মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ এবং বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতিসহ বেশ কয়েকটি শ্রমিক ও মানবাধিকার সংগঠন ২০০৬ সালে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক গঠন করে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় নেটওয়ার্কটি 'গৃহশ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ আচরণবিধি'র খসড়া তৈরি করে ২০০৯ সালের ৯ এপ্রিল মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। ওই আচরণবিধির আলোকে ২০১০ সালে প্রণীত হয় 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা' খসড়া।

গৃহকর্মীরা এতদিন শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। মন্ত্রীসভায় গৃহকর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালার অনুমোদন নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কেননা এই নীতিমালায় গৃহকর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই নীতিমালা অনুমোদনের ফলে গৃহকর্মীরা শ্রমিক হিসেবে যেমন স্বীকৃতি পাবে, তেমনিভাবে সবেতনে ১৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছাড়াও অন্য ছুটি ভোগ করতে পারবে, যদিও এ নীতিমালায় তাদের বেতন কাঠামো নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। এছাড়া এ নীতিমালায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং সিটি করপোরেশন ও জেলা-উপজেলায় শ্রম মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল গঠনের কথা বলা হয়েছে। সেখানে গৃহকর্মীরা অভিযোগ জানাতে পারবেন। গৃহকর্মী নিয়োগ দেয়ার পর তাঁর ছবিসহ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা, তাদের জন্য হেল্পলাইন চালুর কথাও এ নীতিমালায় বলা হয়েছে।

পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন দুই ধরনের গৃহকর্মীই নীতিমালায় গৃহকর্মীর স্বীকৃতি পাবে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেয়া, প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে মজুরি দেয়া, প্রসূতিকালীন ছুটি, অসুস্থ হলে নিয়োগকারীর ব্যয়ে চিকিৎসা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এ নীতিমালায়। ১২ বছর বয়সী শিশুকে নিয়োগ করলে তার পড়ালেখা যাতে বিঘ্নিত না হয় তা বিবেচনায় রাখতে হবে। নীতিমালা কার্যকর হলে গৃহকর্মীরা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে সুবিধা পাবে। গৃহকর্মীকে যৌন নির্যাতন অথবা শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের মামলা সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত হবে। এছাড়া সর্বনিম্ন ১৪ বছরের কাউকে এবং অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ১২ বছরের কাউকে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে।

উক্ত নীতিমালা যথাযথভাবে কার্যকর হলে গৃহশ্রমিকদের অধিকারের বিষয়গুলো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পাবে। ফলে নিবন্ধন, নিয়োগপত্র, মজুরি নির্ধারণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তবে শুধু নীতিমালা তৈরি যথেষ্ট নয়। গৃহকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নীতিমালায় যেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে সার্বিকভাবে তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে না পারলে তাদের প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ ও অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি শুধুমাত্র নীতিমালাতেই আবদ্ধ থেকে যাবে। এই নীতিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন সরকারের অবকাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থান। পাশাপাশি আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও নজরদারি বৃদ্ধি করতে মনিটরিং সেল গঠনের কোন বিকল্প নেই। সর্বোপরি গৃহশ্রমিকদের অধিকারকে সুরক্ষিত করতে আইন করা অত্যন্ত জরুরি। বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে গৃহ শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারলে তা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

তবে শিশু গৃহকর্মীদের বিষয়গুলোকে আলাদা এবং কঠোরভাবে নজরদারির জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করা প্রয়োজন। শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োগের আগে তাদের নিবন্ধন করানো এবং নিয়োগদাতাদের নীতিমালা মান্য করানো বাধ্যতামূলক করাও জরুরি। কারন সমাজে গভীর বৈষম্য যত রকম বিকৃতির জন্ম দেয়, শিশুশ্রমিকদের শোষণ ও নির্যাতন তার অন্যতম। এই বিকৃতি থেকে দেশকে মুক্ত করার দায় আমাদের সবার। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের নাগরিক, শিশু গৃহকর্মীরাও এর বাইরে নয়। সুতরাং, রাষ্ট্র আগামী দিনের নাগরিকের জীবনকে নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট হবে এটাই প্রত্যাশা।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

১৬

মহান মে দিবস স্মরণে

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন

১৮৮৬ সালে মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের রক্তস্নাত শ্রমিক আন্দোলনে যারা পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন, আদালতের সাজানো রায়ে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন, বছরের পর বছর কারাজীবন কাটিয়েছেন তাদেরসহ ৩০ এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন, জেল খেটেছেন তাদের প্রত্যেককে জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা।

মে দিবসের ইতিহাস শ্রমিক আন্দোলনের সবচাইতে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সে সময়ের শ্রমিক নেতাদের আত্মত্যাগ এখনও বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণশক্তি। মে দিবস আমাদের পথ দেখায়, প্রেরণা দেয়, উদ্বুদ্ধ করে শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নে কাজ করতে।

মহান মে দিবস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মনে পড়ে গেল বিচারকে তেজোদীপ্ত, অকুতোভয়, নির্ভীক শ্রমিক নেতা সায়েজের সে অবিস্মরণীয় বক্তব্য "তোমাদের শোষণের অভিযোগই আমার আত্মপক্ষ সমর্থন করে। তোমাদের শোষণের ইতিহাসই আমার বিরুদ্ধে কথিত অপরাধের কাহিনী"।

দিব্য চোখে দেখতে পাই ঐতিহাসিক হে মার্কেটের বিরাট বিশাল শ্রমিক বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহান শ্রমিক নেতবৃন্দঃ আলবার্ট আর পার্সনস, অগাষ্ট স্পাইজ, অ্যাডলফ ফিশার ও জর্জ এঙ্গেল। পুরো একবছর বিচারের নামে প্রহসন করে এই চারজন বিশ্বনন্দিত, অকুতোভয়, চিরঞ্জীব শ্রমিক নেতাকে ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁরা মরেননি। তাঁরা অমর। সারা বিশ্বের মানুষ তাদের স্মরণ করেন গভীর শ্রদ্ধায়।

মনে পড়ে যায় ৭ আগস্ট ১৯৮৭ সালে আদালতে দাঁড়িয়ে নির্ভীক শ্রমিক নেতা অগাস্ট স্পাইজ যেসব উক্তি করেছিলেন তা আজও কত সত্য! তিনি আদালতকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "আপনারা প্রতিবাদীর বিচার করতে চান, আমি প্রতিবাদী। বিচার করুন। সম্মানিত বিচারক আপনার রায় ঘোষণা করুন। বিশ্ববাসী জানুক ১৮৮৬ সালে ৮ ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়া হলো, কারণ তাঁরা স্বাধীনতা ন্যায় বিচার, উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য তাদের বিশ্বাস অটুট রেখেছিল।"

তিনি বিদ্যমান অসম আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন- "এবার আমার সাথে চলুন এ শহরে যারা সম্পদ সৃষ্টি করেছে তাদের দেখবেন। হকিং উপত্যকায় আধাপেট খেয়ে কাজ করে যাওয়া শ্রমিকদের দেখবেন, চলুন। মঙ্গাহেলা উপত্যকাসহ দেশের আরো অনেক জেলায় নিম্নবর্ণ মানুষগুলোকে দেখবেন চলুন। রেলের রাস্তা ধরে একবার হাঁটবেন, চলুন। আর তারপর আমাকে বলুন, যে নির্দেশ আজ আপনি উচ্চারণ করছেন তা কার জন্য বা কিসের জন্য? এ নির্দেশ মানা হচ্ছে হাজার হাজার শিশু ও নারীকে কারখানার মধ্যে মেরে ফেলবার এক পদ্ধতিগত উদ্যোগ গ্রহণ। এর মানেই হচ্ছে অসহিষ্ণুতা বাড়িয়ে দেয়া, একটি গোষ্ঠীর লোভকে আরো উস্কে দেয়া, এর মানেই হচ্ছে এক হাতে দুঃখ দুর্দশা অভাব ও অক্ষমতা এবং অন্য হাতে ধ্বংস, অলসতা, লোভ লালসা এবং আগ্রাসন তুলে দেয়া।"

আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে এত বৎসর পর বিশ্ব আর্থসামাজিক পরিস্থিতির দিকে তাকাই তাহলে আমরা কি

বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব যে, উপরোল্লিখিত অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে? বিশ্বের বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন ITUC সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বলেছে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকেরা আধুনিক ক্রীতদাস (Modern Slave). ITUC অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছে বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের সরবরাহ চেইনে বিশ্বব্যাপী কমপক্ষে ১৫ মিলিয়ন আনুষ্ঠানিক ক্রীতদাসের চাকুরী হয়েছে। সমুদ্রপথে বিশেষ করে ভূমধ্যসাগর ও বঙ্গোপসাগরে কত অসহায় চাকুরিপ্রার্থী শ্রমিক-পুরুষ, নারী-শিশু পরিবারকে ক্ষুধা থেকে বাঁচবার জন্য- খাদ্যের খোঁজে উন্নত দেশে যাবার পথে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, সমূদ্রে, বনে, জঙ্গলে আটকে রেখে পরিবার থেকে অর্থ আদায় করছে, সে সব হৃদয়বিদারক, মর্মান্তিক রোমহর্ষক কাহিনী মানবসভ্যতাকে ব্যঙ্গ করছে। অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থা কি ক্রীতদাসের চেয়ে ভালো, তার ওপর বে-আইনি অভিবাসী শ্রমিকদের করুণ অবস্থা না দেখলে বিশ্বাসও করা যায়না। আমি দেখেছি, কি নারকীয় পরিবেশে অভিবাসী শ্রমিকরা কাজ করে, কি খায় এবং কোথায় ঘুমায়। এ এক মহা যন্ত্রণাদায়ক নরকবাস। মানবসভ্যতার সর্বোচ্চ যুগে এই বৈষম্য কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিবেকবান মানুষ আজ ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠছে। মানুষ সভ্য হচ্ছে না অসভ্য হচ্ছে বেশি? সভ্যতা আর উন্নয়নের ভিত্তিতে এখন শোষণ, বঞ্চনা, লোভ, লালসা, ভোগ, নির্যাতন, অত্যাচার আর নিস্পেষণ!

পৃথিবীতে এত বেশি ধনী আর এত বেশি গরীব আর কোনদিন ছিলনা। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই বৈষম্য বেড়েই চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধনী গরীবের বৈষম্য দুই দশকে ১৬ গুণ বেড়েছে, বৃটেনে ৫০ বছরের মধ্যে সবোচ্চ বৈষম্য রয়েছে এখন। সর্বশেষ একটি বিশ্ব মহামন্দায় ১০০ বিলিয়ন শ্রমিক চাকুরী হারিয়েছে এবং ১০০ বিলিয়ন কর্মচারীর বেতন কমে গেছে।

বিশ্বায়নের নামে, দারিদ্র নিরসনের নামে, ন্যায্য বিশ্ববাণিজ্যের নামে, মানুষের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে এসব আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কাজের ধরনকে প্রায় সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক খাত প্রায় বিলুপ্ত করে অপ্রতিষ্ঠানিক খাতকে প্রাধান্য দেয়া হলো। হু হু করে বেড়ে গেলো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। আউটসোর্সিংতো আজ খুবই বহুল পরিচিত শব্দ। এই অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক কাজ- যাকে ইংরেজীতে বলা হয় - Precarious Work- তা ঝড়ের গতিতে আশংকাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। খরচ বাঁচানোর নামে, অধিক মুনাফা লাভে এই কাজের সৃষ্টি। এসব কাজ অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক, অনিয়মিত, দিনমজুরি, বিপদজনক, অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ কর্মস্থল, নামমাত্র মজুরী, সাপ্তাহিক ছুটিসহ কোন ছুটি নেই, পরিচয়পত্র নেই, কর্মঘন্টা অনির্ধারিত, কোন স্বাস্থ্যসেবা নেই, ইউনিয়নের নাম নেয়া হারাম, শারীরিক জুলুম, অত্যাচার নিত্যদিনের ব্যাপার। এই Precarious Work, অস্থায়ী কাজ, আউটসোসিং ব্যবস্থা শ্রমিক শোষণকে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে গেছে যাকে আমি আধুনিক ক্রীতদাস প্রথা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছিনা। সভ্যতার কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে? এর থেকে বের হবার জন্য ILO, ITUC কাজ করছে- অপ্রাতিষ্ঠান খাতকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এই শিরোনামে।

আমি জানি অত্যাচার, উৎপীড়ণ, শোষণ যত বাড়ে আন্দোলনও তত বেগবান হয়। বাংলাদেশের দুর্বল শ্রমিক আন্দোলন আমাদের ভাবমুর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে। আমরা বহুধাবিভক্ত। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মত নেতাদের বাদ দিয়েই মহান মে দিবসের অনুপ্রেরণাকে বুকে ধারণ করে সত্যিকার শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশে গড়ে উঠবেই।

মে দিবস অমর হউক।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

মে দিবসে আজ মনে পড়ে যায়

আবদুল মতিন মাষ্টার
সদস্য, প্রথম শ্রম আদালত, ঢাকা।
উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য, Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS).
সাবেক সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ, কেন্দ্রীয় কমিটি।

১ মে, ২০১৬' রবিবার ... জাতীয় ও বৈশ্বিক চেতনায় আজ পালিত হচ্ছে আর্ন্তজাতিক শ্রমিক দিবস। সারা বিশ্বব্যাপী আজ একই সাথে উদযাপিত হচ্ছে মুক্তির বারতা। আজ ছুটি, পুরো পৃথিবী আজ ছুটিতে গেছে নিপীড়িত, নিষ্পেসিত মানুষের সংগ্রামকে সঙ্গী করে। সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সুদূর আমেরিকাতে, শিকাগো শহরে। মানুষ নেমেছে রাস্তায়, দাবি তাদের ভালো মজুরী, যথাযথ কাজের পরিবেশ এবং আট ঘন্টার কর্মদিবস। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে সংঘটিত হে-মার্কেট ঘটনার স্মরণেই ১ মে আর্ন্তজাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়ে আসছে।

হে-মার্কেটের ঘটনাটি বিশেষ একদিনের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটি প্রায় সুদীর্ঘ উনিশ শতাব্দী ধরে ঘটে আসা শ্রমিক আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশ। যেমনটি ৭১-এ ঘটেছিল দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে বীর বাঙালীর দীর্ঘ সংগ্রামের সর্বব্যাপী অধ্যায়। হে-মার্কেট আন্দোলনও একইরকম উনিশ শতকের নিপীড়িত-নির্যাতিত শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর দাবি আদায়ের গৌরবপূর্ণ অধ্যায়। ১৮২৭ সালে পৃথিবীর প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে খ্যাত Mechanics' Union of Philadelphia ১০ ঘন্টার কর্ম দিবসের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৮৩৪ সালে নিউ ইয়র্কের বেকারি শ্রমিকদের এক ধর্মঘট সম্বন্ধে Workingmen's Advocate Report থেকে জানা যায়, "journeymen employed in the loaf bread business have for years been suffering worse than Egyptian bondage. They have had to labor on an average of eighteen to twenty hours out of the twenty-four." ১৮৩৭ সালে ১০ ঘন্টার কর্ম দিবস একটি আন্দোলনে রূপ নেয়। তারপর ১৮৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকরা "8 hours work, 8 hours recreation and 8 hours rest"- এই দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে বিশ্বব্যাপী ৮ ঘন্টা কাজের দাবিটি সোচ্চার হয়ে উঠে।

১৮৮৬ সালে ১ মে'র পূর্বেকার দিন রোববার তৎকালীন আমেরিকান কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন পঁচিশ হাজারেরও বেশী শ্রমিকের এক শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। তাদের অগ্রগণ্য দাবি ছিল ৮ ঘন্টার কর্মদিবস। পাশাপশি উপযুক্ত কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা এবং মর্যাদাপূর্ণ ন্যায্য মজুরি। দাবি আদায়ের জন্য পরদিন ১ মে ১৮৮৬ তে শিকাগোর শ্রমিক শ্রেণী কর্ম বিরতি পালন করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে অভূতপূর্ব উদাহরণ তৈরী করে, যা পরবর্তী দিনগুলোতে শ্রমিক আন্দোলনে গভীর রেখাপাত করে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মে'র ৩ তারিখে শিকাগোর মেক' কমিক রিপার কোম্পানিতে দাবি আদায়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালালে ছয়জন শ্রমিক মারা যায়, আহত হয় অগনিত।

এর প্রতিবাদে পরদিন ৪ তারিখে হে-মার্কেট স্কোয়ারে আয়োজিত এক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ আবারো বর্বরোচিতভাবে হামলা চালালে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এতে সাতজন পুলিশসহ নিহত-আহত হয় অসংখ্য শ্রমিক । এ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়- "The police reacted by firing on the workers, killing dozens of demonstrators and several of their own officers. Initial newspaper reports made no mention of firing by civilians. Reliable witnesses testified that all the pistol flashes came from the center of the street, where the police were standing, and none from the crowd. A telegraph

pole at the scene was filled with bullet holes, all coming from the direction of the police." পরবর্তী বছরগুলোতে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় আন্দোলনকারি অসংখ্য শ্রমিক। এদের মধ্য থেকে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচজনকে বিভিন্ন প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ১৮৯১ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ২য় ইন্টারন্যাশনাল'- কংগ্রেসে মহিমান্বিত শিকাগোর এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির স্মরণে ১ মে'-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে দিনটি জাতীয় ছুটিসহ নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ব্যাপী পালিত হয়ে আসছে।

পাকিস্তান আমলে মে দিবসের ছুটি ছিল না। বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাধীনতার অব্যবহতি পরই বাংলাদেশে ১ মে' কে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ ২২ শে জুন ১৯৭২ সালে International Labour Organisation (ILO)' র সক্রিয় সদস্য পদ লাভ করে। সে সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে ILO 'র মৌলিক সাতটি কনভেনশনসহ মোট ৩৩টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। ১৯৭৩ সালের ২৫ জুন ILO তার ঢাকা অফিসের কার্যক্রম শুরু করে।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশ মোট ৩৮টি ILO Recommendation অনুসমর্থন করেছে। তাই মে দিবস এলেই মনে পড়ে যায় – ১৯১১ তে নিউইর্য়ক সিটির ট্রায়াঙ্গল শার্ট ওয়েষ্ট ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছিলো ১৪৬জন শ্রমিক। ঠিক তেমনি বিধ্বস্ত রানা প্লাজা, অগ্নিদগ্ধ তাজরিন ফ্যাশনসহ নানা দূর্ঘটনায় নতুন এ শতাব্দীর শুরুতেই নিহত হলো আমার হাজারো শ্রমিক ভাই ও বোন, রক্তে রঞ্জিত হলো বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। ৭১ এ যে প্রিয় মুখের পানে চেয়ে ঘর ছেড়েছে কোটি বাঙ্গালি সেই মহামানবের মহা প্রয়ানের কথা আজ মনে পড়ে যায়। লাখো শ্রমিকের হৃদয় নিংড়ানো যে দেশ আমার স্বাধীনতা পেয়েছে হাজারো বীরের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে, সে

শ্লোগান যেনো আজো বেজে যায় প্রাণে –
"বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো, সোনার বাংলা স্বাধীন করো"।

৭৫ – এ এক অন্ধকার আবারো গ্রাস করে নিলো আমাদের ঘর, শকুনের থাবায় বিধ্বস্ত সে সংসারে আলো জ্বালাতে এলো বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা। আপামর জনতা, শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের ভালোবাসা নিয়ে জননেত্রী এলেন জনতার কাছে। আর তাই বাংলার শ্রমিকেরা পেল মুক্তির আস্বাদ। জননেত্রীর সরকার এরই মধ্যে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণার মধ্য দিয়ে মেহনতি মানুষের অধিকারকে জানিয়েছেন আন্তরিক শ্রদ্ধা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র স্ব-উদ্যোগে তাঁর সরকার কোন প্রকার আন্দোলন বা দাবি-দাওয়া ব্যাতিরেকেই সরকারি কর্মচারিদের জন্য ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে নতুন পে-কমিশন ঘোষণা করেছেন। পরবতী সময়ে মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ১লা জুলাই ২০০৯ থেকে কার্যকর রয়েছে। এরই মধ্যে সরকার পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করেছে যা ২০১৫ সালের জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। যদিও প্রতি পাঁচ বছর পর পর পে-কমিশন ঘোষিত হয় সে অনুসারে ২০০৯ সালের পর ২০১৪ সালের জুলাই থেকে নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়নের কথা ছিল, তথাপি এক বৎসর দেরীতে হলেও নতুন বেতন স্কেল কার্যকর হওয়ায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দিত হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন -২০১০ 'এর সফল বাস্তবায়নে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রক্ষার্থে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য মজুরি কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায়সংগত অধিকারকে বিবেচনা করায় প্রধানমন্ত্রীকে আবারো ধন্যবাদ।

ইতোমধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্রব্য মূল্য ও বাজার দরের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে প্রতিটি শ্রমিক পরিবারকেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত শ্রমিক শ্রেণির জন্য প্রতিশ্রুত মজুরী কমিশন গঠন করা হবে বলে আশা করছি।

এতে করে নতুন ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলের সাথে শ্রমিক শ্রেণির আয়ে যে এক বিশাল অসংগতি তা দূরীভূত হবে। বর্তমানে মজুরি কমিশন ও মজুরি স্কেল নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের চাপা অসন্তোষ বিরাজ করছে। তবে সরকার 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠন করে জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের জন্য মজুরি নির্ধারণ করেছে যা ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। বেসরকারি খাতেও এ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্রুত পদক্ষেপ নিবেন আশা করছি।

শতাব্দী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পর বাংলাদেশ এখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সোপানে দাড়িয়ে আছে। বিশ্ব ব্যাংক এরই মধ্যে বাংলাদেশকে নিম্ন মাধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। উচ্চ মাধ্যম আয়ের দেশে পৌছা আজ কোন স্বপ্ন নয়। বরং এ যেন অতি নিকট ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এলে সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ILO Convention বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোপূর্বে সময় ও বাস্তবতা বিবর্তিত হলেও ১৯৮১ সালের পর থেকে আর কোন নতুন শ্রমনীতি ও বিধি প্রণীত হয়নি। মন্ত্রীসভা গঠন করার অব্যবহৃতি পরই বর্তমান মহাজোট সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে 'সরকার, শ্রমিক ও মালিক' এই তিনের সমন্বয়ে ত্রি-পক্ষীয় পরামর্শক কমিটি (Tri-partite Consultant Committee) পূনর্গঠনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন সংস্কারে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহন করেছে। শ্রমমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় ১৯টি শ্রমিক ফেডারেশন থেকে ২০ জন, মালিক পক্ষ থেকে ২০ জন এবং ২০ জন সরকারি প্রতিনিধি সদস্য সমন্বয়ে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি শ্রমিকদের স্বার্থ ও শিল্প উৎপাদনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কমিটি শ্রমআইন, শ্রমনীতি ও বিধি এবং শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাসময়ে সরকারকে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

২০০৬ সালের শ্রম আইনকে Ratify (সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন) করে বর্তমান সরকার ২০১৩ সালে 'গণতান্ত্রিক শ্রম আইন' প্রনয়ণ করেছে। সরকার ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে শ্রমমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে শ্রমিক পক্ষের ১২ জন, মালিক পক্ষ থেকে ১২ জন এবং ১০ জন সরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট শ্রম আইন সংশোধন কমিটি গঠন করেছে। সরকার এরই মধ্যে আহত-নিহত শ্রমিক কর্মচারীদের সহায়তার জন্য শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন' পূণর্গঠিত করেছে। এ বিষয়ে সংসদে একটি আইন পাশ হয়েছে যে প্রত্যেক মালিক তার লভ্যাংশের ৫% কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অনুদান দিতে বাধ্য থাকবে। এভাবে 'শ্রমিক-মালিক-সরকার' এ তিনের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে।

অসৎ মালিকদের হাত থেকে শিল্প-কারখানা রক্ষা করতে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। বিগত সরকারসমূহের আমলে জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বিভিন্ন বকেয়া পাওনাদি বর্তমান সরকার পরিশোধ করেছে। এরই মধ্যে সরকার কয়েকটি জুট মিলসহ বিভিন্ন বন্ধ শিল্প-কারখানা চালু করেছে এবং যে সমস্ত মালিক পানির দামে সরকারি এসব সম্পত্তি ক্রয় করে বন্ধ রেখেছেন, মালিকদের ব্যার্থতায় বন্ধ এসব কল-কারখানা সরকারি খাতে ফেরত এনে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। যে সমস্ত শিল্প মালিকরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে উৎপাদন বন্ধ রেখে অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে শ্রমিক-স্বার্থ নষ্ট করেছেন এবং করছেন, তাদেরকে উপযুক্ত বিচার ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

বর্তমান মহাজোট সরকারের সময়কালে ২০০৯ সালের জুন মাসের ৭ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত জেনেভায় অনুষ্ঠিত ILO -র ৯৮তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করার সৌভাগ্য অর্জন করে। বাংলাদেশের পক্ষে তৎকালিন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি সভাপতিত্ব করেন।

সভায় আই.এল.ও'র সদস্য ১৮৩ টি দেশের শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিক প্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিনিধি (শ্রমমন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রী পদ মর্যাদা সম্পন্ন) ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ৭টি দেশের রাষ্ট্রপতি, ৯টি দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ৫টি দেশের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। সে সময় দেশের দক্ষিণ বঙ্গে প্রলয়ংকরী আইলা ঘুর্নিঝড়ের কারণে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত হতে পারেননি।

তবে সভায় জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের পাশাপাশি জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি ভিডিও বক্তব্য প্রচার করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে আই.এল.ও -র সেই সভায় বাংলাদেশের পক্ষে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। তাই সেই সভায় উপস্থিত হয়ে আমারও বক্তব্য দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সভায় শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যকার ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে শ্রমিক ও মালিকদের ন্যায় সম্মত স্বার্থ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়া হয়।

সরকার ব্যক্তি মালিকানাধীন ৪২টি শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে গার্মেন্টসসহ ৩৮টি সেক্টরের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। বাকীগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো ব্যক্তি-মালিকানাধীন সেক্টর চিহ্নিত করে সেগুলোর জন্যও ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা অত্যাবশ্যক। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে ন্যূনতম জাতীয় মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে শ্রমিকদের চাকুরির বয়সসীমা ৬০-এ উন্নীত করার ঘোষণা দেন, যা ইতঃমধ্যে কার্যকর হয়েছে। ২০০৬ সালের শ্রম আইনে শ্রমিক-কর্মচারিদের চাকুরির বয়স সীমা ৫৭ বছর নির্ধারিত ছিল। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ বয়সসীমা ৫৯ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাসহ তাদের পরিবার ও পোষ্যদের চাকুরির বয়সসীমা পূর্বেকার ৫৭ থেকে ৫৯ ও পরবর্তীতে আরো এক বছর বাড়িয়ে ৬০-এ উন্নীত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষতঃ এ সীমা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এছাড়া সরকারী চাকুরিতে যোগদানের বয়স সাধারণের জন্য ৩০ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩২ রয়েছে।

বর্তমানে উচ্চশিক্ষাসহ নানাবিধ কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী সরকারি-বেসরকারি চাকুরি কিংবা বি.সি.এস -এ অংশ গ্রহন করতে পারছে না। এতে করে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। তাই চাকুরির বয়স সীমা ৩৩-এ উন্নীত করা এখন সময়ের দাবি। এ বিষয়ে ২০১২ সালে সংসদেও আলোচনা হয়েছে। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী National Productivity Committee (NPC) কে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করে আসছে। এ কমিটি বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে উৎপাদন সম্পৃক্তিতে একাগ্রভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

এ ছাড়া বিদ্যমান ৭ টি শ্রম আদালত পূনর্গঠিত করা হয়েছে। সরকারের বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে এই শ্রম আদালতগুলো সূচারুভাবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে চলছে। শ্রমিক ও মালিকদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তি এবং কোর্টে বিচার প্রার্থীদের উপস্থিত হওয়ার স্বার্থে শিল্পঘন এলাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে এ ধরণের আরো আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষতঃ নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, গাজিপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর, বগুড়া এবং কুমিল্লার মতো শ্রমঘন এলাকায় এবং বিভাগীয় শহর সিলেট, রংপুর ও বরিশালে শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে।

সরকার কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিরাজমান শ্রমিক অসন্তোষ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নিরসন কল্পে এরই মধ্যে শিল্পঘন এলাকায় স্থানীয় সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বয়ে Crisis Management Committee (CMC) গঠন করেছে। শিল্পঘন এলাকায় শ্রমজীবীদের জন্য আবাসন (Dormitory), হাসপাতাল, কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের সুবিধার্থে শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিতে আরো নজরদারি প্রয়োজন। শিল্প-কারখানাগুলোতে যথাযথভাবে বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার জন্য ETP স্থাপনসহ পরিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া চামড়া শিল্প (Tannery), গার্মেন্টস ও ঝুঁকিপূর্ণ সকল কল-কারখানা শহর থেকে সরিয়ে যাবতীয় অবকাঠামোগত সুবিধাসহ যথা বিদ্যুৎ ,পানি, গ্যাস, টেলিফোন, ইন্টারনেট ও যাতায়াত এবং আবাসনের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট শিল্প-পার্ক গড়ে তুলতে হবে। আশার কথা, সরকার এরই মধ্যে হাজারিবাগ ট্যানারি শিল্পকে সাভারে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে।

শিল্প পুলিশ গঠন করে সরকার ইপিজেডসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শান্তি-শৃংখলা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তবে এই ক্ষেত্রে সরকারকে আরো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, শিল্প পুলিশ যেন শিল্প ও উৎপাদন সহায়ক হয়, কখনো যেন মালিক শ্রেণির শোষন-নিপীড়নের হাতিয়ার না হতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ এবং ক্রমান্বয়ে শিশুশ্রম বন্ধে অবিলম্বে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে ২৬,০০০ রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছে, যার ফলে লক্ষাধিক শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ হয়েছে । একই সাথে ৯ম ওয়েজ বোর্ড ঘোষণাসহ সংবাদমাধ্যম ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য আলাদা আলাদা বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

শ্রমিক-বান্ধব বর্তমান মহাজোট সরকার গৃহীত শ্রম আইনগুলো দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ জন্য শ্রম দপ্তর ও ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্টের জনবল আরো বৃদ্ধি করা আবশ্যক। একই সাথে শ্রমঘন অঞ্চলে এদের শাখা অফিস খুলতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বিকল্প চাকুরির ব্যবস্থা না করে শ্রমিক ছাটাই বন্ধ করতে ও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংরক্ষণে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে গতিশীল নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখতে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানগুলো যথাসময়ে নির্বাচন আয়োজনে সহায়ক হতে পারে। শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের Technical Training Centre (TTC) গুলোকে আরো সক্রিয় করে তুলতে হবে। দেশে মোট ৩৭ টি TTC রয়েছে। এর মধ্যে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ২৬ টি সেন্টারের মাধ্যমে ১৪টি ট্রেড কোর্স চালু রয়েছে।

এগুলোকে আরো কার্যকর করে তুলতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, নতুন নতুন কোর্স চালু এবং এর জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সেন্টারগুলোকে আরো সক্রিয় ও কার্যকর করে তুলতে প্রবাসী শ্রমিকদের চাহিদা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদেরকে ইংরেজী, শ্রমিক আমদানিকারক দেশগুলোর স্থানীয় ভাষা ও মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজারকে বিবেচনায় রেখে আরবী ভাষায়ও প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞান ও ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় আরো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা আবশ্যক।

সরকার এরই মধ্যে মালয়েশিয়াতে ১৫ লক্ষ শ্রমিক পাঠানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান প্রায় ৮০ লক্ষ বাংলাদেশী শ্রমিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। সরকার এ সকল শ্রমিকদের স্বার্থে এবং একই সাথে বিদেশ গমনেচ্ছু নতুন শ্রমিকদের সুবিধার্থে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' এর কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশগামী শ্রমিকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের সু-ব্যবস্থা হয়েছে। এখন থেকে দালালদের প্রতারণায় জমি-জিরাত সব হারিয়ে বিদেশগামী কোন শ্রমিকের নিঃস্ব হবার সম্ভাবনা লুপ্ত হবে আশা করা যায়। এছাড়া শ্রমিকরা যাতে স্বল্প খরচে শুধুমাত্র বিমান ভাড়া দিয়ে বিদেশ যেতে পারে, সরকার সে প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। মালয়েশিয়ায় মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫০,০০০ শ্রমিক পাঠানোর জন্য দেশব্যাপী রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলছে। আমাদের সরকার ইতোমধ্যে ২০-৩০ হাজার টাকায় বাহরাইন ও কাতারে শ্রমিক রপ্তানির জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে করে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতীয় আয় রেমিটেন্স আরো বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন। একই সাথে নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টি এবং বাংলাদেশী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিদেশে প্রতিটি বাংলাদেশ মিশনে লেবার সহায়ক ডেস্ক চালু করা প্রয়োজন।

বর্তমানে শিল্প আয়ের সবচেয়ে বড় খাত পোষাক শিল্পের ধারাবাহিক অগ্রগতি আবশ্যক। এই শিল্পে আমাদের দেশ গণচীনের পর ২য় অবস্থানে রয়েছে। আমাদের প্রতিযোগি হিসেবে তার পরেই রয়েছে ভারত, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া। তবে আশার কথা, চীন এরই মধ্যে ভারি শিল্পে মনোনিবেশ করায় পোষাক শিল্পের বিদেশী ক্রেতারা ক্রমান্বয়েই বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছেন। তাই গার্মেন্টস শিল্পকে ঘিরে যে কোন দেশী-বিদেশী নাশকতামূলক আত্মঘাতি চক্রান্ত প্রতিহত করতে সরকারকে আরো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ৪০ লক্ষ শ্রমিকের বৃহৎ এই খাতটিতে ৮০ ভাগই নারী। রাষ্ট্রীয় স্বার্থেই বেপজাসহ সকল ইপিজেড -এ এইসব অবহেলিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারী শ্রমিকদের সুবিধার্থে এ সকল শিল্পে শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার, দুধ, বিস্কিটসহ বিনামূল্যে শিশু খাবার নিশ্চিত করা আবশ্যক। সরকার EPZ গুলোতে শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি ও নীতিমালা ঘোষণা করেছে।

দেশের উল্লেখযোগ্য উদীয়মান আরো দুটি শিল্পখাত হচ্ছে ঔষধ শিল্প ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প । ঔষধ শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত ও দূরীভূত করে এ খাতটিকে পোষাক শিল্পের মতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরেকটি সুবিশাল খাত হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। সরকার কর্তৃক ইতঃমধ্যে জাহাজ ভাঙ্গা'কে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এখানে বিশেষতঃ চট্টগ্রামের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে হাজার হাজার শ্রমিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ মনোনিবেশ আশু প্রয়োজন। ২০১২ তে ILO General Council-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গৃহ শ্রমিকদের (Domestic Worker) অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। সরকার এরই মধ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ ঘোষণা করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি, শুধুমাত্র শোভন কাজ (Decent Work), ন্যায্য মজুরি (Proper Wage) এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার (Trade Union Rights) -ই শিল্প-কারখানায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে । সবশেষে, আই.এল.ও -এর ধারা ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী Domestic Worker সহ সকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও স্বাধীনভাবে নেতা নির্বাচনের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে । জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণীত ভিশন -২০২১ এবং ২০১৫ সালের মধ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনের পর টেকসই উন্নয়ণ লক্ষ্যমাত্রা (STGs) অর্জনে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিগণিত করতে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ একান্ত আবশ্যক। আগামী দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখি-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে, জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
জয় হোক বাংলার মেহনতি জনতার।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

১৬

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন

রায় রমেশ চন্দ্র
সাবেক সাধারণ সম্পাদক ,জাতীয় শ্রমিক লীগ এবং
সভাপতি, ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কারস।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এই স্বাধীনতা পেতে গিয়ে এ দেশের ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। প্রায় ৩ লাখ নারী ধর্ষিত হয়েছে এবং প্রায় এক কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। উদ্বাস্তুরা প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে।

১ লাখ ৪৪ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। শিক্ষিত মানুষের হার ৪৪ দশমিক ৩ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৮৬ শতাংশ। বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। এদেশের ৩ পঞ্চমাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে জড়িত। পাট ও চা হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম দুটি উৎস। বর্তমানে দেশে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬ শতাংশ। দেশের অর্থনীতির বড় তিনটি ভিত হচ্ছে কৃষি, প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ পোশাকশিল্প ও রপ্তানিমূখি শিল্প থেকে আয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাকশিল্পের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নয়, এর মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানও হয়েছে। গত শতকের আশির দশক থেকে দেশে পোশাকশিল্পের প্রসার শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ ধারা বিদ্যমান। পোশাকশিল্পে বর্তমানে ৩৫ লাখেরও বেশি শ্রমিক কাজ করেন। কিন্তু এই বিপুলসংখ্যক শ্রমিকদের বাংলাদেশের মহান সংবিধান,আইএলও কনভেনশন ও দেশের প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার কার্যকর ও অর্থবহ কোন সুযোগ নেই।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সদস্যভুক্ত দেশ। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইএলও এ পর্যন্ত ১৮৩টি কনভেনশন গৃহিত হয়েছে। আটটি কোর কনভেনশনসহ ৩৩টি কনভেনশন বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন দিয়েছে। এর মধ্যে আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও সমঝোতা ৯৮ এ শ্রমিকদের সংঘ গড়ে তোলার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশটিতে এখনও আইএলও কনভেনশন মেনে শ্রমিক সংগঠন আশানুরূপ ভাবে গড়ে ওঠেনি। এর মূলকারণগুলো হচ্ছে শ্রমিকদের প্রতি নিয়োগদাতাদের বৈরি মনোভাব, আমলাতান্ত্রিকভাবে বিলম্ব করার প্রবণতা, সরকারের আইন বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অদম্য ও নিবেদিতপ্রাণ সংগঠকের অভাব । শ্রমিক নেতৃত্বের সুবিধাবাদী ও আপোষকামী মনোভাব,আদর্শিক ঐক্যের অভাব,শ্রমিক আন্দোলনে তথাকথিত এনজিওদের অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যও শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করছে।

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশ রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের কৌশল নেয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যায় । বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালের নতুন শিল্পনীতি এবং ১৯৮৬ সালের সংশোধিত শিল্পনীতিতে উদারীকরণের ওপর জোর দেয়। এতে মূলত যেসব বিষয়ের ওপর নজর দেয়া হয় তার মধ্যে ছিল আমদানিতে ভর্তুকির নীতির পরিবর্তে রপ্তানিকে উৎসাহিত করে এ খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে বিধি শিথিলকরণ, রপ্তানি পদ্ধতির উদারীকরণ, বাংলাদেশে বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য প্রণোদনা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও স্বশাসন দেয়া, যাতে তারা বাণিজ্যিকভাবে তাদের কাজকর্ম চালাতে পারে। ১৯৯১ ও ১৯৯৫ সালের শিল্পনীতিতে বাণিজ্য খাতকে আরও উদার করার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়। এতে শিল্প খাতে নজরদারির পরিবর্তে

সরকারের সহায়ক ভূমিকার কথা বলা হয়। বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ নানা উপাদানের মধ্যে আছে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ, কম সুদের হার, শুল্ক-ফেরত নীতি, রপ্তানিতে ভালো করলে বাড়তি সুবিধা, বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্মসূচী, রপ্তানিমুখী শিল্পকে কর-ছাড় এবং ব্যাক টু ব্যাক এলসি (লেটার অব ক্রেডিট)।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হলো, এই সহায়ক নীতির কারণে বিগত এক দশকে এ দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০০০-২০০১ থেকে ২০০৫-২০০৯ (জানুয়ারি-২০০০ থেকে সেপ্টেম্বর-২০০৫) পর্যন্ত প্রতি বছর রপ্তানি আয় বেড়েছে ২৩.৮ শতাংশ (চক্রবৃদ্ধি) হারে। এই ধরনের অতি দ্রুত প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই খাত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) বড় কোনো অবদান রাখতে পারেনি। নিচে দেওয়া প্রথম সারণী থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের মোট জিডিপিতে রপ্তানি খাতে অবদান মাত্র ১৭.৪১%। এই সারণী থেকে এটাও বোঝা যায় যে, গত পাঁচ বছর ধরে এই পরিমাণটাই কম-বেশি একই আছে।

রপ্তানি পণ্য	অর্থবছর				
	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
হিমায়িত খাদ্য	৪২০৭৪০	৪৫৯১০৬	৫১৫৩১৮	৫৩৪০৬৬	৪৫৪৫২৮
কৃষিপণ্য	৮২৪৭০	১০৫৩৯৯	৮৭৮১৬	১২০১৩২	১২২২৯৪
চা (প্যাকেটজাতসহ)	১৫৮৪০	১১৮৯২	৬৯৪৪	১৪৮৮৬	১২২৯০
রাসায়নিক পণ্য	১৯৭১৮০	২০৫৫৭৬	২১৫২৪৫	৪০০৮৮৮	৪২১৫৮০
চামড়া	২২০৯৩০	২৫৭২৬৯	২৬৬০৮২	২৮৪৪০৯	১৭৭৩১৯
কাঁচা পাট	৯৬১৯০	১৪৮২৭২	১৪৭১৪৯	১৬৫০৬৩	১৪৮১৭০
পাটজাত পণ্য	৩০৭৪৮০	৩৬১০২৫	৩২০৭৮৪	৪০৫৪৮৫	৩৭৩১৮১
নিট পোশাক	২৮১৯৪৭০	৩৮১৬৯৮১	৪৫৫৩৬০৪	৫৫৩২৫২৪	৬৪২৯২৫৬
ওভেন পোশাক	৩৫৯৮২০০	৪০৮৩৮১৭	৪৬৫৭৬৩৫	৫১৬৭২৮১	৫৯১৮৫১৪
অন্যান্য	৮৯৬০২০	১০৭৬৮২৭	১৪০৭২৮৪	১৪৮৬০৬৪	১৫০৮০৫৮
মোট	*৮৬৫৪৫২০*	*১০৫২৬১৬৪*	*১২১৭৭৮৬১*	*১৪১১০৭৯৮*	*১৫৫৬৫১৯০*
রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি	+১৬.১০	+১৩.৮৩	+২১.৬৩	+১৫.৬৯	+১৫.৮৭
জিডিপিতে (মোট দেশজ উৎপাদন) রপ্তানি আয়ের শতকরা অংশ	১৪.৩৫	১৭.০০	১৭.৮০	১৭.৮৭	১৭.৪১

সূত্র: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

গত এক দশকের রপ্তানি অবকোঠামোর পরিবর্তন এবং রপ্তানির বৃদ্ধির বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তৈরি পোশাকশিল্প পণ্য রপ্তানি খাতে তাদের আধিপত্য ধরে রেখেছে। ১৯৮৮ সাল থেকে তৈরি পোশাকশিল্প এই অবস্থানটি ধরে রেখেছে। অন্যদিকে একই সময় পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমে আসে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক দিয়ে অন্য যে কোন শিল্পের চেয়ে পোশাকশিল্প এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয় সারনীতে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে পোশাকশিল্প খাত ছাড়া বাকি সব খাতে রপ্তানি আয় কমেছে । ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যত বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে তার ৯৭ শতাংশ এসেছে তৈরি পোশাকশিল্প (নিট পোশাক ও ওভেন পোশাক) থেকে। সাম্প্রতিক এক হিসেবে দেখা গেছে, বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পে যত মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে তাদের ৭৫ শতাংশের বেশি হয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পে।

২০০৪/০৫ থেকে ২০০৮/০৯ অর্থবছরে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশের মোট আয়।

প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য	অর্থবছর				
	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
হিমায়িত খাদ্য	৪.৮৬	৪.৩৬	৪.২৩	৩.৭৮	২.৯২
কৃষিপণ্য	০.৯৫	১.০০	০.৭২	০.৮৫	০.৭৯
চা (প্যাকেটজাতসহ)	০.১৮	০.১১	০.০৬	০.১১	০.০৮
রাসায়নিক পণ্য	২.২৮	১.৯৫	১.৭৭	২.৮৪	২.৭১
চামড়া	২.৫৫	২.৪৪	২.১৮	২.০২	১.১৪
কাঁচা পাট	১.১১	১.৪১	১.২১	১.১৭	০.৯৫
পাটজাত পণ্য	৩.৫৫	৩.৪৩	২.৬৩	২.৮৭	২.৪০
নিট পোশাক	৩২.৫৮	৩৬.২৬	৩৭.৩৯	৩৯.২১	৪১.৩১
ওভেন পোশাক	৪১.৫৮	৩৮.৮০	৩৮.২৫	৩৬.৬২	৩৮.০২
অন্যান্য	১০.৩৫	১০.২৩	১১.৫৬	১০.৫৩	৯.৬৯
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সূত্র: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

গত এক দশকে বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাপকহারে গড়ে উঠেছে। সারণী-৩ এ দেখা যায় ২০০০-২০০১ সালে দেশে পোশাক কারখানার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৪৮০। ২০১০ সালের মে মাসে এই সংখ্যা পাঁচ হাজারে উন্নীত হয়। একই সময়ে এ শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা ২০ লাখ থেকে ৩৫ লাখে দাঁড়ায়। এই সময়কালে ওভেন পোশাকের কারখানার চেয়ে নীট পোশাক কারখানার সংখ্যা দ্রুতগতিতে গড়ে উঠেছে। এটা খুবই আশার কথা যে সাম্প্রতিক বিশ্বজুড়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দার পরও বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে ধ্বস নামেনি। সারনী ৩ এ দেখা গেছে, পোশাক কারখানাগুলোতে প্রতি বছর এক লাখেরও বেশি নতুন শ্রমিক নিয়োগ পেয়েছে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রবৃদ্ধি শ্রমিকদের ওপর বিশেষ করে নারীশ্রমিকদের ওপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরণের প্রভাবই ফেলেছে। পোশাক শিল্পে পুরুষের চেয়ে নারীশ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশি। ইতিবাচক দিক হচ্ছে পোশাকশিল্প বিপুলসংখ্যক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। নেতিবাচক দিক হচ্ছে কম মজুরি, মজুরি প্রদানে অনিয়ম, চাকরির নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি।

গবেষণায় দেখা গেছে, পোশাক কারখানায় কাজ শুরু করার পর নারী শ্রমিকেরা নানা ধরণের অসুখে ভুগতে শুরু করে। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও প্রতিকূল কর্মপরিবেশের কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের কোন সংগঠন ছাড়া নারী পোশাক শ্রমিকরা তাদের দাবি দাওয়া জানাতে পারে না। তাদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না।

সন	ওভেন	নীট+সোয়েটার	মোট	প্রতিবছর নতুন নিয়োগকৃত শ্রমিকের সংখ্যা
২০০১	১২১	১০৪	২২৫	১,১৫,৮৪২
২০০২	৫৯	৯৫	১৫২	১,১৫,১১৯
২০০৩	৪১	১৩৩	১৭৪	১,১৬,৭৬৩
২০০৪	৬৮	১২০	১৮৮	১,৪৪,৫৯৭
২০০৫	৭৫	৮০	১৫৫	১,৩০,১৭৪
২০০৬	৯১	৮১	১৭২	১,১৮,২৪২
২০০৭	১০৭	১১২	২১৯	১,৩২,২৭৫
২০০৮	৯৩	১৪৯	২৪০	১,৫৭,৯৭৬
২০০৯	৪৮	১৩২	১৮০	১,০১,৫৭৭
২০১০ (এপ্রিল পর্যন্ত)	২০	৪৩	৬৩	২৯,১২০

সূত্র: তৈরি পোশাক মালিক সমিতি (বিজিএমইএ) ও নীট পোশাক মালিক সমিতি(বিকেএমইএ)

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে । তখন এ আন্দোলন ছিল ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য। ব্রিটিশ শাসকরা ১৯২৬ সালে শ্রমিক সংঘ আইন প্রণয়ন করে । ১৯০৬ সালে ব্রিটেনে প্রণীত ইংলিশ বাণিজ্য বিরোধ আইনের আদলে ওই শ্রমিক সংঘ আইন প্রণয়ন করা হয়। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যমান শ্রমিক সংগঠনগুলোর নিবন্ধন নিশ্চিত করা। এই আইনে দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘটের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তবে এরপরে ১৯২৯ সালে নতুন করে প্রণয়ন করা হয় বাণিজ্য বিরোধ আইন। এই আইনে শ্রমিক ধর্মঘটের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এরপর বাণিজ্য বিরোধ আইন সংশোধন করে ১৯৪৭ সালে শিল্প বিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। ওই বছর ভারত উপমাহাদেশ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ ভারতে প্রণীত শ্রম আইন প্রণয়ন করে । দেশভাগের পর ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে প্রথম শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ওই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ১৯৪৮ সালে প্রণীত আইএলও সমঝোতা ৮৭ এর অধীনে ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড প্রটেকশন অব দ্য রাইট টু অরগানাইজ কনভেনশন পাকিস্তান সরকার অনুসমর্থন করবে। পরে ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সরকার এটি অনুসমর্থন করে। এর কিছুদিন পর পাকিস্তান সরকার ১৯৪৯ সালে প্রণীত আইএলও সমঝোতা ৮৯ এর অধীনে রাইট টু অরগানাইজ অ্যান্ড কালেকটিভ বারগেইনিং কনভেনশন অনুসমর্থন করে। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সরকার প্রথম শ্রমনীতি ঘোষণা করে। এর পরের বছর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান তার প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করে। এর তিন বছর পর সংশোধিত শ্রমনীতি ঘোষণা করা হয়। তখন স্বীকার করা হয় , প্রথম শ্রমনীতি বাস্তবায়নে সরকার ব্যর্থ হওয়ায় নতুন শ্রমনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সংশোধিত শ্রমনীতি ঘোষণা করার পর শ্রমিক সংঘ (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ১৯৬০ ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক সংঘ আইন প্রণয়ন করে। বাতিল করা হয় ১৯২৬ সালের শ্রমিক সংঘ আইন। পাকিস্তান সরকার ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় শ্রমিক সম্মেলনের আয়োজন করে।

এ সম্মেলনে নতুন শ্রমনীতি ঘোষণা করা হয়। সম্মেলনে স্বীকার করা হয়, সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতির অভাবে আগের শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করা যায় নি। সম্মেলনে আরও বলা হয়, এখন থেকে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে। নতুন শ্রমনীতির ওপর ভিত্তি করে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯ পাস হয়।

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। জন্ম হয় স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর সরকার আইএলও কনভেনশন ৮৭, ৯৮ ও ১৪৪সহ ৩৩টি কনভেনশন অনুমোদন করে। একই বছর বাংলাদেশ সরকার প্রথম শ্রমনীতি ঘোষণা করে।

তবে এই শ্রমনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান প্রণয়ন করে। এই সংবিধানে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলার অধিকারের কথা বলা হয়। একইবছর সরকার শ্রমনীতি ঘোষণা করে। তবে রাষ্ট্রপতির আদেশে জাতীয়করণকৃত শিল্পগুলোতে ছয় মাসের জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট করা এবং শ্রমিকসংঘ গড়ে তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৯৭৪ সালে এক আইনের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯ এ দেওয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট করা ও লকআউট করার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়।

দুটি সামরিক শাসনামলে শ্রমিক সংগঠন গঠনের বিষয়ে নানা বাধা বিঘ্ন আসে। ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসক শিল্প সম্পর্ক (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ অনুযায়ী শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলার ওপর এবং শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলার জন্য নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অধ্যাদেশে বলা হয়, যে কোন শ্রমিকসংঘে একটি পরামর্শমূলক কমিটি থাকবে। এতে মালিকপক্ষের ও শ্রমিকপক্ষের সমানসংখ্যক সদস্য থাকবে এবং তারা নির্বাচিত হবে কোন নিবন্ধকের মাধ্যমে।

এরপর বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ সালে শিল্প সম্পর্ক (সংশোধিত) অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯২৬ সালে শ্রমিক সংঘ আইন প্রণীত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো অনিবন্ধিত শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বাতিল করা হয়। এই অধ্যাদেশে প্রথমবারের মতো শর্তসাপেক্ষে শ্রমিক সংগঠন গড়ার কথা বলা হয়। এতে বলা হয়, একটি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংগঠন গড়তে হলে ৩৩ শতাংশ শ্রমিকের অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় শ্রমনীতি ঘোষণা করে। এতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ছাড়াও প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত বা বাইরের কেউ এসে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবে।
নতুন শ্রমনীতিতে এরকম একটি বিধান রাখার ফলে, শ্রমিক সংঘের নেতৃত্ব নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। পরে ১৯৯০ সালে সংশোধিত অধ্যাদেশে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত হওয়া শ্রমিকদের শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য বা নেতা হওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়।

এদিকে দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন (বেপজা) ১৯৮০ ঘোষণা করা হয়। এ আইনে বলা হয় ১৯৬৯ সালে প্রণীত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ইপিজেডে প্রযোজ্য হবেনা। এর ফলে যা হয়েছে, ইপিজেড এর শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার সুবিধা পাওয়া থেকে একেবারে বঞ্চিত হলো। এ পরিস্থিতির অবসানের জন্য ২০০৪ সালে ইপিজেড শ্রমিক সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন পাস হয়।

দুই বছর পর ২০০৬ সালের ১১ অক্টোবর তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন প্রণয়ন করে। এই দুটি আইনে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শ্রমিকদের শ্রমিক সংগঠন করার অনুমতি দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এর কিছু সংশোধন করা হয়। উভয়পক্ষেই শ্রমিক ইউনিয়ন করার অধিকারকে সংকুচিত করা হয়েছে। এতে এমন সব বিধান রাখা হয়েছে যা আইএলও সমঝোতার পরিপন্থি এবং একইসঙ্গে নির্যাতনমূলকও। ২০০৬ সালের আইনে বলা হয়েছে, কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ইউনিয়ন করতে হলে প্রথমে মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের নামের তালিকা দিতে হবে। এই ধারাটি মালিকপক্ষরে জন্য একটি মোক্ষম হাতিয়ার। তালিকা মালিকের হাতে থাকলে নানা কৌশলে ও অজুহাতে সেসব শ্রমিককে ছাটাই করা যায়।

এরকম পরিস্থিতিতে চাকরি হারানোর ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকদের পক্ষে সংগঠন করাটা কঠিন বিষয়। ১৯৪৮ সালে প্রণীত ফ্রিডম অব অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড প্রটেকশন অব দ্য রাইট টু অর্গানাইজ কনভেনশন (আইএলও সমঝোতা ৮৭) এবং ১৯৪৯ সালে প্রণীত রাইট টু অর্গানাইজ অ্যান্ড কালেকটিভ বারগেইনিং কনভেনশন (আইএলও সমঝোতা ৯৮) হচ্ছে শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার অধিকার দিয়ে দুটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক সমঝোতা। আইএলও সমঝোতায় সংস্থার সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ১৫০টি রাষ্ট্র অনুসমর্থন করেছে এবং আইএলও সমঝোতা ৯৮ অনুসমর্থন করেছে ১৬০টি সদস্যরাষ্ট্র।

আইএলও কনভেনশন ৮৭ তে শ্রমিক সংগঠন গড়ার স্বাধীনতার বিষয়ে মূলনীতিগুলো অনুমোদন করেছে। মূলনীতিতে শ্রমিকদের উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে বেশ কিছু শর্ত রাখা হয়েছে যা মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ উভয়ের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক । এখানে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষকে এক কাতারে রাখা হয়েছে এবং উভয়পকে সংগঠন করার এবং সংগঠনে যোগ দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এই কনভেনশনের ২ নং অনুচ্ছেদে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে শ্রমিক এবং মালিক উভয়পক্ষেরই সংগঠন গড়ার অধিকার থাকবে।এখানে কোনো ধরণের বৈষম্য করা যাবেনা। অর্থাৎ পেশা, ধর্মীয় মতবাদ, বর্ণ, গোষ্ঠি, জাতীয়তা ও রাজনৈতিক মতবাদ ইত্যাদি কারণে কোনো ধরণের বৈষম্য করা যাবেনা। মালিক ও শ্রমিকপক্ষ নিজেদের মতো করে সংগঠন গড়ে তুলতে পারবে। তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো নেতা নির্বাচন করতে পারবে। সংগঠনটি কিভাবে পরিচালিত হবে তাও তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো ঠিক করে নেবেন। সমঝোতায় স্বাক্ষরকারী প্রতিটি রাষ্ট্র মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে সংগঠন করার অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি সহায়তা দেবে।

কনভেনশন ৮৭ তে দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট করার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। তবে এতে বলা হয়েছে, একেবারে না পারলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে পারবে। অর্থাৎ সমঝোতায় শ্রমিকদের ধর্মঘট করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। এছাড়া কয়েক ধরণের প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ওপর ধর্মঘট করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে এতে এও বলা হয়েছে, শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট করলে কর্তৃপক্ষ তাদের গ্রেপ্তার বা কারাবন্দি করতে পারবেনা। এ ধরণের কোনো পদক্ষেপ শ্রমিক সংগঠন গড়ার স্বাধীনতাকে মারাত্মক ঝুঁকি ও হুমকির মুখে ফেলে দেয়। সমঝোতা ৮৭তে অনেক বিষয়ের বিশেষ করে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

তবে আইএলও সমঝোতা ৯৮ তে এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সমঝোতায় ইউনিয়নবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যদিও এই সমঝোতায় ইউনিয়নবিরোধী কর্মকাণ্ডের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে সমঝোতার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, শ্রমিক ইউনিয়ন করা থেকে শ্রমিকদের বিরত রাখার জন্য নিয়োগদাতাদের বৈষম্যমূলক আচরণ। সমঝোতার ১ (২) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে কোন শ্রমিককে বরখাস্ত বা কোন ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। সমঝোতার ২ (১) অনুচ্ছেদে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের সংগঠনের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে যাতে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হয়।

সমঝোতার ২ (২) অনুচ্ছেদে মালিকপক্ষের কোন কোন আচরণ শ্রমিক ইউনিয়নের বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ বলে গণ্য হবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একই অনুচ্ছেদে শ্রমিক সংগঠনকে ভয়মুক্ত এবং মালিকপক্ষের জন্য অনুকূলে থাকার কথা বলা হয়েছে। ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে ১ ও ২ নম্বর অনুচ্ছেদের শর্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে।

অ-মানবিক বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির রাক্ষুসে থাবায় বিশ্বব্যাপী শ্রমিকেরা আজ শোষিত বঞ্চিত ও নব্য

অভাবে শ্রমিকেরা জীবন ধারনের জন্য অমানবিক আপষের আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। মহান মে দিবসে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধনবাদি সমাজের বিরুদ্ধে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সচেতন,সংঘঠিত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা অপরিহার্য। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে সারা বিশ্বের ৮০% সম্পদের মালিক হচ্ছে মাত্র ৬৬ জন ধনাঢ্য ব্যক্তি,যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ধনি দেশগুলোর সাথে গরিব দেশগুলোর বৈষম্য বাড়ছে, দেশের মধ্যে ধনিক শ্রেণীর সাথে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্য অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা অনিবার্যভাবে বিশ্বব্যপী সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট করবে। যার লক্ষণ নানাভাবে ইতোমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বকে মানবিক মূল্যবোধের উপর দাড় করানোর জন্য শ্রমিক শ্রেণীকেই মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এবারের মে দিবসে এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা ।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

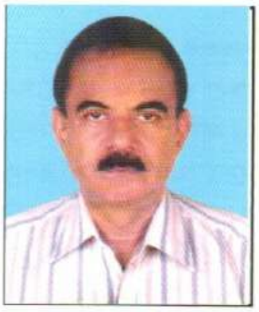

মে দিবসের চেতনা ও শিল্পোন্নয়ন

মোঃ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী
সভাপতি
জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক লীগ,বি-১৯০২,সিবিএ
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি
ও সহ-সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক মে-দিবস অর্থাৎ ১ মে তারিখ শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে মকরম্যাক রীপার ওয়ার্কস নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটি শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল মহান মে দিবসের ইতিহাস। সৃষ্টি হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের দাবী আদায়ের ইতিহাস। বিরামহীন শ্রমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল কর্মকাল বা কাজের সময়সীমা। মালিক পক্ষ উপলব্ধি করেছিল দাবীর বাস্তবতা এবং এতদসম্পর্কে নিয়মনীতি বা আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা। পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গঠিত হয় এবং কাজের সময়সীমা সম্পর্কে কনভেনশন গৃহীত হয়। এ কনভেনশন পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই অনুসমর্থন লাভ করে এবং কনভেনশনের বিধান মোতাবেক স্ব-স্ব দেশে কাজের সময়সীমা সম্পর্কে আইন প্রণীত হয়।

শ্রমিকদের এ বিক্ষোভ বা আন্দোলনের ফলে শ্রমিক সংগঠন স্বীকৃতি পায়, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, দাবী আদায়ের অবকাঠামো গড়ে উঠে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। মজুরি নির্ধারণের জন্য মজুরি বোর্ড ও মজুরি কমিশন গঠিত হয়, চাকরির শর্তাবলীর বিধান নির্দিষ্ট হয়, প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার স্বীকৃতি পায় এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব শ্রমিক আন্দোলনেরই প্রতিফলন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। সুতরাং পূর্বের মত শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিক্ষোভ বা আন্দোলনের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে। কারণ অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মালিক বা শ্রমিক আলাদা কোন দল বা গোষ্ঠী নয়, এ হচ্ছে সমন্বিত গোষ্ঠি। এ পরিবেশে সমন্বিত গোষ্ঠির উপর অধিকতর দায়িত্ব এসে পড়েছে। কেবল দেশের জন্য নয়, তাদের নিজেদের স্বার্থেও উৎপাদিত পন্যের পরিমাণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, অন্য সব দেশের পণ্যের গুণগতমানের তুলনায় কোনক্রমেই যাতে কম না হয় সে সম্পর্কে প্রতিযোগিতা করা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা আবশ্যক। কারণ এ প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে উৎপাদিত পণ্য কেবল গুদামজাত হয়ে থাকবে, বানিজ্যের দিকে ধাবিত হবে না। এ বিষয়গুলো শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে উপলব্দি করতে হবে। মালিকগণকে বিশ্বায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত পদপে গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ। এছাড়া প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্ব শ্রম বাজারে আসছে। বর্তমানে বেকার শ্রমিক এর সংখ্যা নগণ্য। বার্ষিক জিডিপির হার ৬.৬%। মাথাপিছু আয় ১৩০০ ডলারের বেশী। ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য সময়ের চেয়ে অনেক ভাল। জনসংখ্যার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এসব সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং টেকসই কর্মসূচি গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পদপে হাতে নিয়েছে। শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ পূর্বের তুলনায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। আশা করা যায়, ২০২১ সালের দিকে বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নততর হয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

দেশের প্রচলিত শ্রম আইনগুলো বাতিল করে ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে একটি সমন্বিত আইন জারি হয়েছে। যাতে বর্তমান শ্রমিক বান্ধব সরকারের আমলে যুগোপযোগি করে ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়েছে। এ আইনটি শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। ইপিজেড শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সৃষ্টিসহ কতগুলো নতুন বিষয় এ আইনে স্থান পেয়েছে। যেমনঃ চাকরি হতে অবসর গ্রহণ, ভবিষ্যৎ তহবিলের ব্যবস্থা, কর্মকালীন সময়ে দূর্ঘটনার কারণে সাধারণ মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, প্রতিষ্ঠান পুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার ও দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করা। এ ছাড়া বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) জারি হওয়ার ফলে

শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে কল্যাণ সাধনের জন্য বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকার শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অনেক সচেতন এবং এই সচেতনতার বিকাশ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। এর ফলে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা নিশ্চিত হবে। সুতরাং তাদের এ বিশ্বাসকে অর্থবহ করার জন্য সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এ অবদানকে ধরে রাখতে হলে শ্রমিকদের পূর্বের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করতে হবে, দাবি আদায়ের পদ্ধতি আইনসম্মত হতে হবে এবং রাজনৈতিক প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে অধিক দায়িত্বশীল ও সচেতন হতে হবে। সকল সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে নিরসনের জন্য মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য বাস্তবমূখী সর্বজন গৃহীত জাতীয় বেতন স্কেল' ২০১৫ সহ শ্রমিকদের কল্যাণে যে সব যুগান্তকারী পদপে গ্রহণ করেছেন ঃ -

১। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বিপুল পরিমাণে জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
২। সরকারীভাবে স্বল্প খরচে শ্রমিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ;
৩। জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠন;
৪। বেসরকারী ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থায় শ্রমিকদের দ্বিগুনেরও বেশী ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ;
৫। কর্মরত অবস্থায় মৃত শ্রমিক/কর্মচারীদের গোষ্ঠী বীমার টাকা ১,০০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০ টাকায় নির্ধারণ;
৬। সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশনের হার প্রতি টাকায় ২০০ টাকা থেকে ২৩০ টাকায় বৃদ্ধি;
৭। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন মূল বেতনের ৮০% থেকে ৯০% এ উন্নিত করা;
৮। সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্ত্বশাসিতসহ সকল সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর মেয়াদ ২ (দুই) বছর বৃদ্ধি;
৯। সময় উপযোগী মহার্ঘভাতা প্রদান;
১০। সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্ত্বশাসিতসহ সকল সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পে-কমিশন গঠন।
১১। ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্বের হার কমিয়ে আনা।
১২। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদ্যুৎ ভাতার প্রবর্তন।
১৩। শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মের পাশাপাশি খেলাধুলার পরিবেশ সৃষ্টি।

উল্লেখ্য ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭৫ পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি শুধুমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মতা গ্রহণের সময়কালীন তার যোগ্য নেতৃত্বের কারনে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স বৃদ্ধি শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্রের হার ২৫% এ নামিয়ে আনা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩২০০ মেঃওঃ হইতে ১৩০০০ মেগাওয়াটে উত্তীর্নসহ সর্বত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ যখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হতে চলেছে, ঠিক সেইসময় তা বিনষ্ট করার জন্য ১৯৭১ সালের পরাজিত শত্রুরা অর্থাৎ বিএনপি-জামাতসহ ২০ দলীয় জোট হরতাল-অবরোধের নামে জ্বালাও পোড়াও, পেট্রোল বোমা মেরে ধ্বংসাত্নক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষ হত্যার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ করাসহ মেধা বিনষ্টের জন্য শিাবিদদের হত্যা, শিার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাদের সেই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সফল এবং ভবিষ্যতে কোন অপশক্তি যাতে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড চালাতে না পারে সে ব্যাপারেও সরকার যথেষ্ট আন্তরিক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে যখন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেই মূহুর্তে বিউবোর্ডকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিএনপি-জামাত জোটের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এক শ্রেনীর উচ্চাভিলাসী কর্মকর্তা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে কোম্পানীতে রূপান্তর করার পাঁয়তারা করছে। এহেন কর্মকান্ডের কারনে বিদ্যুৎ বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করছে।

মে-দিবসের আদর্শ ও চেতনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, শিল্পকে দৃঢ় অবস্থানে টিকিয়ে রাখার জন্য শ্রমিকের সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন মালিকের দায়িত্ব তেমনিভাবে মে-দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিক দায়িত্বশীলতার সাথে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে শ্রম প্রদান করা প্রত্যেক শ্রমিকের কর্তব্য। মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক অটুট রেখে শিল্পের বিকাশ ঘটানোই হোক মে দিবসের অঙ্গীকার।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মহান মে দিবসের তাৎপর্য

মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক লীগ(সিবিএ)
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন
মহা-সচিব (কল্যাণ ও পুনর্বাসন)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

মহান মে দিবস, শ্রমিক সংহতি দিবস। এ দিনটি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার ও শ্রমের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রাপ্তির দিন। দিনটি সারা বিশ্বের অগণিত শ্রমজীবী মানুষের "শোষণ ও বঞ্চনার" বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং তাদের বিজয়ের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। মহান মে দিবস ১৮৮৬ সনে আমেরিকার শিকাগো শহরে ন্যায় সঙ্গত অধিকার ও শ্রমের মর্যাদার দাবীতে শ্রমিকদের আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও আইনগতভাবে শ্রমিকের মর্যাদা স্বীকৃতি পায় এবং দীর্ঘ দু'শ বছরের ধারাবাহিক শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহান মে দিবসের তাৎপর্যমন্ডিত ইতিহাস রচিত হয় ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষার পথ সুগম হয়। তাদের অবদান ও মহৎ মানসিকতাকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

ট্রেড ইউনিয়ন হলো আধুনিক শিল্পায়নের অপরিহার্য অঙ্গ। সাধারণভাবে ট্রেড ইউনিয়ন বলতে শ্রমিকদের সংগঠনকে বুঝায়। কিন্তু মালিক পক্ষও ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশন করতে পারে। তবে শ্রমিকদের কেন্দ্র করেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠেছে। মূলতঃ অতীতের অসংখ্য আন্দোলন সংগ্রামের ফলেই ট্রেড ইউনিয়ন বিকাশ লাভ করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন সারা বিশ্বব্যাপী অতি পরিচিত ও সর্বজনগ্রাহ্য হলেও এর সংজ্ঞায় তারতম্য রয়েছে। কেননা ট্রেড ইউনিয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অসংখ্য বিষয় জড়িত।

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ভি পি গিরি ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে বলেন- ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে শ্রমিকদের স্ব- ইচ্ছায় গড়ে তোলা সংগঠন, যার মাধ্যমে যৌথ প্রচেষ্টায় তারা তাদের উন্নয়ন সাধন করতে পারে। দৃষ্টি ভঙ্গির বিভিন্নতা যাই থাকুক না কেন, এটা সহজেই বলা যায় ট্রেড ইউনিয়ন হলো বাহিরের প্রভাব থেকে মুক্ত বেতনভোগী শ্রমিকদের এক স্থায়ী ও গণতান্ত্রিক সংগঠন, যার সদস্যরা সেচ্ছায় এর সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যৌথ ও কার্যকরী প্রচেষ্টা নিয়ে থাকে।

জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার তিনটি পক্ষ হচ্ছেঃ শ্রমিক-মালিক-সরকার। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে মালিকের সহিত শ্রমিকের একটি নিবিড় সম্পর্ক দরকার। সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হলে উভয় পক্ষের এ মানসিকতা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ ও সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনায় বর্তমান সরকারের নীতির গুরত্ব অপরিসীম। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস বর্তমান সরকারের দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। একথা অনস্বীকার্য যে, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিক-মালিক সহযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ ছাড়া গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা আশা করা যায় না। মে দিবসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাইকে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার আলোকে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজের মাধ্যমে খোঁজ পেতে হবে দিন বদলের মন্ত্র। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে একটি আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে সামিল হতে হবে আমাদের সকলকে।

শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস নতুন নয়। সব যুগে সব সমাজে এটি ছিল। শ্রমিকদের ঘামে মালিকদের প্রাসাদ অট্টালিকা তৈরী হলেও অনেক শ্রমিককে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়। দিন-রাত শ্রম দিয়েও জীবনের ন্যূনতম চাহিদা তারা পূরণ করতে পারেন না। অনেক সময় শ্রমিক তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য পথে নামতে বাধ্য হয়। আজ সময় এসেছে, শ্রমিকদের সকল আইনানুগ দাবী পূরণে মালিকগণকে সর্বোচ্চ আন্তরিক হতে হবে। তবেই শ্রমিকদের রক্তঝরা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মহান মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়ন হবে।

চেতনা ও আদর্শের মৃত্যু নেই বলেই তো ষড়যন্ত্রকারী-ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেও তার আদর্শ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করতে পারেনি। আজ তাই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলার তরুণ প্রজন্ম উজ্জীবিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা তার নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী জাতিকে পাপমুক্ত করার জন্য যুদ্ধাপরাধী, মানবতা ও স্বাধীনতা বিরোধীদের আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল গঠন করে যে বিচার শুরু করেছেন তার প্রতি সারা দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এই বিচারকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা বিরোধী এবং তাদের দোসরদের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যমূলক যে কোন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বাংলার শ্রমজীবী মানুষ নিশ্চুপ বসে থাকতে পারে না। ৭১ এর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দোসর রাজাকার-আলবদর, যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য শ্রমজীবী মানুষকে অবশ্যই পক্ষ নিতে হবে এবং সে পক্ষ হতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষ। চেতনাকে জাগ্রত করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করাই এ মুহূর্তে বাঙালি জাতির প্রত্যাশা। শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ কাজটি করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমৃদ্ধশালী 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস নিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করার জন্য সড়ক পরিবহন, গার্মেন্টস শ্রমিক ও মালিক, বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী নারী-পুরুষ এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে দৃঢ় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায়সংগত দাবী আদায়ের জন্য কাজ করে থাকেন। ইদানিং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নেতাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন এবং তাদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে একশ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি, অবৈধ অর্থ বিত্তের মালিক হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মিথ্যা অপপ্রচারসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে তৎপর। তাদের বিভিন্ন ধরণের অপপ্রচার এবং কর্মকান্ডে মনে হয় ট্রেড ইউনিয়ন করাই যেন একটি অপরাধ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত ও অধিকারহারা শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের মঙ্গলের জন্য রাজনীতি করেছেন। বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন তার দুই কন্যা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাঙ্গালী জাতির অভিভাবক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন আমার সরকার শ্রমিক বান্ধব সরকার এবং তিনি সর্বদা কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ যাতে ভালভাবে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারে, তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে সঠিকভাবে লেখাপড়া করতে পারে সে জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতি কৃষক শ্রমিক তথা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষকে নিয়ে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াস একান্তভাবে আবশ্যক। শিল্প পরিচালনায় মালিক ও শ্রমিকদের সু-সম্পর্ক স্থাপন ব্যতিত শিল্পের বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শ্রমজীবীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে আমরা দ্রুত এগিয়ে নিতে চাই। এজন্য প্রয়োজন মালিক-শ্রমিক ঐক্য এবং তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা।

শ্রমিক ও মালিকের যৌথ উদ্যোগই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ কর্মস্থল, যথাযথ প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং মালিক শ্রমিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করে মানসম্মত পণ্য ও সেবার মান বৃদ্ধিকরণে আমাদের তৎপর হতে হবে।

মেহনতি মানুষের আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর মহান মে দিবসের চেতনা দেশ ও জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রয়াসকে আরো বেগবান করবে আজকের দিনে শ্রমজীবী মানুষের এটাই প্রত্যাশা।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

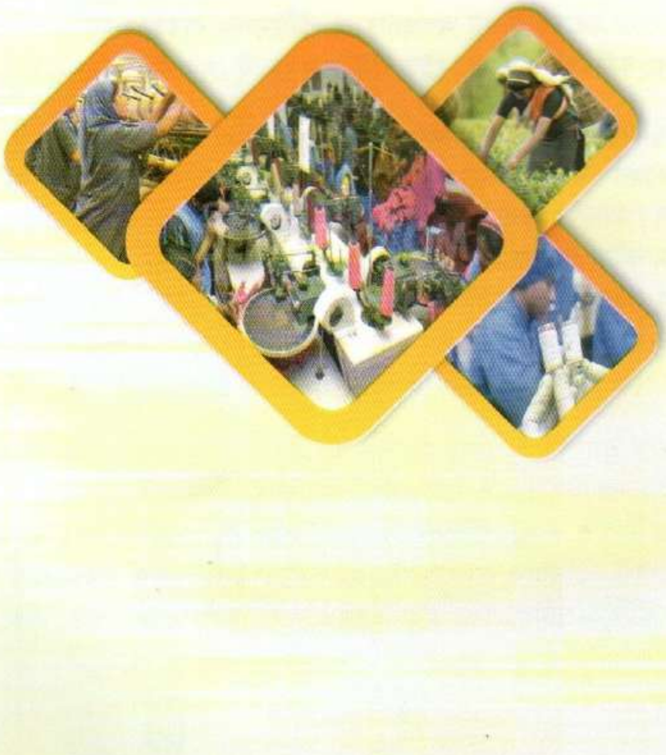

"মহান মে" দিবসের তৎপর্য

এ্যাডভোকেট মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান
সাবেক সংসদ সদস্য
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন- বিএলএফ

মহান মে দিবস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। ১৮৯০ সাল থেকে প্রতিবছর পহেলা মে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" -- এই দিনের আন্তর্জাতিক শ্লোগান। ১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীতে শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘন্টা কর্মসময় নির্ধারণ এবং ন্যায্যমজুরির দাবিতে শুরু করেন সর্বাত্মক ধর্মঘট। শ্রমিকদের এ-আন্দোলন ৩ ও ৪ মে চূড়ান্ত রুপ লাভ করে, এই দুইদিন শিকাগো নগরীতে ১০ শ্রমিক পুলিশের গুলিতে আহত হয় বহু শ্রমিক। বহু শ্রমিককে পাঠানো হয় জেলে। গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের ৬ জনকে পরে ফাঁসি দেয়া হয়। একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় কারাগারে। শ্রমিক শ্রেণীর গৌরবময় সংগ্রামেই স্বারক এই মে দিবস। একই সঙ্গে তা শ্রমিকদের সংগ্রামের বিজয়োৎসব ও নতুন শপথ গ্রহণের দিন। সকল দেশে এ দিবস পালিত হচ্ছে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে। ইউরোপ-আমেরিকায় সেকালে শ্রমিকদের প্রথমে উদয়াস্ত ক্রমে শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপে কর্মসময় হ্রাস করে খাটানো হতো ১০-১২ ঘন্টা। তবে, তখনও কোথাও কোথাও শ্রমিকদের ১৫ থেকে ২০ ঘন্টা পর্যন্তও কাজ করতে হতো। ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের দাবি শ্রমিকদের অনেক দিনের। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণির ৮ ঘন্টার কাজের দাবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এই দাবি আইএলও সনদের অনুমোদন পেয়েছে।

আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীর উন্নত দেশগুলোর শ্রমিকদের মতো কাজের পরিবেশও পায় না, তেমন উন্নত সুযোগ-সুবিধাও তারা পায় না। আমাদের শ্রমিকের সামগ্রিক অবস্থা ভাল নয়। ভাল নয় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। অন্যদিকে, বহু শ্রমিক বেকারত্বের শিকার, অনেক শ্রমিকের মজুরি সামান্য। অনেকেই অস্বাস্থ্যকর ও অনুন্নত পরিবেশে কাজ করতে হয়। আইএলওর বিধান অনেক স্থানেই পালন করা হয় না। বিশেষ করে নারী ও শিশু শ্রমিকদের প্রসঙ্গে এ কথা বলা যায়। আমাদের দেশে এখনও অগণিত শিশু নানা ধরনের কষ্টকর শ্রমের কাজে নিয়োজিত। দু'মুঠো অন্নের জন্য ওদের প্রতিয়িত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত আইএল সনদ আজ পর্যন্ত বহু দেশে পূর্ণরূপে কার্যকর হয়নি। আমাদের দেশে শ্রমিকগণ সুপ্রতিষ্ঠিত নয় অস্থায়ী শ্রমিক এবং দিনমজুর পর্যায়ে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তো বটেই পোশাকশিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অনেক পোশাক শিল্পকারখানায় আট ঘন্টার অধিক সময় কাজ করানোর এবং ওভারটাইম না-দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অথচ এই পোশাক শিল্প আমাদের প্রধান একটি রপ্তানিমুখী শিল্প, এই শিল্পই আমাদের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। এই শিল্পকে সচল রাখেন যাঁরা তাঁদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশ্বস্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকরা প্রত্যেকে ন্যায্য মজুরি পেলে, তাঁদের জীবনমান উন্নত হলে একদিকে যেমন কমে আসবে শ্রমিক অসন্তোষ, অন্যদিকে, তেমনি শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যার জন্য সামগ্রিকভাবে বাড়তে পারে শিল্পোৎপাদন। তবে সে-আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত থাকা দরকার। এক্ষেত্রে অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও ক্রমান্বয়ে অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে। গড়ে তুলতে হবে সুস্থ ও সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন- মহান মে দিবসে মেহনতি মানুষকে এই অঙ্গীকারই নিতে হবে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা সবাই শ্রমিক, শ্রমের কর্ম কৌশলের আদলে শ্রমের প্রকার ভেদ থাকতে পারে। তবে পার্থিব জগতে নানাবিধ ভাবে আমরা অবশ্যই শ্রমিক। তাই এই মহান মে দিবসে আমাদেরে সবারই উচিত একে অন্যের শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা। তাহলেই আমরা নিজ, নিজ অবস্থান থেকে এই ঐতিহাসিক মে দিবসের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবো।

এখানে বিশেভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক আমাদের মহান নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) শ্রমের মর্যাদা দিয়েছেন নিজ জীবনে এবং শ্রমের প্রতি মর্যাদাবান হওয়ার তাগিদ দিয়ে গেছেন বিশ্ব উম্মার জন্য- তাঁর সাহাবাগণদের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ বর্তমানে ৩৬টি জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন আছে- যাহা খুবই দুঃখজনক। মালিকদের যদি একটি মাত্র জাতীয় সংগঠন থাকতে পারে তবে আমরাও অন্যান্য দেশের ন্যায় দলমত নির্বিশেষে একটি মাত্র "কনফেডারেশন" গঠন করিলে শ্রমিকদের ন্যায় সংগত দাবী গুলো অতি সহজে আদায় করতে সক্ষম হব। কলকারখানায় শান্তি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা খুবই অপরিহার্য্য।

৩০ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতির মাধ্যমে অর্জিত এই স্বাধীন দেশটি সমৃদ্ধ করার লক্ষে সকল শ্রমিক ও মালিক ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসুক- ইহাই হোক আজকের মহান মে দিবসে আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা এবং এবারের মহান মে দিবসের আমাদের শ্লোগান হউক "শ্রমিক-মালিক ঐক্য চাই উন্নয়নের বিকল্প নাই"।

আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী আমাদের প্রতিটি শিল্পে একটি করে ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ইহাই হোক মে দিবসের বর্তমান দাবী।

শ্রম আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য শ্রম পরিদপ্তর ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে আরও অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে শক্তিশালী করতে হবে এটা বর্তমান সময়ের দাবী।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

শ্রমিক দিবস ও বঙ্গবন্ধু

জেড এম কামরুল আনাম
সভাপতি
বাংলাদেশ বস্ত্র ও পোশাকশিল্প শ্রমিক লীগ
ও সম্পাদক, শ্রমিকের ডাক।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্ম কৌশলে লোভ-মোহহীন নিরন্তর চেষ্টা ছিলো, আর সেই চেষ্টার হাত ধরে শ্রমিকের জন্য নিবেদিত থেকে কাজ করেছেন তিনি। তার সেই কাজের কারনে আজো জনতার মাঝে বেঁচে আছেন-শ্রমিকের মাঝে বেঁচে আছেন নতুন সম্ভাবনার রাষ্ট্রনায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা-সম্মান, এই সম্মানের কারন হলো তার লোভহীন, মোহহীন নিরন্তর প্রত্যয়ী পথ চলা। একদিকে কৃষক, অন্যদিকে শ্রমিক তারও আগে গড়ে তুলেছিলেন তিনি ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধতা। তিনি কেবল এগিয়ে চলেছেন, এগিয়ে চলেছেন নির্ভীকতার সাথে।

আমরা জানি যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারুণ্যের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতেই শ্রমিক আন্দোলনে নিবেদন করেন প্রচুর সময়। আর একারনেই যখন সারা দুনিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার আদায় ও মুক্তির লড়াইয়ের প্রতীক ছিল আন্দোলন, বাংলাদেশেও ছিলো তাই। আর তার-ই সূত্র ধরে অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হয়েছে অসংখ্য আন্দোলন। যদিও এখন শ্রমিক নেতারা আগের মত লড়াই সংগ্রামে নামে না, কেননা, শ্রমিকের অধিকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যেভাবে নিশ্চিত করার জন্য নিবেদিত ছিলেন; ঠিক একইভাবে তার যোগ্য উত্তরসূরী জননেত্রী শেখ হাসিনাও নিবেদিত রয়েছেন। যে কারনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধায়নে শ্রমিকের অধিকার রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে বাংলাদেশে।

অবশ্য অনেকেই বলেন যে, 'বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনগুলো এ দিনে এখন আর আগের মতো র‍্যালি করে না- জনসভা করে না বা শ্রমিক শ্রেণীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বা অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে না। বরং মে দিবস অনেকটাই পত্রিকার পাতার প্রতিবেদন-মন্তব্য এবং টিভির টকশোতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবে এখনও পুঁজিবাদবিরোধী দুনিয়ায় দিনটি শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। এ দিনটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা লেবার দিবস হিসেবেও দুনিয়ার কোথাও কোথাও পালিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের আগে এ দিনটি সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর অনুপ্রেরণার দিবস হিসেবে পালিত হতো। কিন্তু রাশিয়ার পতনের পর পুঁজিবাদী দুনিয়ার দাপটে মে দিবস অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসনে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমান্বয়ে কোণঠাসা হওয়ার অবস্থা হওয়ায় মে দিবসের সেই জৌলুস এখন আর নেই।' কিন্তু আমি বলতে চাই, বাংলাদেশে শ্রমিকের অধিকার রক্ষার জন্য নিবেদিত থেকে যেখানে সরকার কাজ করছে, মন্ত্রী কাজ করছেন, সেখানে নতুন করে আর কেন শুধু শুধু অধিকার অধিকার বলে শ্লোগান নয় বরং তারা তাদের কাজটি আন্তরিকতার সাথে করলেই দেশ উপকৃত হবে-অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। মে দিবসে শ্রমিকের ছুটি-ই শুধু নয়; শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে থাকে বিভিন্ন অঙ্গীকারও। আর এই অঙ্গীকারের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলে দিতে চাই, 'পাকিস্তান আমলে এ দিনটি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে পালিত হতো একারনে যে, শ্রমিক শ্রেণী বঞ্চিত-নিপীড়িত ছিলো। আর তাই তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য দিনটি পালনে আমাদের শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত সক্রিয় ছিল।

স্বাধীনতার পর পঁচাত্তর পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকারের সময়ে বাংলাদেশে সরকারিভাবে দিনটির অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল। তিনি শ্রমিকের রাজত্ব কায়েম করার জন্য তার দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে সরকারি শ্রমিক সংগঠন তো বটেই অন্যান্য শ্রমিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল মে দিবসকে গুরুত্ব দিত। সরকারী উদ্যোগে পালিত হতো দিনটি। বঙ্গবন্ধু মে দিবসে ছুটি ঘোষনা করেন। শ্রমিকরাও দিনটিকে তাদের নিজেদের দিন হিসেবে পালন করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পঁচাত্তরে আমাদের জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে খুন করার পর বাংলাদেশের জন্মের আদর্শকে বদলে দিয়ে পুঁজিবাদের দিকে যাত্রা শুরু করার পর পুরো রাষ্ট্র যন্ত্র

ষড়যন্ত্রকারীদেরই তোষণ শুরু করে। রাষ্ট্র যন্ত্রের সর্বত্র তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সম হয়। শুধু এখানেই শেষ নয়; ইতিহাস বলে যে, জাতির জনকের হত্যাকান্ডের পর রাজনীতিকরা শ্রমিকদেরকে কালো জগতের বাসিন্দা বানাতে উঠে পরে লেগে যায়। শুধু এখানেই শেষ নয়; অন্যায় আর অপরাধের রাজত্ব তৈরির সবোচ্চ চেষ্টাটি করতে করতে তারা এমন হয়ে যায় যে, সংসদ থেকে রাজনৈতিক দল সর্বত্র ষড়যন্ত্রকারীদের-জামাতীদের জয়গান গাওয়া হতে থাকে। বাংলাদেশের জন্মের আগে বা পরে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর যে প্রভাব ছিল পঁচাত্তরের পর সেগুলো হাওয়ায় উড়ে যায়। যে দেশটি সাধারণ মানুষ, মেহনতি মানুষ, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির অঙ্গীকার নিয়ে জন্ম নিয়েছিল তাতে শ্রমিক শ্রেণী দিনে দিনে আরও শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকল । আহসান উল্লাহ মাস্টার থেকে শুরু করে শ্রমিকের জান-শ্রমিকের প্রাণখ্যাত নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান পর্যন্ত তৈরি সকল শ্রমিক নেতাই চেষ্টা করেছেন নিজেদের অবস্থান থেকে কোন না কোনভাবে বাংলাদেশে শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে। আর এর পেছনে ছিলো সেই মহামানুষ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শিক কর্মকান্ড।

ইতিহাস সবসময় সত্য বলে। আর তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, 'পাকিস্তানের ২৩ বছরে তৎকালীন পূর্ব বাংলার শিল্পায়ন বলতে কিছু ছিল না। যা কিছু জুট টেক্সাইল ফ্যাক্টরি, আইসক্রিম ফ্যাক্টরি বা লোহার পাতের কারখানা ইত্যাদি ছিল সেগুলোর মালিক ছিল পাকিস্তানিরা। ১৬ ডিসেম্বরের পর সেই মালিকরা পালিয়ে যায়। সেগুলোতে বসে প্রশাসক নামক নতুন মালিক। চোখের সামনে দেখছিলাম দেশের শিল্প কল-কারখানাগুলোর সেই নতুন মালিকরা পাগলা কুকুরের মতো সেসব প্রতিষ্ঠানকে কুরে কুরে খাওয়ার চেষ্টা করছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এসব কারখানা সমূহ জাতীয়করণ করেন এবং পরিচালনা করার জন্য প্রশাসক নিয়োগ করেন। যারা কোনদিন কারখানা কি জিনিস তা-ই চোখে দেখেনি তারাই প্রশাসকের নামে মালিক বনে যায়।' এই মালিক শ্রেণী-ই ক্রমশ সমস্যার জাল বুনতে বুনতে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গড়েছে নিজেদের অবস্থান; নিয়ে এসেছে অন্যায়ের রসদ। যে কারনে বারবার আমার শ্রমিক ভাইয়েরা বঞ্চিত হয়েছে অতীতে। এখন সেই সকল সমস্যার কারিগরকে চিহ্নিত করে এগিয়ে চলছে বর্তমান সরকার। কেননা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা জানেন যে, উনসত্তরের আন্দোলনে আদমজী ও টঙ্গীর শ্রমিকদের অবদান ছিল ব্যাপক। সত্তরের নির্বাচনে শ্রমিকদের অবদান ছিল অপরিসীম। এমনকি একাত্তরের মার্চ মাসে দেশজুড়ে যেসব শ্রমিক এলাকা ছিল সেসব স্থানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাংগঠনিক কাজ হয়েছিল ব্যাপক। সেই সময়ে জাতীয় শ্রমিক লীগ অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে বঙ্গবন্ধুকে সহায়তা করেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও বাংলাদেশের শ্রমিকরা জাতীয় অগ্রগতির জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। এমনকি এখনও যদি আমরা দেশের সার্বিক অবস্থার দিকে তাকাই তবে এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা যাবে যে আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে দেশের অতি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য। যদি দেশের গার্মেন্ট শিল্পের শ্রমিকেরা তাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। তবে আমরা যে একটি দিনও সামনে পা বাড়াতে পারব না সেটি কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন পড়বে না। কেউ যদি একটু সহানুভূতির মতো করে চোখটা খোলা রেখে এ খেটে খাওয়া মানুষদের দিকে নজর দেন তাহলে দেখবেন মাইলের পর মাইল হেঁটে তারা কর্মস্থলে আসেন। তাদের থাকার জায়গাটা হয়তো কবরের মতো। তাদের চিকিৎসা নামক কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ওরা যা খায় তা হয় তো মানুষ সাধারণভাবে গলাধঃকরণ করে না। তাদের কাপড়চোপড় দেখার মতো নয়। দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে তারা মালিকদের জন্য ল্যান্ড ক্রুজার, লেক্সাস, বা এসইউবি গাড়ি, বাড়ি ও বিলাসিতার আয়োজন করে দেয়। কিন্তু দিন শেষে তাদের ভাগে বেঁচে থাকার ন্যূনতম আয়োজনটি থাকে না। অন্যদিকে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে ওঠেছে সেই মানুষগুলোর জন্য যারা প্রবাসে প্রতি মুহূর্তে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকেন। এ দেশ থেকে যেসব শিক্ষিত লোক বিদেশে যান তারা দেশের জমিজমা বাড়িঘর বিক্রি করে হুন্ডিতে টাকাটা পাচার করে মাইগ্রেশন নিয়ে চিরতরে বিদায় হন। অন্যদিকে যে মানুষগুলো বিদেশে শ্রমিকের কাজ করেন তারা তাদের শেষ সম্বলটি পর্যন্ত দেশে পাঠায়। এমন নিবেদিত থাকা কর্মঠ শ্রমিক- মেহনতি মানুষদের জন্য নিবেদিত থাকার প্রত্যয় অন্তত আমার ছিলো সবসময়; আর তার পেছনে ছিলো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ; ছিলো তার দেখানো পথ আর ভালোবাসার বাংলাদেশ-শ্রমিক এবং শ্রমজীবী স্বপ্নকাহন, আর তাঁর কন্যা শ্রমিক বান্ধব প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা........

মে দিবসের চেতনার নিরিখে নৌ-যান শ্রমিকদের জীবন ও সংগ্রাম

চৌধুরী আশিকুল আলম
সাধারন সম্পাদক
(বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ)

প্রতি বছর মে দিবস পালিত হয়। কেউ করে আনন্দের অতিশয্যে আবার কেউ নেয় সংগ্রামের নতুন প্রতিজ্ঞা। রাষ্ট্রীয় ভাবে ও মে দিবস পালিত হয় বর্ণিল বর্ণাঢ্য আয়োজনে। অনেক অনুষ্ঠানের মধ্যে স্মরণিকা প্রকাশও হয়। আমাদের শ্রম দপ্তর এব্যাপারে যথেষ্ট করেন। শ্রম পরিদপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা অনেক আগ থেকেই তাগিদ দিচ্ছেন মে দিবসের স্মরণিকায় একটা লেখা দেওয়ার জন্যে তার এই উদ্যোগ ও পরিশ্রমকে স্বার্থক করতেই মূলতঃ লিখতে বসা।

কি লিখবো। কাদের জন্য লিখবো ভাবছিলাম। কারণ পৃথিবীর পরিবর্তন আর বিবর্তন যেটাকেই সামনে আনিনা কেন শ্রেণি বিভক্ত সমাজের উৎপত্তিতেই দাস সমাজে দাস প্রথা বলে একটা প্রথা ছিলো। দাস মালিকরা দাসদের দিয়ে ইচ্ছামত কাজ করাতো। সমাজ বদলের সাথে সাথে দাসদের নামের খালি পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু দাসত্ব থেকে এখনো মুক্তি ঘটেনি। পুরাতন দাস ব্যবস্থার স্থলে এসেছে ভূমি দাসত্ব আর আধুনিক শিল্প ব্যবস্থায় এসেছে মজুরি দাসত্ব। দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গার লড়াইও হয়েছে অনেক। দাস সমাজে হয়েছে দাস বিদ্রোহ। সমাজে ভূমিদাস করেছেন কৃষক বিদ্রোহ আর পুঁজিবাদি সমাজে মজুরি দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে বের হবার জন্য হয়েছে বিদ্রোহ ও বিপ্লব। পৃথিবীর অগ্রসরতার আঁকা বাঁকা গতি পথে শ্রেণী বিরোধ আর শ্রেণী সংগ্রাম চলছেই। যতদিন শ্রেণী আছে ততদিন এটা চলবেই। এই এতো কিছু ঘটনার ভিতর মে দিবসের তাৎপর্য হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইয়ের একটি প্রাথমিক সাফল্য। শ্রেণী হিসাবে সে পেল অধিকার ও সামাজিক স্বীকৃতি।

মে দিবসের প্রেরণা আজও তাই শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী মানুষকে বাঁচার জন্য, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, শ্রমিক শ্রেণির চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য আলোক বর্তিকা হিসাবে আজও জ্বল জ্বল করে। এটা এমন একটা দিবস যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এখন যে যেভাবে এই দিবসকে সামনে নিয়ে আসে সে সেভাবেই এটাকে পালন করে। করুকনা তবুতো দিবসটা উজ্বল থাকুক জেগে থাকুক। আমি তাই এই দিবস পালনের রকম ফের নিয়ে আলোচনায় যাবোনা। কথা দিয়েছিলাম নৌ-যানের উপর একটা লেখা দেব এবারের মে দিবস সংখ্যায় সে লক্ষ্যেই লিখতে শুরু করলাম এবারে যতদূর পারি ততদূরই লিখবো। হয়তো অনেক অপূর্ণতা থাকবে পরবর্তিতে হয়তো কারো মাধ্যমে এটা শেষ হবে এটুকু শান্তনা নিয়ে শুরু করছি।

আমার জন্ম ১৯৫৬ সালে কিন্তু ভারতবর্ষে নৌ-শিল্পের যাত্রা শুরু এবং শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এ দুটিই হলো আমার জন্মেরও আগের। আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে দেখি প্রথমত আরব বনিকরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে আসতো। এরপর পর্তুগীজসহ নানা জাতি নানা জন সর্বশেষ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী পরবর্তিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষ হয়ে গেল বৃটিশের উপনিবেশ। সেই ঔপনিবেশিক আমলে বৃটিশের বাণিজ্য ও শাসনের প্রয়োজনে যে শিল্প সমূহের প্রসার এখানে ঘটেছিলো তার মধ্যে জাহাজ/নৌ-যান শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। শুরুতেই নৌ-যান শিল্পে কন্ট্রাকচ্যুয়াল প্রথা ছিলো আজও আধুনিক নামে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বপ্নীল চাকুরী 'মেরীটাইম জব' (যদিও বর্তমানে অনেক ঝক্কি আর হতাশায় জীবন কাটছে মেরীনাদের) সেটাও অধিকাংশই হয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে।

আমাদের দেশে অভ্যন্তরীন নৌ-যানের শ্রমিকরা অবশ্য মজুরি কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই চলে। সর্বনিম্ন বেতন মাত্রা নির্ধারণ করে একটি মজুরি কাঠামো হয়, কেউ কেউ উচ্চ পদে কাজ করার সুবাদে আর যোগ্যতা দক্ষতার

বিবেচনায় বাড়তি বেতন ভোগ করেন। বর্তমান মূহুর্তে নৌ-যানের শ্রমিকরা ১০ হাজার টাকা নিম্নতম মূল মজুরি নির্ধারণের দাবী নিয়ে আন্দোলন-আলোচনা-আন্দোলন এই পর্যায়ে আছেন।

কন্ট্রাকচ্যুয়াল প্রথা ভাঙ্গার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন নাবিকদের নিয়ে তাদের মধ্যে একজন অন্যতম নেতা ছিলেন প্রতাপ উদ্দিন আহমেদ। জন্ম সূত্রে যিনি ছিলেন বর্তমান হবীগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। তার বাবা ছিলেন জাহাজের সারেং। বাবার অনুপ্রেরণায় তিনি স্কুল জীবন শেষ করে কলেজ জীবনে পড়াশুনা করেন কলিকাতায়। কলকাতাতে পড়ার সময়ে তিনি সমগ্র ভারত জুড়ে বৃটিশ বিরোধ আন্দোলন আর রুশ বিপ্লবের প্রচন্ড ঝাঁকুনীতে নিজেও শ্রমিক বাবার শ্রেণির লোক হিসাবে নিজেকে ভাবতে শুরু করেন এবং নাবিকদের সংগঠন গড়ে তোলার, শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করে তাকে তার শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্ত করার অধিকার পাওয়ার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রথমে কর্মী ও পরে নেতৃত্ব প্রদান করেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি শ্রমিক আর সংগঠন ছাড়া অন্য কিছু ভাবেননি। আজকের নৌ শিল্পের আর নৌ-যান শ্রমিকদের সংকট নিয়ে আলোচনা এমনকি শ্রমিকদের সংগঠন ও সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সবাই একবাক্যেই বলেন। প্রতাপ ভাই এ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের এক অনুস্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

যাক যে কথা বলতে চেয়েছিলাম বৃটিশ-ভারতে নৌ-শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তিত ষ্টিমার দিয়ে নৌ যাত্রা শুরু হলেও প্রথমত যাত্রী পরিবহনে লঞ্চ এবং তারও অনেক পরে পণ্যবাহী নৌ-যান এবং তৈল বাহী নৌ-যান সমুদ্রগামী নৌ-যান, বালুবাহী সর্বোপরি অধুনা কন্টেইনারবাহী নৌ-যান এবং সমুদ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রলার, ইঞ্জিন বোট এবং দাড়টানা ও বৈঠা বাওয়া নৌকা, ডিঙ্গী নৌকা, সাম্পান, বড় ছোট মাছ ধরার ট্রলার, লবণ পরিবাহী ট্রলার, ফেরী, টাগবোর্ড, টুইন লঞ্চ, স্পীড বোট, এছাড়া বিভিন্ন বাহিনীর ব্যবহার্য্য নৌ-যান, ড্রেজার, উদ্ধারকারী জাহাজ, সার্ভে নৌযান, ইত্যাদি হচ্ছে বাংলাদেশের নদী সীমায় চলাচলকারী পরিবহণ।

যার অধিকাংশই ব্যক্তি মালিকানায়, নৌ-বাহিনী, কোষ্টগার্ড বা অন্যান্য সরকারী বাহন বা কর্তৃপক্ষের বাহন ছাড়া, সরকারি ব্যবস্থাপনায় সমুদ্র ও নৌ রুটে বাণিজ্যিক নৌ-যান সংখ্যানুপাতে অনেক কম। সরকারি নৌ-যানে এবং কর্তৃপক্ষের নৌ যানে বেতন ভাতাদি নির্ধারন হয় সরকারি/কর্তৃপক্ষের বেতন স্কেলের মাধ্যমে। সমুদ্রগামী (ফ্লাগ ভ্যাসেল) পরিচালিত হয় চুক্তি ভিত্তিক। ইঞ্জিন বোট বা ছোট ছোট ট্রলার এর মজুরী কোনটা চুক্তি ভিত্তিক কোনটা সেলফ ইম্পলয়েড কোনগুলো দাদন সিস্টেমে। বাদবাকী সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন নৌ-যান চলে শ্রম পরিচালক কর্তৃক প্রকাশিত মজুরি কাঠামো দ্বারা। এক্ষেত্রে বলা যায় নৌ যানের বিশেষ বৈশিষ্ট (চাকুরীর ধরন এবং কর্মঘন্টা) ইত্যাদি নির্ধারনের জন্য শ্রমিক আন্দোলন করে। শ্রমিকরা একসময় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নৌ-যান শ্রমিক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর প্রতিষ্ঠা করেছিলো। যার মাধ্যমে মজুরিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নির্ধারিত হত। যে বোর্ডের মাধ্যমে ১৯৮৬ সালে প্রথম মজুরি কাঠামোও ঘোষিত হয়েছিলো। কিন্তু বিধি বাম। রাষ্ট্র যেহেতু মালিক গোষ্ঠীর কর্তৃত্বে ও প্রভাবে চলে সে কারণে এক সময় এ বোর্ডটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, আবার আন্দোলনের ফলে বোর্ডের আইন ঠিক রেখে আইনে যোগ করা হয় শ্রম পরিচালক একাজটা করবেন। আইন শ্রম পরিচালককে বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা দিলেও যেহেতু নৌ-যান নদীতে চলে ফলে বিধি প্রণয়নের আইন বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ ও মনে হয় নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

যদিও শ্রম আইনের ২০১৫ সালের বিধিতে পরিদর্শন বিভাগকে পরিদর্শনের কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্ধারণ করবেন শ্রম পরিচালক, আর সে দায়িত্ব পালনের উপযোগি বিধি হয়নি। বহুবার চেষ্টা করে শ্রম পরিচালক/শ্রম পরিদপ্তর ও মনে হয় হতাশ, ফলে যথা পূর্বং তথা পরং। বোর্ড সৃষ্টির আগে শ্রমিকরা আন্দোলন করে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষর করতো এখনো শ্রমিককে দাবী দিয়ে আন্দোলন করে, চুক্তি/সমঝোতা করেই মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ করতে হয় যার মূল একটা অংশ শ্রম পরিচালক গেজেট প্রকাশ করেন বাকীটা চুক্তিতেই চলে। শ্রমিকদের খেদমত করতে যেয়ে আমরা শ্রমিকরা বিভিন্ন ভাগ তৈরী করি।

যে কারণে এই সেক্টরের শ্রমিকরা সর্বনিম্ন বেতনের ক্ষেত্রে পূর্বে এক সময় সরকারী পে স্কেলের নিম্নতম ধাপের এক ধাপ উপরে মজুরী পেয়ে আসলেও পরবর্তিতে নামতে নামতে ২০১০ সালে ঐ ধাপ থেকে অনেক নিচে এবং সকল গ্রেডই বেতন বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

অথচ ব্যাক্তি মালিকানাধীন সেক্টরের শ্রমিক হিসাবে নৌ-যান শ্রমিকদের সংগঠন, আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনার একটা ধারাবাহিকতা আছে এবং গঠণমূলক, দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে শ্রমিক স্বার্থ ও শিল্প স্বার্থ রক্ষার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশ লঞ্চ লেবার এসোসিয়েশন দিয়ে ১৯৬৭ সালে যাত্রা শুরু হয়ে পরবর্তিতে বাংলাদেশ নৌ-যান শ্রমিক ফেডারেশন ফেডারেশন হিসাবে এই সেক্টরে মূলতঃ অধিকাংশ শ্রমিকদের আস্থাশীল সংগঠন। নৌ শ্রমিকদের আন্দোলন দেশ তথা দেশের গন্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মর্যাদাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে চলমান পরিস্থিতিতে বিশেষ মহিমায় মণ্ডিত। এতো কিছুর পরও কথা থেকে যায় আমরা কি মহান মে দিবসের শিক্ষাকে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন করতে পারছি? কি বা আদর্শের ক্ষেত্রে, কি বা অধিকার সংরক্ষণে?

নৌ-যানের শ্রমিকরা ঝড় বৃষ্টি জলোচ্ছাস সাইকোন-দীর্ঘ পরিবার বিচ্ছিন্নতা, জল দস্যু হামলা, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাস, অপহরণ, নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলা করে জীবন, রক্ত, ঘাম ঝরিয়ে তার দায়িত্ব পালন করে। সাপ্তাহিক ছুটি নাই উৎসব ছুটি নাই, ৮ ঘন্টা কাজের সময় হলেও সারাদিন রাত্রিই জাহাজে থাকতে হয়। তার জীবন ও পরিবার নির্বাহের জন্য এখনো শ্রমিকের মোট মজুরী ৪ হাজার টাকার নীচে। ঝুঁকিপূর্ণ এই চাকরিতে না আছে তার জীবনের নিরাপত্তা না আছে সামাজিক নিরাপত্তা।

যদিও এই সেক্টরের শ্রমিকরা তাদের সংগঠন থাকার কারণে শ্রম আইনের অনেক সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে পারে তারপরও জীবনমান উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সামাজিক সার্বিক নিরাপত্তা ভোগ করতে গেলে তাকে আরো শ্রেণি সচেতন, ঐক্যবদ্ধ ও সুগঠিতরূপে এগুনোর মধ্যদিয়েই মে দিবসের অর্জন শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সম্ভব ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিল্প বিকাশে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা। নেতৃত্বের মোহে, আঞ্চলিকতার সংকির্ণতা, ক্ষুদ্র চিন্তা, গোষ্ঠি চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে চেতনায় ও কাজে প্রমাণ করতে হবে শ্রেণী হিসাবে আমরাই শ্রেষ্ঠ, সভ্যতা ও অগ্রগতির কারিগর। দুনিয়ার মজদুর এক হও।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

১৬

উন্নত অর্থনীতি ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ

নইমুল আহসান জুয়েল
সাধারন সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ
সদস্য সচিব, ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়াকার্স ইডুকেশন (এনসিসিডাব্লিউই)
উপদেষ্টা, এলাইন্স ফর বাংলাদেশ ওয়াকার্স সেফটি
সদস্য, জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেফটি কাউন্সিল

সকল বঞ্চনা, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম আর অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত স্মৃতিবিজড়িত গৌরবময় দিনের নাম মে দিবস। ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণে হতাহত হন অনেক শ্রমিক। সেদিনের সেই শ্রমিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বজুড়ে। দেশে দেশে গড়ে ওঠে মেহনতি জনতার ঐক্য। দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিবাদের মুখে শ্রমিকদের দাবী মানতে বাধ্য হয় আমেরিকান সরকার। তারপর ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে শিকাগোর রক্তঝরা সেই দিনটিকে স্মরণ করে বিশ্বব্যাপি 'মে দিবস'কে শ্রমিক অধিকার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ১৮৯০ সাল থেকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে মে দিবস পালিত হয় নানা রকম কর্মসূচির মাধ্যমে।

অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সরকারিভাবে পালিত হয় মে দিবস। আমরা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন তাৎপর্য ও গুরুত্বের সাথে মে দিবস পালন করি। প্রতিবছর ১ লা মে দেশের শিল্পকারখানা থেকে শুরু করে পত্রিকা অফিস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। সারা দিন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে মে দিবসের তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ অনুষ্ঠানমালা পরিবেশিত হয়, আমরা শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের চলমান সমস্যা সহ নানা ইস্যু ও দাবি নিয়ে সোচ্চার বক্তব্য রাখি। মে দিবস চলে যায় তারপর ধিরে ধিরে আমরা আবার ভুলে যাই সবকিছু। এভাবেই প্রতিবছর মে দিবস আসে আর চলে যায় কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটে না। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেছিল যে শ্রমিকেরা, আজ সেই শ্রমিকদের অবদানেই চলছে দেশের অর্থনীতির চাকা। বর্তমানে অমাদের জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে তৈরী পোশাক শিল্প ও বৈদেশিক রেমিটেন্স।

এ দুইটি সেক্টরই টিকে আছে শ্রমিকদের নিরন্তর প্রচেষ্টায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে শ্রমিকদের প্রচেষ্টার উপর সে দেশের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা কোথায়? দেশ অনুন্নত থেকে উন্নয়নশীলে রুপান্তরিত হচ্ছে কিন্তু দেশের শ্রমিকের অধিকারের রুপান্তর ঘটছে না কেন? দেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে বাড়ছে আয় বৈষম্যও। মালিকেরা গড়ছে অর্থের পাহাড় আর শ্রমিকেরা অবস্থান করছে দারিদ্রসীমার নিচে। আজও অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ঠিকমত মজুরি পায় না, পাশাপাশি নারী শ্রমিকরাও কোথাও কোথাও বঞ্চিত সমমজুরি থেকে। নিরাপদ কর্মস্থান, কর্মসংস্থান, কর্মপরিবেশ, কর্মঘন্টা, স্বাস্থসেবা, আবাসন ও আত্নমর্যাদা এখনও আমাদের দেশের শ্রমিকদের আন্দোলনের ইস্যু। দেশে শ্রমিকদের অধিকারের জন্য চলছে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম আর বিদেশে প্রবাসি শ্রমিকরা হচ্ছে নিগৃহীত। অনেক ক্ষেত্রেই সরকার শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় হচ্ছে ব্যর্থ।

আমরা মনে করি, শক্তিশালী অর্থনীতি ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে জন্য শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক, সরকারসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরী। আর সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে পরিবেশবান্ধব নিরাপদ কর্মস্থল, ন্যায্য মজুরি, প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারসহ মালিক-শ্রমিকের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। বরাবরের ন্যায় এবারের মে দিবসেও কামনা করছি সেই কল্যাণমূখী সমাজের, যে সমাজ শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক প্রদানের নির্দেশ দেয়, যে সমাজ শ্রমিকের সমস্ত অধিকার সমুন্নত রাখে, যে সমাজ শ্রমিকের মর্যাদা প্রদানে হিনোমন্য হয় না। মহান মে দিবসে এই হউক আমাদের শপথ। "দুনিয়ার মজদুর এক হও"।

শিল্প সম্পর্ক বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরাপদ ও সবুজ কাজের ভূমিকা

এ.আর. চৌধুরী রিপন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি
হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন

মে দিবস শুধুমাত্র শ্রমিক-কর্মচারিদের অধিকার আদায়ের দিনই নয়, এই বিশেষ দিনটি বিশ্বের সকল উন্নয়নমনা মেহনতি মানুষের ঐক্যের দিন এবং স্বগর্বে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিন।

১৮৮৬ সালের মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের "মকরপ্যাক রিপার ওয়ার্কস" নামে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধর্মঘটি শ্রমিকদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে জন্ম হয়েছিল মহান মে দিবস - আর বিশ্বব্যাপী ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার।

মহান স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের শ্রমিক সমাজের অবদান সর্বজনবিদিত।

২০১৬ সালের বাংলাদেশ আজ সারা পৃথিবীতে একটি অমিত সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

তবে ভূমি স্বল্পতা, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের প্রভাব, মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের অভাব, শিক্ষার নিম্নহার, রোগ, অপুষ্টি, দারিদ্র্য, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সংকট ইত্যাদি এখনো দেশের বিভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির পরিমাণ ৬.১ কোটি, যার প্রায় ২০% প্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং ৮০% অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই কর্মরত মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৬০ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত এসব শ্রমিকের পরিপূর্ণ আইনি অধিকার, নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, চাকরির নিশ্চয়তা, মাতৃত্বকালীন ভাতা ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল এছাড়াও প্রতিবছর শ্রমবাজারে আগত নতুন শ্রমিকের মধ্যে ৫ ভাগের ৪ ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত হচ্ছে। যাদের অধিকাংশই বর্জ্য শ্রমিক (ওয়েস্ট পিকার), গৃহভিত্তিক শ্রমিক হোমবেজড ওয়ার্কার), কৃষি শ্রমিক (বর্গাচাষীসহ), এলাকাভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী, দিনমজুর, হকার ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত হয়, যারা শ্রম আইনের আওতায় এখনো শ্রমিক হিসেবে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। অথচ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষায় রয়েছে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ শ্রমিক শ্রমবাজারে যুক্ত হয়। তাদের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে মাত্র দুই লাখ থেকে আড়াই লাখ শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান হয়। বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় তিন লাখ থেকে চার লাখ, বিভিন্ন স্বনির্ভর কর্মসংস্থানে জড়িয়ে পরছে প্রায় ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার শ্রমশক্তি এবং অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে প্রবাসে প্রতিবছর আরো প্রায় চার লাখ থেকে ৪.১৫ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এছাড়া প্রতিবছর প্রায় ৪-৫ লাখ শ্রমশক্তি কর্মসংস্থানের বাইরে থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে শিল্প ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে। সে সঙ্গে শিল্প ও কলকারখানাসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, আন্তর্জাতি শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ১২০০০ শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের পেশাগত দূর্ঘটনায় মারা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে সংগঠিত রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে প্রায় ১১৩৫ জন শ্রমিকের করুণ মৃত্যু, প্রায় ১২৪৮ জন শ্রমিকের মারাত্মকভাবে আহত হওয়া, তাজরিন ফ্যাশন্সের অগ্নিদূর্ঘটনায় ১১৩ শ্রমিকের মৃত্যু এবং প্রায় ৩০০ শ্রমিকের আহত হওয়া জাতির জন্য বেদনাদায়ক।

বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি)'র কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা জরিপ ২০১৫ অনুযায়ী পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৯৫১ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন, তন্মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ২৭৬ জন ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৬৭৫ জন এবং ৯০৭ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন (প্রাতিষ্ঠানিক খাতে - ৩৭৯ জন ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে - ৫২৮ জন) । ওশি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে পোশাক শিল্পখাতে নিহত ৭৩ জন ও আহত ১১৭ জন: নির্মাণ কাজে নিহত ২৬ জন ও আহত ৩৪ জন। এছাড়া জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে নিহত হয়েছেন ১৪ জন ও আহত ২৭ জন শ্রমিক। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে পরিবহন খাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক শ্রমিক হতাহত হয়েছেন তন্মধ্যে নিহত ৩৪৭ জন এবং আহত ১৫৫ জন। কৃষি কাজে নিয়োজিত অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মৃতের সংখ্যা ৬৮ জন। এছাড়া কর্মকালীন সময়ে ৪৭ জন গৃহশ্রমিক, ৪০ জন দিনমজুর, ১৩ জন হকার ও ১০ জন মৎস্য শ্রমিক নিহত হয়েছেন। অধিকাংশ পেশাগত দুর্ঘটনা ও মৃত্যু এড়ানো সম্ভব যদি মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকগণ কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে সজাগ থেকে তা হ্রাস করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
নিরপাদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭, অনুচ্ছেদ ১৪ এবং অনুচ্ছেদ ২০-এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

দেশের বর্তমান শ্রমনীতি ও প্রাসঙ্গিক আইনসমূহের মূল উদ্দেশ্য শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে অধিকার সুরক্ষা, শোভন কর্মপরিবেশ ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রত্যাশার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে অধিকতর অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টিসহ দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বৈষম্য, শোষন, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারমুক্ত সৃজনশীল কর্মমুখী শ্রমশক্তি গড়ে তোলা।

কিন্তু কর্মস্থলসমূহে শোভন কাজ, শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত শ্রম আইনের শতভাগ প্রয়োগ ও কার্যকর শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি, কর্মস্থলসমূহে শ্রমিকদের যথাযথ নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ও সেইফটি কমিটি ও সকল ক্ষেত্রে গঠন সম্ভবপর হয়নি। আমাদের এক্ষেত্রে আরো হাঁটতে হবে, পাড়ি দিতে হবে আরো বহু দূর।

কর্মস্থলে দুর্ঘটনা জনিত কারণে শ্রমিকের মৃত্যু, মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া বা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে শ্রমিক পরিবারে নিদারুণ দুর্ভোগ নেমে আসে। অন্যদিকে পেশাগত দুর্ঘটনা বা রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে শ্রমিকের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ ব্যয়-বৃদ্ধি পায়। তদূপরি নতুন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন/কার্যসম্পাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়, সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সুনামও বিনষ্ট হয়। কাজেই নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব মালিকের। শোভন ও সবুজ কাজ নিশ্চিত করার জন্য কিছু আর্থিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হলেও পরিশেষে মালিকই এ উদ্যোগের ফলে অধিকতর লাভবান হয়ে থাকেন। মুক্তবাজার ভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতির পেক্ষাপটে আমাদের দেশীয় শিল্পসমূহের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। আর এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির সাথে

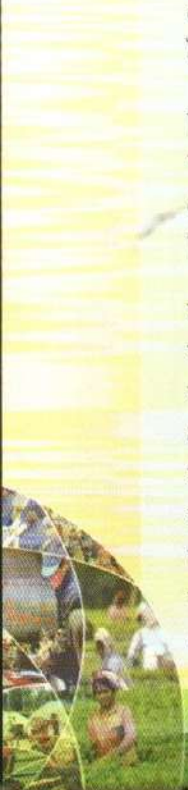

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ।

কাজেই সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে কর্মস্থলের নিরাপদ পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের আইন ও পরিবেশগত উদ্যোগ ও বিনিয়োগ একান্ত আবশ্যক এবং তা সকল পক্ষের জন্যই কল্যাণকর।

বাংলাদেশের শ্রমিকগণ সাধারণত শিক্ষা ও জ্ঞানে অনগ্রসর। প্রতিষ্ঠান ও কারখানা মালিকপক্ষের এক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজণীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শ্রম আইনের বিধান অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় মানসম্পন্ন গণতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় সমর্থন প্রদান ব্যতিত কোন বিকল্প নেই। আর এর ফলে কর্মস্থলসমুহে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে যথাযথ আস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শিল্প সম্পর্ক সুদৃঢ় হতে সহায়ক হবে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের ভূমিকা সমন্বয়পূর্বক পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক এবং তদারকি ভূমিকা পালন করা সরকারের দায়িত্ব। ইতিবাচক দিক হচ্চে, এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব সবুজ কাজের প্রসারে সরকার, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় কাজ করার অঙ্গীকার বর্তমানে বিরাজমান। কাজেই কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সমন্বিত প্রয়াস অত্যাবশ্যক।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১৫৫, ১৬১ ও ১৮৭ নং প্রোটোকল এবং সুপারিশমালা নং ১৬৪ ও ১৯৭-এ কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। সরকারের নিকট বিশেষ সুপারিশ হচ্ছে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নং ৮ যথাযথ সময়সীমার মধ্যে সফলভাবে অর্জনের লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক আইএলও কনভেনশ নং ১৮৭ (প্রমোশনাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর অক্যুপেশনাল সেইফটি এ্যান্ড হেলথ কনভেনশন, ২০০৬) অনুসমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা। দেশের সকল মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের নিকট সুপারিশ হচ্ছে, এই বিশেষ কনভেনশটি অনুসমর্থনে সরকারকে নিয়মিতভাবে যথাযথ অনুপ্রেরণা প্রদান ও সমর্থন যোগানো।

প্রত্যাশা রইলো, বর্তমান শ্রমিকবান্ধব সরকার আগামী ২০১৭ সনের মে দিবস উদ্‌যাপনের পূর্বেই এ বিষয়ে জাতির কাছে একটি শুভ সংবাদ পরিবেশন করবেন। মনে রাখা প্রয়োজন, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব সবুজ কাজ হচ্ছে টেকসই কাজ, আর টেকসই কাজ হচ্ছে টেকসইউন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

১৬

মে দিবসের চেতনা বনাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ
শ্রম উপদেষ্টা
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
ও
অবসরপ্রাপ্ত শ্রম পরিচালক

প্রতিবছর মে দিবস ফিরে আসে। আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের মকরম্যাক রীপার ওয়ার্কস নামের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটী শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল মহান মে দিবস।

এই ঘটনার প্রায় তিন বছর পর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশ। এ সমাবেশে মে মাসের ১ তারিখে মহান মে দিবস হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশের দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মে দিবস পালিত হয়ে আসছে।

একটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বলতে হয় যে শিকাগো শহরের সেই রক্তক্ষয়ী ঘটনা আমেরিকার অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করেনি। বরং আমেরিকার শিল্প বিকাশ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য প্রয়োজন একতা, সংহতি, দায়িত্ববোধ ও কর্মনিষ্ঠা। এসব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা নিজ নিজ কর্মে অধিক যত্নবান হয়েছিল। একসময় ইউরোপের উদরে আমেরিকার অর্থনীতি জন্ম লাভ করেছিল। পরবর্তী সময়ে ইউরোপের অর্থনীতিকে অতিক্রম করে আমেরিকার অর্থনীতি সুদৃঢ় হয়। সে দেশের শ্রমিকরা নিজ দেশের সম্পদ ধ্বংস বা আত্মসাৎ করেনি। দাবি পূরণের পরেই আত্মপ্রত্যয় ও শ্রম দিয়ে তাদের দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তোলে।

শিল্পে শান্তি ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করা সংশ্লিষ্ট সকলের নৈতিক দায়িত্ব। শিল্পে শান্তি বিঘ্নিত হলে উৎপাদন হ্রাস পায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, টাকার মান কমে যায়, শিল্পকে লোকসানের বোঝা বহন করতে হয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়, সময়ের অপচয় ঘটে, আর্থিক ক্ষতি হয়, উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি হয় এবং দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে শান্তিপূর্ণ বসবাস বাধাগ্রস্ত হয়। সুতরাং, রাষ্ট্র তথা আপামর জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্প ব্যবস্থাপনায় সুসামঞ্জস্য আনয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রমিক, মালিক ও সরকারকে তাদের দায়িত্ব এমনভাবে পালন করা প্রয়োজন, যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং ক্রেতাসাধারণকে ভর্তুকি বা লোকসানের সর্বশেষ বোঝা বহন করতে না হয়।

৩০ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশ নামের সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি। এ দেশের মাটি, মানুষ, বাতাস, নদী, পাহাড়-পর্বত, ক্ষেত-খামার আমাদের গৌরবের বস্তু। দেশের উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি, সম্মান আমাদের জীবন দিয়ে রক্ষা করতে হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্পকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে হলে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসতে হবে, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করতে হবে, কারো প্রতি ঈর্ষা বা বৈরিতা নয়–এমন ব্রত হতে হবে।

মে দিবসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎপাদিত পণ্যের মান গুণে ও দর্শনে সুন্দর করার প্রত্যয় গ্রহণ করতে হবে। উৎপাদনের দুটি পক্ষে অর্থাৎ মালিক ও শ্রমিক একে অপরের সমস্যা উপলব্ধি করতে হবে। পরস্পরের প্রতি আস্থা ও আন্তরিকতা স্থাপন করতে হবে। দমন-পীড়ন, ভয়-ভীতি এবং ঘেরাও বা কর্মবিরতি পরিহার করে দায়িত্বশীল ও কর্মপ্রত্যয়ের আদর্শে উজ্জীবিত হতে হবে। তবেই হবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মে দিবসের চেতনার প্রতিফলন।

দীর্ঘ ১২ বছর প্রচেষ্টার পর দেশে প্রচলিত ২৫টি শ্রম আইন রহিত করে নতুন একটি লেবার কোড, ২০০৬ পাস হয়। ২০১৩ সালে বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আইনটির ব্যাপক সংশোধনী সংযোজন করে। নতুন আইনে শ্রমিকদের অনেক সুযোগ-সুবিধার প্রতিফলন ঘটেছে। আগের তুলনায় অনেক সুযোগ-সুবিধার প্রবর্তন করা হয়েছে। আইন ভঙ্গের জন্য মালিককে অধিক শাস্তির বিধান করা হয়েছে। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে। ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। গ্রুপ-বীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণের বিধান করা হয়েছে, পেনশন ও গ্রাচুইটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন করা হয়েছে। ইপিজেডে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, গৃহকর্ম সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, সেক্টরভিত্তিক শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ, জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠনসহ বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষণে, শ্রমজীবী মানুষের কর্তব্য হবে যে শিল্পে নিয়োজিত সে শিল্পের উন্নয়নের জন্য শ্রম নিবেদন করা এবং মালিকপক্ষের শ্রমের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে শিল্পোন্নয়নে অধিক ব্রত হওয়া।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ছে, কিন্তু সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। দেশীয় কাঁচা মালের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার ও বিনিয়োগকারীদের সমঝোতা প্রয়োজন। বিদেশি বিনেয়োগকারিদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা অপরিহার্য। অন্যথায় মানুষের সংখ্যার ভিড়ে ও ভারে জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তবে সরকার ইতোমধ্যে নতুন অর্থনৈতিক জোন সৃষ্টি করতে তৎপর রয়েছে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

পরিশেষে মে দিবস পালনের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষ নতুনভাবে প্রত্যয় গ্রহণ করুক, শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক, দেশ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হোক, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হোক–এ প্রত্যাশা রইল।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

১৬

মে দিবস ও বর্তমান বিশ্ব

এম এ রশীদ
যুগ্ম শ্রম পরিচালক
জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ইউনিট
শ্রম পরিদপ্তর।

কাল নিরবধি। চির চঞ্চল মহাকালের পালা বদলের প্রভাব পড়ে মানুষের ভাব-ভাবনায়, সংস্কার-সংস্কৃতিতে, জীবন ও মূল্যবোধে। প্রভাবে সভ্যতা এগোয় সোপানের পর সোপান ডিঙ্গিয়ে। কোন কোন বিশেষ দিন তার পূর্ব তাৎপর্যসহ অর্থ-মহিমা ভুলে নতুন তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে মানুষের কাছে পৃথক অর্থবহ হয়ে দাঁড়ায়। মে দিবসেরও এরকম অর্থ পরিবর্তনের একটা ছোট ইতিহাস আছে। ইউরোপ ভূ-খন্ডে একসময় পহেলা মে উদ্‌যাপিত হত আনন্দ উৎসবে। মে-বৃক্ষ রোপন করে সাজানো হতো পুষ্পসম্ভারে। মে-রানীর কল্পনায় কবি লিখতেন কবিতা, আপামর সাধারণ থেকে রাজা-রানী সকলে মেতে উঠতেন নাচে-গানে, আমোদে-হুল্লোড়ে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে পহেলা মে নতুন তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে দেখা দেয় বিশ্ববাসীর কাছে, হারিয়ে যায় পূর্ববর্তী মে-দিবসের আনন্দ-অনুষ্ঠানের ধারা। শতাব্দীকালের ঐতিহ্যমন্ডিত মে দিবস আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে আজ বিশ্বের মেহনতী মানুষের কাছে অভিনন্দিত।

মে দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় একদিকে আছে ধনগর্বী শাসক-শ্রেণীর নিষ্ঠুর পৈশাচিকতার প্রকাশ, অপরদিকে অসহায় শ্রমিক শ্রেণীর বুকের রক্ত ঢেলে ও ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে মহান আত্মোৎসর্গ। যন্ত্রনির্ভর শিল্প-সমৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে শ্রেণি-বৈষম্যের উদ্ভব, যার দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত মালিক ও শ্রমিক গোষ্ঠী। শোষণ-বঞ্চনায় শ্রমিকদের তিল তিল ক'রে নিঃস্ব, রিক্ত, নিরন্ন করে একক পুঁজির পাহাড় গড়াই ধনতান্ত্রিক শাসন কাঠামোয় মালিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আর শোষিত শ্রমিক শ্রেণী অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিবাদ জানাতে, দাবি আদায়ের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ মিছিল ধর্মঘটে সামিল হতে বাধ্য হয়। কলকারখানায় শ্রমিকদের শুধু উদয়াস্ত নয় দিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আঠারো থেকে কুড়ি ঘন্টা কাজ করতে হ'ত। এই অমানসিক পীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকের যে আন্দোলন, মে দিবসের স্মরণীয় ঘটনার পিছনের ইতিহাস সে কাজের ঘন্টা কমানোর আন্দোলনের পরিণাম বিশেষ।

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কলে-কারখানায় দৈনিক বাধ্যতামূলক কুড়ি ঘন্টা কাজের সময়-সীমাকে দশ ঘন্টায় নামিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। তারপর আমেরিকার মাটিতে অনেক ঘটনাই সংঘটিত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন রাজনৈতিক ভিত্তি লাভ ক'রে দাস প্রথার অবসান হয়, শিল্পের ব্যাপক প্রসারের সাথে পাল্লা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে এবং "আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার" সংঘটিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে শ্রমিকের কাজের সময় দিনে আট ঘন্টা ধার্য করার স্বপক্ষে আইন প্রণয়নের দাবি নিয়ে আন্দোলনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তে ঘোষিত ১৮৮৬ সালের পহেলা মে থেকে কোন শ্রমিকই দিনে আট ঘন্টার বেশি কাজ করবে না।

এই দাবিতে শুরু হয় প্রত্যক্ষ ধর্মঘট, এতে সামিল হন পাঁচ লক্ষ শ্রমিক, কিন্তু শ্রমিকদের আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশ শ্রমিকদের উপর হামলা চালায় অতপর ৩ মে হার্ভের্স্টার কারখানায় পুলিশী হামলায় নিরস্ত্র ছয়জন শ্রমিক নিহত হন। পরের দিন শিকাগো শহরের হে মার্কেট স্কোয়ারে সমবেত প্রতিবাদ সভায় পুলিশ গুলি চালালে নিরস্ত্র শ্রমিকের বুকের রক্তে রঞ্জিত হয় হাতের নিশান। চার শ্রমিক নেতা স্পাইজ, পার্সনস, ফিসার ও এঞ্জেল বন্দী হন এবং বিচারে তাদের প্রাণদন্ড হয়। এই অবিচারের বিরুদ্ধে সেদিন বিশ্ব জনমত প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাস্তিল পতনের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে

১৮৯০ সালের ১ মে থেকে প্রতিছর আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মে দিবস নামে উদ্‌যাপিত হবে। ১৯৯০ সালের ০১মে শতবর্ষ পূর্ণ হয়।

১৮৯০ সালেই গ্রেট ব্রিটেনের হাইড পার্কে সমবেত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সভায় মে দিবস পালিত হয়। আমেরিকায় পালিত হয় আট ঘন্টা কাজের দাবি নিয়ে ধর্মঘটের মধ্যস্থতায়। ফ্রান্সে সংঘটিত হয় মে দিবসের মিছিল, পরে রাশিয়া, চীন, জার্মানীতে মে দিবস অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ভারতে এর সূচনা হয় ১৯২৩ সালে মাদ্রাজে, উদ্যোগী ছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা সিঙ্গাভেলু চেট্টিয়া। বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মে দিবস পালিত হয়। এভাবে বিশ্বের যেখানে যত মেহনতি শ্রমিক মানুষ আছেন, তাঁরা শ্রমিকের এ সংগ্রাম, সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক মে দিবস স্মরণে প্রতিবছর ০১ মে আন্তর্জাতিক মে দিবস পালন করছেন।

মে দিবস শ্রমিক দিবস। শ্রেণী বৈষম্যের অবসানের লক্ষে সংকল্পবদ্ধ হবার দিবস। মালিকের শোষণ-বঞ্চনা, আত্যাচার অবিচার উৎপীড়ন থেকে মুক্তির স্বপক্ষে অঙ্গীকারবদ্ধ হবার দিবস। দুনিয়ার মেহনতি মানুষ এই পূণ্য দিনটিতে রক্ত রঞ্জিত লাল নিশানের প্রতীক, লাল ঝান্ডার তলে দাঁড়িয়ে আপোষহীন সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করেন, সংগ্রামের ঐক্য প্রেরণায় উজ্জীবিত হন।

মে দিবস শ্রমিকের সংগ্রামী জীবনের দিক নির্দেশক, শ্রেণি বৈষম্যের দাসত্বমুক্তির অনুপ্রেরক। ধনতান্ত্রিক নিষ্ঠুর শাসনের নিগুঢ়ে আজও বিশ্বের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী পিষ্ট-মথিত। সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সমাজতান্ত্রিক শাসন ও সমাজব্যবস্থা পতনের পর মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের মনে বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নভঙ্গের হতাশ-নিরাশা তাদের মনকে সংশায়াচ্ছন্ন করেছে। তা স্বত্বেও মে- দিবসের পূণ্যলগ্নে শ্রমিকের বুকের তাঁজা রক্তে রাঙ্গানো পতাকার তলে দাঁড়িয়ে বিশ্বের মেহনতি মানুষ আজও ধনতন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখে, সংগ্রামের শপথ নেয়, সৌভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করে। মে দিবস তাঁদের মনের আকাশপটে জেগে থাকে অভ্রান্ত ধ্রুবতারার মত দিক নির্দেশক ও পথ প্রদর্শক হয়ে।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

রবীন্দ্র জার্নাল
ISSN 2477-1714
VOL. 33, NO. 01, September 2015

শিশুশ্রম প্রতিরোধ বিষয়ক এ্যাডভোকেসী কর্মশালা

মোঃ ইসরাফিল আলম, এম.পি

সারসংক্ষেপ: প্রত্যেকে ছোট শিশু হয়েই জন্মগ্রহণ করে তারপর আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে জন্ম-শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েই বিভিন্নভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তার এই বড় হওয়ার পেছনে বিভিন্নরকম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। জীবনের যে উন্নতি ও অগ্রগতির পেছনে বড় প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় কাজ করে তা হচ্ছে শিশুদের বিকাশ সাধনে বাধা যাকে শিশু শ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই শিশু শ্রম একজন শিশুকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি সবদিক দিয়েই পঙ্গু করে দিয়ে একটি জাতিকে মাতা-পিতাহীন অবস্থায় অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। তাই শিশুর বিকাশ ও শ্রম সম্পর্কে অতি অল্প সময়ে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে।

আয়োজনে: ১০টি নেটওয়ার্ক ও সংগঠন (ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, সেন্টার ফর সার্ভির্সেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিসঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি), ডিজঅ্যাডভান্টেজড এডলসেন্ট ওয়ার্কিং এনজিওস ফোরাম (ডন ফোরাম), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস্), আইন ও সালিশ কেন্দ্র, কোয়ালিশন ফর আরবান পুওর (কাপ), গার্ল ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ভয়েস ক্যাম্পেইন, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, শাপলা নীড় ও তেরীদ্যাস হোমস্ নেদারল্যান্ডস।

মূল বক্তব্য

শিশুশ্রম বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বর্তমান বিশ্বের খুবই প্রকট একটি সমস্যা। বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম কোন কিছু নয়। শিশুশ্রমের বিভিন্ন দিক রয়েছে। আইএলও'র সংজ্ঞা অনুয়ায়ী শিশুশ্রমের বিষয়টি তিনটি প্রধাণ শ্রেণীতে বিভাজন করা যায়, যথা; অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় শিশু, শিশুশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম। আইএলও কনভেনশন ১৮২ অনুযায়ী গৃহশ্রমকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশে ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের তালিকায় গৃহশ্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ (বিবিএস ২০০৩) অনুয়ায়ী ৭.৪২ মিলিয়ন শিশু যাদের বয়স ৫-১৭ তারা বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তাদের মধ্যে ৩.১৮ মিলিয়নকে শ্রমিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেন এই শিশুশ্রম?

শিশুশ্রমের ইস্যুটি একটি বহুমুখী সমস্যা। প্রধাণত দারিদ্রের কারণে এই শিশুশ্রমের সৃষ্টি। দারিদ্রতার কারণে শিশুরা শ্রমে আসে আবার শিশুদের সস্তায় পাওয়া যায় তাই মালিক পক্ষ তাদেরকে শ্রমে নিয়োগ দেয়। এই পুল ও পুশ ফ্যাক্টর এখানে দায়ি। আরও কিছু কারণে শিশু শ্রমিকের সৃষ্টি হয়, যেমন; দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের নূন্যতম বেতনের অভাব, মানসম্মত শিক্ষার অভাব, পিতা-মাতা ও নিয়োগদাতার সচেতনতার অভাব। শিশুশ্রম ও শিক্ষার মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। প্রায় ৩৫% শিশু তাদের পঞ্চম শ্রেণী পাশ করার পূর্বেই স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ে, যাদের অধিকাংশই শিশু শ্রমিকে পরিণত হয়। কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ বাংলাদেশে অনেক সীমিত আবার যা আছে তার অধিকাংশই মানসম্মত নয় এবং শ্রমবাজারের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বিশেষ করে শহরের শিশুরা সাধারণত অপ্রতিষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করে যার কারণে তারা পরবর্তীতে কোন স্বনামধণ্য ও ভাল প্রতিষ্ঠানে ভাল বেতনের কাজ পায় না।

শিশুশ্রমের চিত্র

ইউএসডিওএল- আইএলএবি এর ২০১২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে মধ্যম সারির অগ্রগতি সাধন করেছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে যেমন; জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১২-১৬ প্রণয়ন, মানব পাচার প্রতিরোধ ও প্রশমন আইন ২০১২, শিশু আইন ২০১৩।

এই অর্জন সত্ত্বেও বাংলাদেশে শিশুশ্রম প্রকটহারে বিদ্যমান ও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে আছে। বাংলাদেশের ৭৮ লক্ষ শিশু অর্থনৈতিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত যাদের মধ্যে ৩২ লক্ষ শিশু শ্রমিক এবং ১৩ লক্ষ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। এসব শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ঢাকা শহরে আবার অনেক বেশি (১৭.৪ শতাংশ)।

শিশু শ্রমের ফলাফল

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় বেশির ভাগ শিশু তাদের যারা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত তারা শিল্প কারখানার কাজে জড়িত। কাজের প্রকৃতি ও পরিবেশ দুই দিক থেকে কাজগুলি ঝুঁকিপূর্ণ। এই কাজ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এবং পরবর্তীতে কর্মক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

সংক্ষেপে বলা যায়- শিশুশ্রম শিশুর চাহিদা ও অধিকার লঙ্ঘন করে এবং শিশুর শারীরিক মানসিক ও নৈতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুশ্রম শিশুকে শারীরিক মানসিক, যৌন ও নৈতিকভাবে নির্যাতিত ও শোষিত হতে বাধ্য করে এবং তাদের মাঝে নেতিকবাচক মনোভাব তৈরি করে। শিশুশ্রম দেশের সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

গৃহশ্রমে নিয়োজিত শিশু

আইএলও কর্তৃক গৃহশ্রমকে শিশুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পেশা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বাংলাদেশে তা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের তালিকায় নেই। বিশাল সংখ্যক শিশু বাংলাদেশে গৃহশ্রমের সাথে যুক্ত। আইএলও ও ইউনিসেফ কর্তৃক ২০০৭ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায় ৪,২০,০০০ শিশু বাংলাদেশে গৃহশ্রমে নিয়েজিত আছে যাদের মধ্যে ৮৩ শতাংশ মেয়ে শিশু। গৃহশ্রমিকের গড় শ্রম ঘণ্টা ১৪ ঘন্টা এবং মাসিক পারিশ্রমিক ৫০৯ টাকা মাত্র। সুনির্দিষ্টভাবে এও বলা যায়, গৃহশ্রমে নিয়োজিত শিশুরা শারীরিক মানসিক ও যৌণ নির্যাতন ও শোষণের শিকার।

বাংলাদেশে গৃহশ্রমে নিয়োজিত শিশুরা কোন আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত নয়। এমনকি শ্রম আইন (সংশোধিত-২০১৩) ও 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০' গৃহশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে কিছু বলা নেই। "গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি ২০১০" এখনও খসড়া আকারেই রয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমরা বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনে জরুরী ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে প্রত্যাশা করছি।

সরকারের কাছে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশাসমূহ

১. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শিশু শ্রম ইউনিট পুনরুজ্জীবনের জন্য রাজস্ব বাজেটের অধীনে প্রয়োজনীয় মানব ও অর্থ সম্পদ বরাদ্দকরণ ।

২. ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় গৃহকর্মে শিশুশ্রম ও ময়লা আবর্জনা সংগ্রহের পেশাকে অন্তর্ভূক্ত করে জরুরীভিত্তিতে তালিকাটি সংশোধনকরণ।

৩. খসড়া গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক দ্রুত চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন।

৪. শ্রমে প্রবেশের নূন্যতম বয়স সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন নং ১৩৮ ও গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় শোভন কাজ বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৮৯ অনুস্বাক্ষরকরণ।

৫. সম্প্রতি গঠিত জাতীয় শিশু শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. শিশুশ্রম বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য আসন্ন বাজেটে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায়

নির্দেশিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ প্রদান।

৭. শ্রমজীবী শিশুদের পরিবারের জন্য বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান ও জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও সম্পদ বরাদ্দকরণ।

উপরের আলোচনা মাধ্যমে শিশুদের বিভিন্ন রকম সমস্যা ও তাদের সমাধানের সন্ধান পাওয়া যায়। যতদূর সম্ভব শিশুদেরকে সুস্থ, সবল, সুন্দর, নিরাপদ, নির্মল, আদর্শ তথা উপর্যুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই ভবিষ্যত প্রজন্মের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত এ কথাটি সমাজের সকল স্তরের জনসাধারণের মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধরে তাদেরকে লালনপালন করতে হবে।

তথ্য নির্দেশ

1. Findings on the Worst Forms of Child Labor, United States Department of Labor's Bureau of International Labor Affairs, Bangladesh Country Report,2012
2. A Child in the Family but Imprisoned: Study on the Situation of Domestic Child Worker in Dhaka city by M. Rezaul Islam (2010)", Bangladesh Shishu Adikhar Forum, 2011
3. Domestic Workers Protection and Welfare Policy 2010 (draft)
4. International Labour Organization (ILO) Convention No. 138
5. International Labour Organization (ILO) Convention No. 182
6. List of Hazardous Work for Children, GoB
7. National Child Labour Elimination Policy 2010
8. National Children Policy 2011
9. National Plan of Action for 2012-2016
10. The Labour Act 2013 (amended)
11. United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)
12. Situation of Child Domestic Workers, Bangladesh Institute of Labour Studies, 2010.

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

কৃষি শ্রমিকের রক্তে প্লাবিত সোহাগপুর

খান আখতার হোসেন
যুগ্ম শ্রম পরিচালক, খুলনা

নারকেল গাছের চিরল পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় ঝলমলে সূর্য। হেসে ওঠে পৃথিবী। জেগে ওঠে প্রকৃতি। আমন ধানের সতেজ কচি পাতায় ঢেউ খেলে যায় নির্মল বাতাস। হিমেল ছোঁয়াতেই ঘুম ভেঙ্গে যায় চল্লিশোর্ধ লাকজান বেগমের। চোখ রগড়াতে বগড়াতে উঠে বসেন। এলিয়েনের মত করে তাকান চারদিক। দেখেন সকলকে। হাক ছাড়েন। ডেকে তোলেন স্বামী শমসের আলীকে। আদর করে ডাকেন পুত্র হযরত আলীকে। ঘুম থেকে না উঠে সে পাশ ফিরে শুতেই চেঁচামেচি শুরু করেন লাকজান বেগম ঘুম ভেঙ্গে যায় বাইশ বছরের টগবগে জোয়ান হযরত আলীর। অলসতা ছেড়ে উঠে বসে।

পানিভাত খেয়েই পিতা-পুত্র লাঙ্গল, জোয়াল, গরু নিয়ে ছুটে যান ক্ষেতের দিকে। আমন ধানের চারা লাগানের সময় এসেছে। জমি উপযুক্ত করে তৈরী করতে হবে। সেচ দিয়ে চারা তুলে লাগাতে হবে সেখানে। সময় নষ্ট হলেই পেছনে পড়তে হবে। পিতা-পুত্র হাত দেন কাজে। তৈরী করতে থাকেন ক্ষেত। লাঙ্গল চরিয়ে উপযুক্ত করতে হবে ভূমি। দিতে হবে পানি। সময় লেগে গেলেও কিছু করার নেই ওদের। বয়স হলেও শরীরের শক্তি এখনও কমেনি শমসের আলীর। পুত্রের সাথে পাল্লা দিয়ে কাজ করেন তিনি। প্রতিযোগিতামূলক মন দেখে হেসে ওঠে হযরত আলী। মানা করেন পিতাকে। কিন্তু তিনি শোনেন না। উৎসাহ দেন পুত্রকে। আনন্দঘন পরিবেশে পিতা-পুত্র কাজ করেন এক সাথে। সূর্যি মামা কিরণ ছড়াতে ছড়াতে নাক বরাবর আসে। গায়ের গেঞ্জি ভিজে যায় ঘামে। হাক্ ডাক্ করে কাজ করতে থাকে পিতা-পুত্র। আজকের ভেতর জমি তৈরীর কাজ তাদের শেষ করতেই হবে। নইলে নাবী হয়ে যাবে আমন ধান।

হঠাৎ কানে আসে শব্দ। পিতা-পুত্র কান উঁচিয়ে ধরে। আবার শব্দ। কিসের শব্দ? শমসের আলীর মনে হচ্ছে গুলির শব্দ। কে গুলি করছে ? কারা গুলি করছে ? এক ঝাঁক প্রশ্ন তাড়া করে ফেরে ওদের। শমসের আলী ভেবে পাননা কেন এ গুলি হচ্ছে ? এতো গুলি ছুঁড়ছে কারা ?

ইদানীং এলাকাটি বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা নালিতাবাড়ির কাকরকান্দি ইউনিয়নের সবুজে ঢাকা সোহাগপুর গ্রামেতো কোন অশান্তি ছিল না। পরম শান্তিতে বাস করতো জনগণ। হিন্দু, মুসলমান, উপজাতি গারোদের সহবস্থান ছিল এ গ্রামে। নেই কোন কোলাহল, নেই কোন দাংগা, নেই কোন সহিংসতা। বড়ডো শান্ত পরিবেশে চলছিলো এলাকার মানুষের জীবন। শমসের আলী খেয়াল করেছে বেশ কিছুদিন ধরে এ গ্রামে অপরিচিতদের আনাগোনা বেড়েছে। কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে ঘাড়ে রাইফেল ঝুলিয়ে দাপিয়ে চলাচল করে কিছু লোক। এলাকার শান্তি শৃংখলা রক্ষা করতে ওরা সদাপ্রস্তু। ওরা কোলা ব্যাঙের মত লাফিয়ে চলে, খরগোশের মত ছুটোছুটি করে, আর শুয়োরের মত শুকে শুকে চলে। ওরা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের লোক। হানাদারদের সাহায্যকারী। ওদের দাম্ভিকতায় ভীত সন্ত্রস্থ এলাকাবাসী। ওরা রাজাকার আলবদর পরিচয় দিতে নিজেরাই গর্ব বোধ করে। ওরা যখন যা চায় তাই হয় এই সোহাগপুরে। ওরা বুক ফুলিয়ে বলে- পাকিস্তানের শত্রুদের নিস্তার নেই, নিস্তার নেই।

একাত্তরের মাঝামাঝি সময়। নতুন একটি পতাকার জন্য লড়ছে দেশের দামাল ছেলেরা। যুদ্ধ করছে পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত আটানব্বই বর্গ মাইলের জন্য। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা নতুন এক ভূখন্ডের জন্য জীবন বাজী রেখেছে মুক্তিযোদ্ধারা। লড়ছে তারা গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে রাজধানীতে। লড়ছে খাল-বিল, নদ-নদী সাগরে।

লড়ছে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত সর্বত্র। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার প্রতি পরতে পরতে কন্দরে কন্দরে দামামা বেঁজে উঠেছে। লড়ছে দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, কামার, কুমার জেলে সকলেই। সবার স্বপ্ন নতুন দেশ চাই। কৃষি শ্রমিক হলে কি হবে শমসের আলী জানেন সব। খোঁজ খবর রাখেন দেশের। সবার অলক্ষ্যে শোনেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। ব্রিটিশ রাজত্বে জন্ম নিয়ে শমসের আলী দেখেছেন ওদের শাসন শোষন। বিজাতীয় শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আন্দোলন সংগ্রাম অসহযোগিতা প্রত্যক্ষ করেছেন পরম আগ্রহ নিয়ে। দু'শ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতা অর্জন তাকে করেছিল উল্লসিত। উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন নতুন দেশ পাকিস্তান গড়তে। কিন্তু ছেলে ভোলানো ছড়ার মত পাকিস্তানের স্বাধীনতা তার মনে দাগ কাটে। ১৯৫২ সালে তরতাজা যুবক ছিলেন তিনি। এসময়ে মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন এদেশবাসী শহীদ জব্বার, রফিক, শফিকের জন্য হৃদয় তার নাড়া দেয়। ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনে শহীদ আসাদের মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি তিনি। বহু অন্ধকার অলি গলি পাড়ি দিয়ে আসে ১৯৭০ সাল। শমসের আলীর চোখে মুখে দেখা যায় আনন্দের ঝলকানি, আলোর বন্যা। ভোট দেন তিনি গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তা আওয়ামী লীগকে। নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেও ক্ষমতায় বসতে দেয়া হয় না দলটিকে। বাঙালীকে দমন করতে শুরু হয় পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর পৈশাচিকতা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সূচনা করে দুনিয়া কাঁপানো জঘন্যতম গণহত্যা। প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে নিভৃত পল্লী পর্যন্ত সর্বত্র সংঘটিত হয় গণহত্যা। কিছুই অজ্ঞাত নয় শমসের আলীর। গুলির শব্দ শুনে তিনি ভাবেন তবে কি রক্তের নেশা সোহাগপুরেও পৌঁছালো? গুলির শব্দের সাথে গরুর পায়ের কাছে বসে পড়েন শমসের আলী ও হযরত আলী। দেখেন ছুটে আসছে গ্রামের কিশোর সিরাজ আলী। দূরে দেখেন বিলের ভেতর থেকে লোকালয়ের দিকে এগিয়ে আসছে চক্কর বক্কর পোশাক পরা পাকিস্তানী বাহিনী। তাদেরকে পথ চিনিয়ে দিচ্ছে চেনা জানা আলবদর ও রাজাকারের দল।

পাকবাহিনী সোহাগপুর গ্রামের প্রফুল্লর দীঘি থেকে সাধুর আশ্রম পর্যন্ত এলাকা ঘিরে ফেলে। এগ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিয়েছে এমন খবরে ওরা খুঁজতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং আশ্রয়দাতাদের। যখন শিকার খুঁজে পাওয়া যায় না তখন হিংস্র হয়ে ওঠে ওরা। উর্দু ভাষায় জিজ্ঞেস করে 'মুক্তি কাহা'। কেউ জানেনা। গ্রামের সবাই একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। তবুও প্রাণে সাহস জুগিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে আসেন কৃষি শ্রমিক আলী হোসেন ও জমির আলী। কিছু বলার পূর্বেই দু'জনকে গুলি করে হত্যা করে রাজাকারেরা। শুরু হয়ে যায় পাকবাহিনীর নির্মম তাণ্ডব। তিন/চার ঘন্টা ধরে এলাকায় চলে নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ ও ধর্ষণ। কোথাও কেউ পালাতে পারেনা। পাখির মত মরতে থাকে নীরিহ নিরস্ত্র গ্রামবাসী।

দূর থেকে শমসের আলী দেখতে পান মাঠে কর্মরত তিন অদিবাসী গারো রমেন রিছিল, চটপাথাং ও সিরিল গাব্রিয়েলকে গুলি করে হত্যা করে পাক বাহিনী। সামনে যাকে দেখছে তাকেই গুলি করছে। রক্তে প্লাবিত হতে থাকে সোহাগপুরের পবিত্র মাটি। রক্তে ভিজে যায় আমন ক্ষেত। শমসের আলী দেখেন কিছু দূরে পাঁচটি গুলি খেয়েও বেঁচে ছিলেন রহম আলীর ছেলে সিরাজুল। আর্তনাদ করছিলেন বাঁচার জন্য। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন তিনি। ঘুরে দাঁড়ায় এক পাক সৈন্য। ধারালো বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে থাকে তাকে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত। জবেহ্ করা মুরগির ন্যায় ছট্‌ফট্ করতে থাকেন সিরাজুল। যা দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকে শমসের আলী, হযরত আলী ও কিশোর সিরাজ আলী। এগিয়ে আসে পাক বাহিনী। শরীরের হাফপ্যান্ট ভিজে যায় সিরাজ আলীর। প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দেয় শমসের আলী ও হযরত আলী। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে সিরাজ আলী। কাঁপতে থাকে থর্ থর্ করে। পাক বাহিনী এগিয়ে আসে তার কাছে। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে। কিশোরটির অসহায়ত্ব পাক সৈন্যের ঔদ্ধত ফনাকে সংবরণ করে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে সিরাজ আলীকে। কিশোর বলে তাকে কিছুই বলে না আর। ছেড়ে দেয় ওকে।

পাক সৈন্য ও রাজাকারা দৌড়াতে থাকে শমসের আলী ও হযরত আলীকে ধরতে। দীর্ঘশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে ঘরের সামনে পড়ে যান শমসের আলী। হযরত আলী দৌড়ে আশ্রয় নেয় ঘরের ভেতর। তড়িঘড়ি করে উঠে

শমসের আলীও দৌড়ে ঢোকেন ঘরের ভেতর। জীবন রক্ষা করতে ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয় দরজা। ঘরের সামনে বসে থাকেন লাকজান বেগম। স্বামী ও সন্তানের পিছে পিছে ছুটে আসা রাজাকার ও হানাদারদের ঘরের ভেতর যেতে বাধা দেন তিনি। জড়িয়ে ধরেন রাজাকারের পা, 'আমগর পুনাডারে মাইরেন না বাপ, সোয়ামীডারে মাইরেন না বাপ, বিদুফা হইবো। তোমাগোর পা ধরছি ওদের মাফ কইরা দাও বাপ। বুট দিয়ে লাথি মারে পাক সৈন্য। ছিটকে পড়েন তিনি। ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠেন লাকজান বিবি। প্রাণ ভিক্ষা চান স্বামী ও সন্তানের। কান্নাকাটি করেন। তবুও মন গলে না ওদের। লাথি মেরে খুলে ফেলে বাঁশের দরজা। রাইফেল হাতে পাকবাহিনী দেখে ঘরের কোণে পিতাকে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে পুত্র। পিতা জোড় হাতে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চান। করুণ কণ্ঠে বলেন, 'হামারে মাইরা ফ্যালান। কিন্তু হামার চোখের মনিরে মাফ কইরা দ্যান'। কথা শুনে পুত্র বলে ওঠেন, 'না, না, বাবাকে নয় হামারে মাইরা ফ্যালান। হামার বাবা অসুস্থ। শুইতে পারে না, ঘুমুতে পারেনা, কাইশা কাইশা পার করে সারারাত। হামার বাবাকে মাইরেন না। হামার বাবাকে মুক্তি দিন। প্রাণ ভিক্ষা দিন।'

পুত্রের কথা শুনে পিতা শমসের আলী বুক উঁচু করে ত্বড়িৎ বেগে দাঁড়িয়ে বলেন, 'না, না মিনিটারী স্যার হামার সন্তানরে নয়। হামারে মাইরা ফ্যালান। ও বেঁচে না থাকলি ওর মারে কে দ্যাখবে?' এভাবে পিতা-পুত্রের কথার মাঝে গর্জে ওঠে পাক সৈন্যের রাইফেল। ঘরের ভেতরেই লুটিয়ে পড়ে পিতা-পুত্র। গুলির শব্দে জ্ঞান হারান লাকজান বেগম। নিস্তব্ধ হয়ে যায় পরিবেশ। এভাবেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সোহাগপুরের কৃষি শ্রমিক আনছার আলী, লতিফ মিয়া, চফর উদ্দিন, শহর আলী, রিয়াজ আহমেদ, রহম আলী, সাহেব আলী, বাবর আলী, উমেদ আলী, আছমত আলী, মহেজ উদ্দিন, সিরাজ আলী, আবুল হোসেন সহ ১৮৭ জন নীরিহ পুরুষ। গণত্যার পাশাপাশি হানাদার বাহিনী, আলবদর ও রাজাকাররা সম্ভ্রমহানি ঘটায় ১৪ জন নারীর।

শোরগোলে জ্ঞান ফিরে আসে লাকজান বেগমের। আগোছালো কাপড় নিয়েই চিৎকার করে ওঠেন, 'আমার পুনা কই?' ছুটে যান তিনি ঘরের ভেতর। আচঁড়ে পড়েন স্বামী ও সন্তানের নিথর দেহের উপর। মাটি ছাপড়ে মুর্ছা যান বারবার। কেঁদে ওঠে আকাশ বাতাস প্রকৃতি। পাকিস্তানী আর্মি মেজর আইয়ুবের ডান হাত হিসেবে খ্যাত টাঙ্গাইল, জামালপুর ও শেরপুর এই তিন জেলার আলবদর বাহিনীর বাঙালী কমান্ডার এক নরঘাতকের নেতৃত্বে লোমহর্ষক এ গণহত্যা ঘটে একাত্তরের পঁচিশে জুলাই। যোহরের আগেই সবুজ ক্ষেতের মাঝে বয়ে যায় কৃষি শ্রমিকের রক্তের ধারা। রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় সোহাগপুরের পবিত্র মাটি। নিহত এসব কৃষি শ্রমিকের লাশ সৎকারের জন্য সাদা কাফনের কাপড় কোথাও পাওয়া যায়নি। পরিবারের শাড়ি, লুঙ্গি, মশারী কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লাকজান বেগমের শাড়ি পেঁচিয়ে, স্বামী ও সন্তানকে গর্তের ভেতর ৪/৫ টি লাশের সাথে মাটি চাপা দেয়া হয়। মহিলা ও শিশুরা মাঠের ভেতর থেকে লাশ টেনে নিয়ে এসে গণকবর দেয়। গ্রামটিতে ভূতুরে পরিবেশ সৃষ্টি হয় মুহূর্তে।

সেদিন আহত ও নির্যাতীতদের গগন বিদারী আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস প্রকৃতি। ঘন বসতিপূর্ণ শেরপুরের এ গ্রামটি মুহূর্তে হয়ে যায় পুরুষ শূণ্য। স্বামীহারা হয়ে যান কৃষি শ্রমিক আব্দুল লতিফের স্ত্রী হাছেনা বানু (২৯), রহিমুদ্দিনের স্ত্রী করফুলি বেওয়া (২৪), ইব্রাহিমের স্ত্রী হাফিজা বেওয়া (১৭), হাতেম আলীর স্ত্রী অজফা বেগম (২৫), জসিম উদ্দিনের স্ত্রী নূরেমান বেওয়া (৩০) সহ ৫৭ জন নারী। এদিন ঘরে ঘরে গিয়ে পুরুষদের হত্যা করা হয়। এলাকাটি পরিচিতি পায় 'বিধবা পল্লী' হিসেবে। কৃষি শ্রমিকের রক্তে প্লাবিত সোহাগপুর আজও টানে দেশ প্রেমিকদের। আজও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়- এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না, ভুলবো না....।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

(১৬)

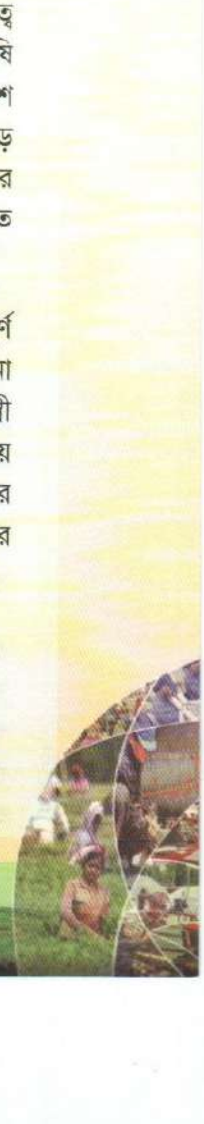

মহান মে দিবসের চেতনায় নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও শ্রম অধিকার সুরক্ষা হউক

আমিনুল হক ফারুক
সহ-সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ
সভাপতি, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, বাংলাদেশ।

মহান মে দিবশ পহেলা মে সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন।
দীর্ঘদিনের শোষন, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিপীড়িত লড়াকু শ্রমিকগণ পহেলা মে ১৮৮৬ তে হে মার্কেটে এক রক্তঝড়া আন্দোলনের মধ্যদিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস রচনা করেছেন, সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের সাথে বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীও প্রতি বছর গভীর শ্রদ্ধার সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিনটিকে স্মরন করে এবং নিজেদের আত্নত্যাগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃপ্ত শপথ নেয়।

সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়ে প্রথম শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। তাই ১৯৭২ সালে তিনি মহান মে দিবস পহেলা মে সরকারী ছুটি ঘোষনা করেন। সে থেকে প্রতি বছর এই দিনটিতে আমরা ছুটি ভোগ করছি। তিনি বলেছেন আমি শোষিতের পক্ষে। রিক্সাওয়ালাকে ভাই বল। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষনেও তিনি প্রত্যেক শিল্পের মালিককে শ্রমিক ভাইদের বেতন যথা সময়ে পৌছে দিতে বলেছেন।

বঙ্গবন্ধু শ্রমিক শ্রেণীকে স্বাধীনতার মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং এর পরবর্তী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল জাতীয় সংকট ও সন্ধিক্ষণে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ভুমিকা ছিল দৃষ্টান্তমূলক। বঙ্গবন্ধু'র ৬ দফা আন্দোলনে শ্রমিক মনুমিয়ার রক্তের স্রোত বেয়ে ত্বরান্বিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। শত শত শ্রমিক মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আমরা তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

বঙ্গবন্ধু'র সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ শতকের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরনের জন্য শিল্পায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করেছেন। যার মধ্যে শ্রম অধিকার সুরক্ষা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ অন্যতম। আর তা বাস্তবায়নে চারদলীয় জোট সরকারের প্রণীত অসামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে একটি সময়োপযোগী শ্রম আইন ২০১৩, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ ও জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২ প্রণয়ন করেছেন। দেশে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন, শিশু শ্রম নীতিমালা ২০১০, সড়কপরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ২০১২, রাষ্ট্রিয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক চাকুরির শর্তাবলী আইন ২০১২, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১২, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ ও মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসে উন্নীত করন।

পে-কমিশন ২০১৩ গঠন করে ইতোমধ্যে বাজার দর ও জীবন ধারনের ব্যয়ের সাথে সংগতি রেখে পেনশন সুবিধা বৃদ্ধিসহ একটি উন্নতমানের পে-স্কেল প্রদান করেছেন। শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে গার্মেন্টস সেক্টরসহ বিভিন্ন শিল্পে সময়োপযোগী মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসিক সুবিধা ও ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
শ্রমিক ও মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারিদের চাকুরীর বয়স ৬০ বৎসর এবং সাধারন কর্মচারিদের চাকুরির বয়স ৫৯ বৎসরে

উন্নীত করেছেন। বেশ কিছু শিল্পকারখানার মালিকানা শ্রমিকের হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠন করে বিদেশে সহজে ও অল্পখরচে অধিক শ্রমিক প্রেরনের পথ সুগম করেছেন, এতেকরে বৈদেশিক রেমিটেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষা তদারকি বেড়েছে।

ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে আমাদের দেশের শিল্প মালিকদের অনেকের ধারনা সীমিত ও নেতিবাচক। যার কারনে মালিক-শ্রমিক এর মধ্যে দূরত্ব অনেক। শ্রমিক যেমন কলের চাকা ঘূরায় তেমনি ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করে মালিক শ্রমিকের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। এর ফলে কারখানার পরিবেশ সুন্দর হয়, উৎপাদন বাড়ে, মালিক লাভবান হয় এবং শ্রমিকের সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয়। অথচ একশ্রেণীর মালিক ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্বেষী হয়ে এর পরিপন্থি কর্মকান্ড করে। কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার চেষ্টা করলেই মালিক পক্ষ হয়রানি, বদলী ও চাকুরীচ্যুতি ইত্যাদি পথ বেছে নেয়। শ্রম আইন লঙ্গন করে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বদলী করা হলে শ্রমিক পক্ষ আদালতে আশ্রয় নিলে আদালতের রায়কে পর্যন্ত মালিক পক্ষ অবজ্ঞা করে। এতে করে শিল্পে অসন্তোষ দানা বাধে। উৎপাদন ও উন্নয়নের লক্ষ বাধা গ্রস্ত হয়, শিল্পায়ন বিঘ্নিত হয়। এসকল পরিহার করে আসুন আজকের দিনে আমরা শ্রম অধিকার সুরক্ষায় অঙ্গিকারাবদ্ধ হই এবং নিরাপদ কর্ম পরিবেশ গড়ে তুলি।

আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর মহান মে দিবসে এটাই হউক আমাদের প্রত্যয়।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

শ্রম পরিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড

এস,এম,এনামুল হক
যুগ্ম শ্রম পরিচালক
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা।

শ্রম পরিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সহ অন্যান্য শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ পরিদপ্তর শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান সেবাসমূহ

- ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;
- ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;
- এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন নিষ্পত্তি করণ;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য,পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ করা;
- আই.এল.ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই.এল.ও কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরী প্রশাসন, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

শ্রম পরিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়, ৪ টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ১১টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র এর মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণের বিষয়টি বর্তমানে চলমান আছে। এ পরিদপ্তরটি অধিদপ্তরে উন্নীত হলে এর জনবল বৃদ্ধিসহ অবকাঠামোয় পরিবর্তন আসবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

এ পরিদপ্তরের বর্তমান জনবল ও অবকাঠামো এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ-

(ক) জনবলঃ শ্রম পরিদপ্তরে ১ম শ্রেণীর ১২১টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৮৬ জন , ২য় শ্রেণীর ৫৭টি পদের বিপরীতে ১৭ জন, ৩য় শ্রেণীর ৩১৮টি পদের বিপরীতে ২৭২ জন ও ৪র্থ শ্রেণীর ২১৬টি পদের বিপরীতে ১৯৬ জনসহ সর্বমোট ৭১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিপরীতে ৫৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বর্তমানে কর্মরত আছেন। অবশিষ্ট পদগুলো পূরণের জন্য কার্যক্রম চলছে। দাপ্তরিক শৃঙ্খলা এবং বিধি-বিধান পালন করে ৩য় শ্রেণী ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদরকে মূল পদে ফেরত প্রদানের কার্যক্রমও চলমান আছে।

(খ) নিয়োগঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে শ্রম পরিদপ্তরে ১ম শ্রেণীর ০৪ জন, ৩য় শ্রেণীর ২০ জন, ৪র্থ শ্রেণীর ০৪ জন সর্বমোট ২৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ম শ্রেণীর ৩ জন প্রভাষক ও ৪ জন চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ০৭ জন নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

(গ) প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনার/সফর ইত্যাদি ঃ- ১। দেশঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনারে অংশগ্রহনকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২৭ জন। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী প্রশিক্ষণের লক্ষমাত্রাকে ছাড়িয়ে যাবে মর্মে আশা করা যায়।

অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রিফ্রেসার্স কোর্স এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম,পি। পাশে উপবিষ্ট রয়েছেন মহা পরিদর্শক জনাব সৈয়দ আহম্মদ এবং শ্রম পরিচালক জনাব এস,এম, আশরাফুজ্জামান।

২। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ : শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা, অফিস শৃঙ্খলা, আর্থিক বিধি-বিধান, শুদ্ধাচার, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বাজেট, অন-লাইন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ কর্মশালা শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও অধীনস্থ অফিসসমূহে সময় সময়ে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার প্রশিক্ষণ ঘন্টা ১৩৬ এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মোট ২৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যার প্রশিক্ষণ ঘন্টা ১২০। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এধরণের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রিফ্রেসার্স কোর্স এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার। পাশে উপবিষ্ট রয়েছেন শ্রম পরিচালক জনাব এস,এম, আশরাফুজ্জামান।

৩। শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ : দেশে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন কলকারখানা-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সর্বমোট ৭১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৬৭৬৯ জন। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

৬৩ তম শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ কোর্স এ বক্তব্য রাখছেন শ্রম পরিচালক জনাব এস,এম, আশরাফুজ্জামান।

৪। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ : শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক আন্তর্জাতিক শ্রমমান বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা দেশে বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে, এ প্রসঙ্গে আর্থিক বিষয়টি জড়িত থাকায় বাজেট স্বল্পতার কারণে এবং কখনো কখনো দেশের সামগ্রিক শ্রম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও শ্রম অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের সব সময় এ ধরণের প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। এ প্রশিক্ষণের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ০৪জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট০৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, দক্ষতার উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।

ইটালির তুরিন এ ITC-ILO কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স এ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন টঙ্গীর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বেলাল হোসেন এবং প্রভাষকবৃন্দের সাথে ITC এর প্রশিক্ষক।

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন : সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক, কর্মস্থলে সহযোগিতা ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সেক্টরে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন দেয়া হয়েছে ২৯৮টি ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মোট ১১৬টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিত হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন প্রদান একটি চলমান প্রক্রিয়া।

অন লাইনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সমাপ্তির পর শ্রমিক লীগের সভাপতি জনাব শুকুর মাহামুদের হাতে রেজিস্ট্রেশন সনদ প্রদান করছেন শ্রম পরিচালক জনাব এস,এম, আশরাফুজ্জামান। পাশে উপস্থিত অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক জনাব আই, কে, এম, এহ্‌তেশামুল হক।

(ঙ) ট্রেড ইউনিয়ন এর কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন : ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের আওতায় রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ইউনিয়নসমূহের জন্য অনদিক দুই বৎসরে এবং প্রতিষ্ঠান পুঞ্জের আওতায় রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ট্রেড ইউনিয়নের জন্য অনধিক তিন বৎসরে একবার কার্যিনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করা বাধ্যতামূলক। প্রতি বছরে সর্বমোট ৭,৫৩৭ টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে। সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী "বিসিআইসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (রেজিঃ নং-বি-২০০১), বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-বি-৭৭), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-চট্ট-৬৪১)" এ- শ্রম পরিচালকের তত্ত্বাবধানে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে।

শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন শ্রম পরিচালক জনাব এস, এম, আশরাফুজ্জামান

(চ) যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচন : যে সকল প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্যমান সে সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষি নির্ধারণের লক্ষে শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সি,বি,এ) নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে। গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ১১টি প্রতিষ্ঠানে সি,বি,এ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সি,বি, এ) নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমিন জুট মিলস লিমিটেড, ষোলশহর, চট্টগ্রাম-এ সি,বি,এ, নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট প্রদানের লক্ষে শ্রমিকগণ ব্যালট হাতে ভোট প্রদানের জন্য লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

(ছ) পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচন : বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সাধারণত ৫০ বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত এমন প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি (৬ জনের কম এবং ৩৫ জনের বেশী নয়) নিয়ে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ভোটে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং মালিক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত মালিক পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। বর্ণিত বিধিমালা জারীর পর এ পর্যন্ত ৪৮টি প্রতিষ্ঠানে পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

টিউনিক এ্যাপারেলস লিমিটেড, মিরপুর, ঢাকা-এ পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট প্রদানের লক্ষে শ্রমিকগণ ব্যালট হাতে লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

(জ) শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি : বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সিবিএ'র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপিত হওয়াকেই শ্রম আইনে শিল্প বিরোধ বা শ্রম বিরোধ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ শ্রমিকের চাকুরীর শর্তাবলী ও কর্মস্থলে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে শ্রম বিরোধ উত্থাপিত হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সালিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে ১১৪টি ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মোট শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে ৪০টি।

সিমৃস ফ্যাশন্স লিমিটেড কর্মচারী ইউনিয়ন এবং সিমৃস ফ্যাশন লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সালিসি সভায় চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের যুগ্ম শ্রম পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল আমিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

(ঝ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান : শ্রমিক ও তার পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়েছে সর্বমোট ৪২০১৪ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যগণকে এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৯০৭৯ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

যোলশহর শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম নুর।

(ঞ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান : শ্রমিক ও তার পরিবারের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন শ্রম

তেজগাঁও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শ্রমিকদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দা নুরুন্নাহার ইসলাম।

রাজশাহীস্থ সপুরা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে নারী শ্রমিকগণ লুডু খেলায় মত্ত।

(ঠ) জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি : স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহি আনয়নের লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তরসমূহে সাপ্তাহিক গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে ২৬৪টি ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ জুলাই থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মোট অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে ১৯৬৯টি।

শ্রম পরিদপ্তরের সেবাসমূহ আরও সহজ ও সংশ্লিষ্টদের দোর গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য ডিজিটালাইজড কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষে হট-লাইন কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে। শ্রম সংশ্লিষ্ট যে কোন পক্ষ এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

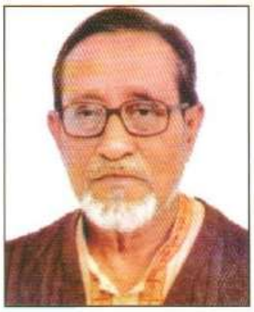

স্ব-নির্ভর বাংলাদেশের প্রয়োজনেই শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক

আলমগীর মজুমদার
সভাপতি, ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

আজ বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য, সংগ্রাম, ত্যাগ, সংহতি ও বিজয়ের প্রতীক ঐতিহাসিক ১লা মে। মালিক-শ্রমিক সকলেই এই দিবসের অপরিসীম তাৎপর্যের কথা উচ্চকিত কণ্ঠে তুলে ধরেন। ঐতিহাসিক মে দিবসকে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ও বিজয়ের দিন, আন্তর্জাতিকভাবে সংহতি ঘোষণার দিন হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

মহান মে দিবস সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে লড়াই করে বাঁচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত শপথে বলীয়ান হতে যেমনি শিক্ষা দেয়, তেমনি শিক্ষা দেয় আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ়চেতা হতে।

মহান মে দিবসের শিক্ষায় ব্রতী হয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী এবং নিজেদের দাবী ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় শ্রমিক শ্রেণী পৃথিবীর বেশ ক'টি দেশে নিজস্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমে সম হলেও বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর এখনও ১৯৪৪ সালের আই.এল.ও- এর ২৬তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব যা ফিলাডেলফিয়া ঘোষণা হিসেবে স্বীকৃত "(অ) শ্রমিক শ্রেণী কোন পণ্য নয়, (আ) প্রগতি/উন্নয়নের প্রয়োজনে সংগঠন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা (ই) উন্নয়নের/অগ্রগতির পথে দারিদ্র প্রতিবন্ধক (ঈ) অগ্রগতির সোপানকে সার্বজনীন করার প্রয়োজনে ত্রি-পক্ষীয়তার নীতির ভিত্তিতে শ্রমিক-মালিক-সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে মুক্ত আলোচনা ও গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ সকল বিষয়ের সমাধান খোঁজা"- এর ন্যায় ন্যূনতম অধিকার সকল ক্ষেত্রে অর্জনেরও সৌভাগ্য হয়নি। এই না হওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা প্রকৃত অর্থে মহান মে দিবসের শিক্ষার আলোকে নিজেদের লক্ষ্য হাসিলে তথা দাবী আদায়ে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলতে পারিনি। পারিনি লক্ষ্য অর্জনে ত্যাগ স্বীকার করতে। পারিনি আত্মত্যাগে বলীয়ান হতে। এই না পারার কারণ হচ্ছে, শ্রমিক হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব স্বত্ত্বায় বিকশিত না হওয়া। এতদসত্ত্বেও নিজস্ব স্বত্ত্বায় বলীয়ান হওয়ার আপোষহীন সৎপ্রচেষ্টা যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ শ্রমিক, নিজস্ব শ্রেণীস্বত্ত্বায় উজ্জীবিত থেকে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ে সক্ষম হয়েছে। যখন থেকে শ্রমিকের নেতৃত্বে সুবিধাবাদী ও ভূঁইফোড় নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটল, তখন থেকেই শ্রমিকের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বি-পথে পরিচালিত হতে শুরু করলো। এর অন্যতম কারণ, বর্ণিত নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীর স্বত্ত্বার সাথে একাকার হতে পারেনি। ফলে, আন্দোলন সংগ্রামে সুবিধাবাদ এমন মাত্রায় প্রশ্রয় পেয়ে বসে যে, শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য হাসিল এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আান্দোলনের চেয়ে কেবলমাত্র মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনই মুখ্য হয়ে উঠে। প্রথমেই কায়দা করে সাদা-কাপড়ে শ্রমিকদের 'কর্মচারি' আখ্যা দিয়ে কল-কারখানার শ্রমিকের সাথে ব্যবধান সৃষ্টিতে মদদ জোগায়। এভাবেই ক্রমান্বয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে বহুধা বিভক্তিতে ঠেলে দেয়া হয়। খুব সু-কৌশলে সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সংসদে স্বীকৃত ও অনুমোদিত 'জাতীয় ন্যূনতম মজুরী' কে জাতীয় বেতন কাঠামো' ও 'জাতীয় মজুরী কমিশন'- এ বিভক্তি টেনে এর কার্যকারিতা কেবলমাত্র সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারী ও শ্রমিকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখে বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়। আর ব্যক্তি-মালিকানাধীন শ্রমিককে বিভিন্ন সেক্টরে শ্রেণী বিন্যাস করে ভিন্ন ভিন্ন 'ন্যূনতম মজুরী বোর্ড' এর আওতায় বিভক্ত করে দেয়া হয়। অথচ, শোষণ-বঞ্চনা, নিপীড়ন-নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আন্দোলনসহ জাতীয়

পর্যায়ের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর অবদান অনস্বীকার্য।

এতদসত্ত্বেও,পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে যেখানে নাগরিক অধিকারের বিষয়াবলী সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়, সে সকল দেশে কর্মচারি ও শ্রমিককে আলাদা না করে বা সরকারী, আধা-সরকারী অথবা ব্যক্তিমালিকানার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্যমূলক নীতি ঘোষণা না করে সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য একটি 'জাতীয় ন্যূনতম মজুরী' নির্ধারিত থাকে। তারা এ ধরনের ব্যবস্থা এজন্যই রাখেন, যাতে খেটে খাওয়া মানুষ প্রাপ্য ন্যূনতম মজুরীর ভিত্তিতে অন্তত একজন সভ্য মানুষ হিসেবে তার ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম হন। অর্থাৎ, জীবন যাত্রার সর্বনিম্নতম মান বজায় রাখার জন্যই 'জাতীয় ন্যূনতম মজুরী'।

আমাদের শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত 'জাতীয় ন্যূনতম মজুরি' প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। অথচ, বর্তমান অবাধ ও মুক্তবাজার অর্থনীতি 'প্রাইভেট সেক্টর কনসেপ্ট' এর ভিত্তিতে পরিচালিত বিধায় পৃথিবীর অপরাপর দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও ব্যক্তি-মালিকানাই আজ প্রাধান্যে। বলা যায় সিংহভাগ শ্রমিকই আজ ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। অথচ, এই সিংহভাগ শ্রমিকের জন্যে নেই কোন সুষম মজুরী ব্যবস্থা। বর্ণিত সিংহ ভাগ তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের দাবী ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোন শ্রমিক সংগঠনের কোন যৌক্তিক চার্টার এবং উপযুক্ত আন্দোলনের কর্মসূচী না থাকায় আন্দোলন সংগ্রামে ব্যক্তি-মালিকানাধীন শ্রমিক-কর্মচারীর নেই কোন আগ্রহ। এতে, একদিকে শ্রমিক নেতা ও আন্দোলনের প্রতি উল্লিখিত শ্রমিক সমাজের বিশ্বাসহীনতা বাড়ছে অপরদিকে, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনে যে ফলোদয় হয়, তদ্বিষয়েও আস্থা হারাচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। ফলে শ্রমিকের সামনে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পরিবর্তে 'কোন রকমে জীবন পার করাবার' মনোভাব চেপে বসেছে বিধায় উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার প্রতিও নেই কোন আগ্রহ। কোন রকম 'ডিউটি-আওয়ার' শেষ করে কর্মস্থল ত্যাগ করার প্রতি বাড়ছে আগ্রহ।

এ'টা কোন অবস্থাতেই শ্রমিক-মালিক-সরকার কারো জন্যই সুখদায়ক হতে পারে না। কারণ, অবাধ তথা মুক্ত বাজার অর্থনীতির এই সময়ে 'যেন-তেন ভাবে বেঁচে-বর্তে' থাকার মনোভাব সম্পন্ন শ্রমিক ও মালিকের শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। তাই, এহেন অশুভ অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে শ্রমিককে আস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তজ্জন্যে শ্রমিককে সভ্য মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে 'জাতীয় ন্যূনতম মজুরী'র ঘোষণা ও তার বাস্তবায়নের জন্য আইন প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক। এই লক্ষ্যে দরকার অসৎ শ্রমিক নেতা বিবর্জিত 'সুস্থ' ও সবল শ্রমিক আন্দোলন' এবং 'শ্রমিক-মালিক-সু-সম্পর্ক' বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে উদ্যোগী হওয়া। এ উদ্যোগকে সফল ও স্বার্থক করার জন্য 'আই.এল.ও'-এর ১৯৪৪ সালের অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্ত তথা 'ফিলাডেলফিয়া ঘোষণা'র বাস্তবায়নই যথেষ্ট। তজ্জন্যে প্রয়োজন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত 'আই.এল.ও'- এর কনভেনশন নং- ০১-শিল্পে কর্মঘণ্টা বিষয়ক কনভেনশন, ১৯১৯, কনভেনশন নং- ০৪- রাত্রীকালীন কাজ (মহিলা) কনভেনশন- ১৯১৯, কনভেনশন নং- ২৯-বাধ্যতামূলক কাজ সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৩০, কনভেনশন নং- ৮১ শ্রম পরিদর্শন কনভেনশন, ১৯৪৭, কনভেনশন নং- ৮৭-সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সংগঠন করার অধিকার সংরক্ষণ কনভেনশন- ১৯৪৮, কনভেনশন নং- ৯৮- সংগঠন করার অধিকার ও যৌথ দর-কষাকষি করার নীতি সংক্রান্ত কনভেনশন- ১৯৪৯ এর বাস্তবায়ন।

আজকের এই দিনে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে বর্ণিত কনভেনশনসমূহ সহ দেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের আলোকে সকল নাগরিকের স্বাধীনভাবে সংগঠন গড়ে তোলার এবং শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার ন্যূনতম যে আইন-কানুন প্রবর্তন করেছে তাও মানা হয় না। শ্রমিকের ন্যায়ানুগ ও বৈধ তৎপরতাকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমলে নেয়া হয়না। শ্রমিকের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে, শ্রমিক বিদ্রোহী হয়ে স্বার্থান্বেষীদের ইন্ধনে যখন অবৈধ কার্যক্রম ও ভাংচুড়ে নেমে পড়ে তখনই সরকারি হস্তক্ষেপ এবং আলোচনা-পর্যালোচনা, পরামর্শ বৈঠক ও নিস্পত্তির পদক্ষেপ শুরু হয়। অথচ, শ্রমিকের দাবী ও অধিকারের প্রশ্নে সম্ভুষ্ট শিল্প বিরোধের বিষয়ে মালিকপক্ষ সাথে সাথে আলোচনা করলে এ সববিরোধের নিরসন অনায়াসেই হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে ভুল-বুঝাবুঝিজনিত বিষয়েও অহেতুক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অপরদিকে আইন কার্যকর করার জন্য রয়েছে 'শ্রম পরিদপ্তর' এবং 'কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর'। এই দুই অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে উপস্থিতি স্বত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের প্রাতিষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নেই, নেই সুনির্দিষ্ট কর্মঘন্টা ও সার্ভিস বুক। নেই, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের প্রচলিত আইনানুগ ছুটি-ছাঁটা। নেই ন্যূনতম মজুরির বাস্তবায়ন ও অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা। অপরাপর সুবিধাদির কথা তো বলাই বাহুল্য। বহু নামী দামী শিল্প প্রতিষ্ঠানেও শ্রমিকের চাকুরীর শর্তাবলী মানা হয় না। কিন্তু, এই মালিকরাও জানেন এবং বোঝেন যে, শ্রমিকের যে ন্যূনতম চাহিদা তা মেটালেই বা মেটাবার পজিটিভ উদ্যোগ নিলেই শ্রমিককে আস্থায় নেয়া সম্ভব। আর শ্রমিককে আস্থায় নিতে পারলে যে, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধন করা যায় এবং তদ্দারা যে বেশী লাভও করা যায় তাও মালিকদের অজানা নয়।

এই হচ্ছে মহান মে দিবসের ১৩০তম বর্ষে বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত চিত্র। অথচ, এই প্রোপটেও আজকের এই দিবস উদযাপন করতে যেয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বেমালুম ভুলে থেকে বাগাড়ম্বর করবো। এমনকি 'শ্রমিক মালিক সু-সম্পর্ক' বিনির্মানেও অঙ্গীকারাবদ্ধ হবো। কিন্তু, মে মাস যেতে না যেতেই 'যথা পূর্বং তথা পরং' অবস্থা। ফলে, দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির যে সোপান আমরা স্বাধীনতার পর ৪৫ বছর ধরে অর্জন করতে চেয়েছি, তা বারে বারে 'সোনার হরিণ-সম' হয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের ও লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে শ্রমিককে তার ন্যূনতম অধিকার প্রদান করে দেশ, সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়ন ও অগ্রগতির পার্টনার হিসেবে প্রকৃত অর্থেই শ্রমিককে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা। তাহলেই শিল্প-বিরোধের পরিবর্তে গড়ে উঠবে সমঝোতা ও সহমর্মিতা। তাতে দেশ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ব-নির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হবে।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শোভন কাজ

মোঃ শহীদুল্লাহ বাদল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক ফেডারেশন

শাভন কাজ নিশ্চিত করা বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। ২০০১ সালের ১১ জুন তারিখে জেনেভায় অনুষ্ঠিত অন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের ৮৯তম অধিবেশনে আইএলও মহাপরিচালক জুয়ান সোমাভিয়া বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি শোভন কাজ নিশ্চিত করার উদাত্ত আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা- আইএলও এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন- আইটিইউসি এর সাম্প্রতিক প্রচার অভিযান ও কর্মকাণ্ডের শীর্ষে রয়েছে ডিসেন্ট ওয়ার্ক বা শোভন কাজের বিষয়টি।

শোভন কাজ মানেই হচ্ছে এমন একটি কর্মপরিবেশ যেখানে শ্রমিকের থাকা, খাওয়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, চাকুরী ও উপযুক্ত মজুরির নিশ্চিয়তা দিবে। পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, যোগ্য কাজে যোগ্য ব্যক্তির যোগ দেওয়ার সুযোগ, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক সংলাপে অংশগ্রহণ ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের নিশ্চিয়তা থাকবে। সেটাই হবে শ্রমিকের জন্য শোভন কাজ।

শোভন কাজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাপনে পরিতৃপ্তি আনে এবং সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। শোভন কাজের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষের এমন উপার্জন নিশ্চিত করা যাতে করে, সে নিজের ও পরিবারের জন্য সামাজিকভাবে যথার্থ, মুক্ত টেকসই অর্থনৈতিক ভিত তৈরি করতে পারে। শোভন কাজ নিশ্চিত করা হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়। শোভন কাজ নিশ্চিত করার জন্য ত্রিপক্ষীয়/সামাজিক সংলাপ নিয়মিত অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

শোভন কাজ নিশ্চিত করতে হলে ৫টি কৌশলগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে। সেগুলো হচ্ছে-

১। শ্রম আইন ও আইএলও কনভেনশন কর্মক্ষেত্রে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
২। কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা।
৩। কর্মজীবী নারী-পুরুষের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
৪। সামাজিক সংলাপসমূহে শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৫। সংগঠিত হওয়া ও যৌথ দরকষাকষির বিশ্বজনীন স্বীকৃতি অধিকার নিশ্চিত করা।

শোভন কাজ নিশ্চিত হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে, শ্রমিক, মালিক, ভোক্তা ও সরকারও তার সুফল পায়।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

১৬

মহান মে দিবস ও বিশ্ব নারী দিবস

মোঃ খোরশেদুল হক ভূঁঞা
উপ-শ্রম পরিচালক

"এ বিশ্বে যা কিছু মহান চির, কল্যাণ কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"

প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশে তার ব্যত্যায় ঘটে নি। বিশ্ব নারী দিবস এর আদি নাম ছিল "আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস"। এই দিবসটি উদযাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ সালে মজুরী বৈষম্য, কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করা ও কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইর্য়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলে সরকারের লেঠেল বাহিনীর দমন-পীড়ন। ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ নারী শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ব্যর্থ হয়। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের নেত্রী "কারা জেটকিন" পুরুষের পাশাপাশি নারীর সম-অধিকারের দাবিটি আরও জোরালো করেন। ১৯০৮ সালে নিউইর্য়র্কের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নারী কারা জেটকিনের নের্তৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সালে কোপেন হেগেনে ১৭টি দেশের ১০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। বিশ্বের অনেক দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। ৮ মার্চ চীন, মেসিডোনিয়া, মাদাগাস্কার, নেপালে এ দিবসে শুধুমাত্র মেয়েরাই সরকারী ছুটি পায়। বাংলাদেশে ৮ মার্চ সরকারী ছুটি না হলেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করা হয়। অধিকার মর্যাদায় নারী পুরুষ সমানে সমান এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এবারো ৮ মার্চ ১৬ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ।

সরকারী পর্যায়ে নারী পুরুষের বেতনাদি ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগুচ্ছে। আজ নারীকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। সর্বক্ষেত্রেই নারীর উপস্থিতি এবং সাফল্য বিরাজমান। দুঃখের বিষয়, অপ্রাতিষ্ঠানিক কোন কোন কর্মক্ষেত্রে নারীর মজুরী পুরুষের চেয়ে কম। কিন্তু নারীর কর্মঘন্টায় কোন ছাড় নেই। তাছাড়া নিজ ঘর থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট ও কার্মক্ষেত্রে নারীদের উপর বিভিন্ন অত্যাচার ও নির্যাতনও লক্ষ্য করা যায়। সামান্য কারনেই নারীর উপর নেমে আসে শারীরিক; মানসিক ও যৌন নির্যাতন। তাই মহান মে দিবসের প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখাতে হলে সবক্ষেত্রে নারী পুরুষের মর্যাদায়ও মজুরীতে সমতা নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন ২০০৯ এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে পুরুষের চেয়ে নারী ১৬ ভাগ পারিশ্রমিক কম পায়। অপর এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে নারীরা কাজ করেছে শতকরা ৬৫ ভাগ। নারীরাই এই জগতের শক্তির উৎস আর প্রেরণা।

প্রতি বছর ১লা মে মহান মে দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা হয়। ১৮৮৬ সালে নির্যাতিত শ্রমিকগণ দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে জমায়েত হয়েছিল। তখন শ্রমিকদের ঘিরে থাকা পুলিশের উপর এক অজ্ঞাতনামা বোমা নিক্ষেপের দরুন পুলিশ শ্রমিকদের উপর নির্বিঘ্নে এলোপাথারি গুলি করতে থাকে। এতে ১০ জন থেকে ১২ জন শ্রমিক মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর দৈনিক আটঘন্টা কর্মঘন্টা নির্ধারিত হয়। পুলিশের গুলিতে কোন মহিলা শ্রমিক নিহত হয়েছিল কিনা জানা নেই। তবে শ্রমিক জমায়েত মহিলাদের উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল। মহান মে দিবসের প্রাপ্তিতে নারীর মজুরির বৈষম্য নিরসন হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় মহান মে দিবসের প্রকৃত প্রাপ্তি অপূর্ণই থেকে যাবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর ৮টি মৌলিক কনভেনশনের মধ্যে নারী পুরুষের মজুরির বিষয়ে "সমমজুরি কনভেনশন ১৯৫১ (১০০ নম্বর) এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সকল শিল্প সেক্টরের নারী পুরুষের মজুরির বৈষম্য নিরসন করার বিকল্প নেই। সেই সাথে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকলের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে। বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন থেকে পরিত্রান দিতে হবে, সকল প্রকার বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনের সকল অধিকার নারীর ভোগের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

মে দিবস শ্রমিকের ন্যায্য মানবাধিকার ও সংগ্রামের অবিস্মরণীয় মাইলফলক।

সিরাজুল ইসলাম রনি
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ
সদস্য- নিম্নতম মজুরী বোর্ড (গার্মেন্টস শিল্প সেক্টর)
সদস্য- ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর কমিটি (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)
সদস্য- ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটি

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের প্রেরনা ও আবেগের দিন ও সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় ও সংহতি দিবস পালন হয়ে আসছে। সেই ১৩০ বছর পূর্বে শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে ও কর্মঘন্টা ৮ ঘন্টা নির্ধারনের দাবীতে শ্রমিকেরা আন্দোলনে নেমেছিল ১৮৮৬ সালের এই দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে। তাদের পেশাগত নিরাপত্তা, আইনগত অধিকার, স্বাস্থ্যগত সুরক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে আমরা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মাঝে আত্ম সচেতনতার যে দীপশিখা প্রজ্বলিত হয়েছে তার পেছনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের ভূমিকা ও অবদান অনেক। ইহা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক আনন্দ বেদনার যুগপৎ সম্মিলনের দিন। এ দিনে স্বীকৃতি পেয়েছে শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকারের বিষয়টি। শ্রমজীবী মানুষ শুধু তাদের কার্যসময় সম্পর্কিত অধিকার পাননি পেয়েছেন মানুষ হিসেবে মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং উপলব্ধি। নতুনকে চ্যালেঞ্জ রুপে গ্রহণের অনুপ্রেরণা। এ দিবস এলে তাঁরা আবার নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন। এ দিবস উদযাপনের গণজোয়ার আর কোরাস ধ্বনিতে তাঁদের আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিধ্বনিত হয়ে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে যায়।

এবার মে দিবসে যেমন কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের গ্রাচ্যুয়িটি, পেনশন অবসর কালীন ভাতা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান অবদানের বিষয়টি স্বীকার করতে হবে। দেশের জন্য পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকরা অপরিসীম অবদান রেখেছে। এদেশের প্রায় ৪০ লক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিকরা জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে আরো বেগবান করতে সক্ষম হবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে শ্রমিকের দক্ষতাই মালিকের সক্ষমতা। তাই মালিক শ্রমিক একে অন্যের প্রতিপক্ষ নয় বরং উৎপাদনের দুটি অংশ। যারা একে অন্যকে ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। শুধু প্রয়োজন একে অন্যের উপর অবিচল আস্থা। শ্রমিক যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার হাতিয়ার তারও যথাযথ স্বীকৃতির প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে সরকার-মালিকপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে কর্মস্থল উন্নয়ন ও সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকার-মালিক-শ্রমিক - ক্রেতা বিক্রেতাদের সার্বিক সহযোগিতার কোন বিকল্প নাই। আমি মহান মে দিবসে জোর প্রত্যাশা করি ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প চির উন্নত মম শির হিসেবে দাড়িয়ে থাকবে।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

১৬

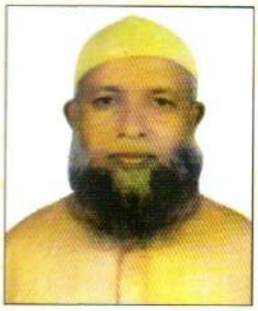

শিল্পায়নজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা ও উত্তরণ

ডাঃ আবু সালেহ মুহাম্মদ রিয়াজী
মেডিকেল অফিসার
শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

আদি সমাজ কৃষি ভিত্তিক সমাজ। উন্নয়নের আকাঙ্খা নিয়ে সমাজের এগিয়ে চলার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে প্রাণময় মানবিক বোধ সম্পন্ন আদি কৃষিভিত্তিক সমাজের রূপান্তর ঘটে। জন্ম নেয় শিল্পভিত্তিক সমাজ। যে সমাজ কাঙ্খিত ভোগ্য সামগ্রির যোগান দেয় দ্রুততর। যাপিত জীবনকে করে সুখকর, দ্রুতগামী, জৌলুসপূর্ণ কল্পনানাশী সম্ভোগে সুমহান। শিল্পায়নের সঙ্গে শিল্পকলার সৃজনশীলতা মানবিকতাবোধের অবস্থান দৃঢ়তর হলে শিল্প নিছক পণ্য উৎপাদনের, আত্মস্বার্থসিদ্ধির ও অর্থ প্রবৃদ্ধির ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন অন্ধ সৃজনে পরিণত হয়ে বিশ্বকে স্বাস্থ্যসংকটসহ নানাবিধ সংকটে ফেলবে না। শিল্পায়ন একটা জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির ভিতরে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিপ্লবের যথার্থতা নিয়ে প্রকাশিত হবে।

শিল্পায়ন থেকে উদ্ভূত স্বাস্থ্য সমস্যা কি কি হতে পারে

১। পরিবেশগত স্যানিটেশন সমস্যা ঃ-

(ক) আবাসন ঃ- যেখানে শিল্প সেখানেই শ্রমবিক্রির মানসে মানুষের ঢল। গ্রাম প্রত্যন্ত পল্লী থেকে মানুষ আসছে কাজের জন্য শিল্প এলাকায়। শিল্প এলাকার আশে পাশে গড়ে উঠছে অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি বস্তি। শিল্প এলাকার চারপাশ পরিণত হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের চারণ ভূমিতে। শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যকর যুগোপযোগি আবাসিক ভবন নির্মাণ করে সমস্যাটির মোকাবেলা করা যায়।

(খ) পানি দূষণঃ- দ্রুত শিল্পায়নের ফলে জন্ম নেয়া অন্যতম বিয়োগান্ত ঘটনা পানির দূষণ। শিল্প কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য মিশে যাচ্ছে জলস্রোতে নদীতে। নদী মাতৃক আমাদের দেশ। নদীমাতার মুখে নিক্ষেপিত হচ্ছে টন টন বর্জ্য বিষ। যে বুড়িগঙ্গার মত বহু খাল,বিল,নদী বয়ে নিয়ে যেত স্ফুটিকের মতো স্বচ্ছ জলের অমিয়ধারা তা পরিণত হচ্ছে জীবননাশী পুঞ্জি গন্ধময় বিষের আধারে। শিল্প বর্জ্যে থাকে বিভিন্ন রকম এসিড, এ্যালকেলি, তৈল জাতীয় পদার্থ, জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থ, টক্সিক পদার্থ, সংশ্লেষিত ডিটারজেন্ট এবং রেডিও একটিভ পদার্থসমূহ। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন আইনানুগ প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা, যা শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা শুরুতেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

(গ) বায়ু দূষণঃ- শিল্প এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বায়ু দূষণ। যা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। কল কারখানা থেকে নির্গত গ্যাস, ধোয়া, রাসায়নিক কণিকাসমূহ বায়ু দূষণের কারণ। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ নগর পরিকল্পনা ও নিরাপদ উন্নত প্রযুক্তিসুবিধাসম্পন্ন শিল্প স্থাপনা তৈরি করা।

(ঘ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ- যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য শিল্প স্থাপনের শুরুতেই কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা যেতে পারে। অপ্রতুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানিদূষণ ও মাটিদূষণসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের কারণ হয়ে দাড়ায়।

২। বিভিন্ন রকম রোগব্যাধি ঃ-

i) তাপ জনিতঃ তাপজনিত জ্বর (Heat Hyperpyrexia), তাপজনিত ক্লান্তি (Heat Exhaustion), heat syncope, burns,

ii) আলোজনিত ঃ পেশাগত ছানি (Occupational Cataract), Miners nystagmus (চোখের কাপন)
iii) শব্দজনিত ঃ উচ্চ শব্দজনিত বধিরতা (Occupational deafness)
iv) তেজস্ক্রিয়তা (Radiation)ঃ- Cancer, Leaukaemia, Aplastic Anaemia, Pancytopania জাতীয় রক্ত রোগ।
v) যান্ত্রিক উপকরণজনিত ঃ- আঘাত (Injuries) দুর্ঘটনা (Accident)
vi) বিদ্যুৎ ঃ- Burns

৩। রাসায়নিক উপাদানজনিত ঃ-

(i) কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, এ্যামোনিয়া ইত্যাদি গ্যাসসমূহে বিষক্রিয়া (Poisoning) হতে পারে।

(II) কয়লা ধুলা (Coal dust)ঃ- এনথ্রাকোসিস (Anthracosis)- এই রোগটি দীর্ঘদিন (প্রায় ১২ বছর) কয়লার খনিতে কাজ করতে হতে পারে । আক্রান্ত ব্যক্তির ফুসফুসের টিস্যুসমূহ Progressive massive fibrosis এর কারণে অকার্যকর হয়ে যায়।

(III) সিলিকা (Silica)ঃ- সিলিকোসিস (Silicosis)- এই রোগটি ফ্রি সিলিকা বা সিলিকন ডাই-অক্সাইড নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণের ফলে হয়ে থাকে। স্বর্ণ,সিলভার, ম্যাংগানিজ খনিতে কাজ করলে এবং আয়রণ ও স্টিল ইন্ড্রাস্ট্রিজ শ্রমিকদের এই রোগটি হতে পারে। কাশি, শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা এই রোগের লক্ষণ।

(IV) এসবেস্টস (Asbestos)ঃ- এসবেসটোস থেকে এসসেটোসিস ও ফুসফুসের ক্যান্সার হতে পারে।

৪। জৈব ধূলিকণা (Organic dust)ঃ- জৈব ধূলিকণা থেকে নিম্নোক্ত রোগসমূহ হতে পারে।
(I) ইক্ষুতন্তু জাত (Cain dust)ঃ- Bagasosis,
(ii) Cotton dust-Byssinosis
(iii) Tobacco (তামাক)- Tobacosis

৫। সিসার বিষক্রিয়া (Lead Poisoning)

৬। পেশাগত চর্মরোগ (Occupational dermatitis) ঃ- স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় কাজ করা অতিরিক্ত তাপ, ঘর্ষণ ইত্যাদি কারণে পেশাগত চর্মরোগ হতে পারে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা

১। ধুলিকণা নিয়ন্ত্রণ (dust control)ঃ-
(i) ভেজা পদ্ধতি (wet process)ঃ-
(ii) এনক্লোজড এপারেটাস (Enclosed Apparatus)
(iii) একজস্ট ভেন্টিলেশন (Exhaust ventilation) ইত্যাদির মাধ্যমে ধুলিকণা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

২। ব্যক্তিগত সুরক্ষা (Personal Protection)ঃ- প্রতিরোধমূলক সরঞ্জামদি যেমন- মাস্ক, মেকানিক্যাল ফিল্টারসংযুক্ত রেসপিরেটর ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।

৩। মেডিকেল কন্ট্রোল (Medical control)ঃ- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সময়ে সময়ে (Periodical) শ্রমিক সাধারণ মেডিকেল চেক আপ ও যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পেশাগত রোগব্যাধি আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি।

আমাদের যাপিত জীবনকে সহজতর ও আনন্দঘন করার জন্য উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর যোগান দেন যে শ্রমিক স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তার চোখের কোণেও ফুটে উঠুক আনন্দের ঝিলিক।

আমরাই পারি

মাসুদা সুলতানা
প্রভাষক
শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, টঙ্গী।

প্রিয় পাঠক,
আমি আমার এ লেখনিতে যা লিখেছি তা কোন গল্প নয়। পুরোটাই সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখা। প্রধান কার্যালয় থেকে শ্রদ্ধেয় এস,এম, এনামুল হক স্যার যখন ম্যাসেজ পাঠালেন যে, আসছে ১লা 'মে' দিবসের স্বরণিকায় লিখা দিতে হবে। ফিরে গেলাম কল্পনায়। অনেক দিন পর আবারও কিছু লিখতে বসেছি। কিন্তু কখনো এটা কখানোও বা ওটা করতে করতে হঠাৎ মনে হলো আরে আমি কল্পনা থেকে কিছু লিখার চেষ্টা করছি কেন? কয়েক দিন আগে আমি যে বাস্তবতার সম্মুখিন হয়েছিলাম তার উপরেই তো লিখতে পারি।

তো আল্লাহর নামে শুরু করলাম লিখা। দিনটি ছিল ২৯-২-২০১৬ তারিখ, রোজ সোমবার। আশুলিয়ায় অবস্থিত ইসলাম গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান " দি রোজ ড্রেসেস লিঃ " এ ৩৭ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে আমার এক সপ্তাহ ব্যাপি ৬৫৮তম শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সটি শুরু হয়েছিল ২৮-০২-২০১৬ তারিখে। যথারীতি কোর্সের ২য় দিন অর্থাৎ ২৯-০২-২০১৬ তারিখ আমি এবং আমার এক সহকর্মী এম,আর,খান মজলিস সাহেব সকাল ৮:৪৫ মিঃ প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থিত হই। সকাল ৯:০০ঘটিকায় ১ম সেশন শুরু হবে। এর মধ্যেই কিছু প্রশিক্ষণার্থী এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেছে। আমরাও তাদের সাথে কুশল বিনিময় করছি এমন সময়, হঠাৎ শুনতে পেলাম পাশের কোন একটা কক্ষে চিৎকার চেচামেচি হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থী যারা বসে ছিলেন তারা তাড়াতাড়ি প্রশিক্ষণ কক্ষ থেকে বের হয়ে ওখানে চলে গেলেন। সাথে সাথে আমরাও গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছু বুঝতে পারলাম না। আবার প্রশিক্ষণ কক্ষেই ফিরে এলাম। ঘড়িতে সময় সকাল ৯:০৫ মিঃ কিন্তু প্রশিক্ষণ কক্ষে কারোর আগমন ঘটলো না। বাধ্য হয়েই এইচ আর এন্ড এডমিন ম্যানেজারকে ফোন দিলাম। বললাম এখনো প্রশিক্ষণার্থীগণ শ্রেণী কক্ষে আসল না কেন ? কি হয়েছে ? তিনি শুধু বললেন যে, ম্যাডাম একটু সমস্যা হয়েছে। আমরাও সেখানে যাচ্ছি। এসেই আপনার সাথে কথা বলছি। খুব টেনশন কাজ করছে, কি হচ্ছে, কি হবে কিছুই জানিনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্যাণ কর্মকর্তা এবং এইচ আর ম্যানেজার প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রবেশ করেন এবং বললেন যে, ফ্যাক্টরীতে লাইন চীফ এবং শ্রমিকদের মধ্যে একটা ছোট সমস্যা হয়েছে। ২নং লাইনের একজন প্রশিক্ষণার্থী। সে সকাল ৮:১৫ মিঃ লাইন চীফকে বলল যে, স্যার আমি মিটিং (প্রশিক্ষণে) এ যাব। আমাকে ছুটি দেন। লাইন চীফ বললেন যে, তোমার ট্রেনিং শুরু হবে সকাল ৯:০০ টায় এখন বাজে ৮:১৫। একই বিল্ডিংয়েইতো প্রশিক্ষণ হচ্ছে, এতো তাড়াতাড়ি না যেয়ে আরেকটু পরে যাও। ঐ শ্রমিক আবার ডব্লিউপিসি কমিটির সদস্য। সে বললো আমি মিটিং এ যাব বলেছি এটাই যথেষ্ট। আরো পরে নয় এখনই যাব। লাইন চীফও নাছোর বান্দা । সে বলল আমি এখনই যাওয়ার অনুমতি দিতে পারবো না। আর সাথে সাথেই ঐ শ্রমিক ফোন করে ডব্লিউ পিসি কমিটির অন্য সদস্যদের এই ঘটনা বলে। আর তখনি ফোন পেয়ে অন্য সদস্যরা এসে ঐ লাইন চীফ এর সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করে। কথা কাটাকাটির এক পযায়ে তারা অতি উত্তেজিত হয়ে একে অপরকে মারধর শুরু করে দেয়। এ পর্যন্ত বলার সাথে সাথে আমরা দেখলাম যে, চারদিক থেকে শ্রমিকরা দৌড়াচ্ছে এবং নিচে নেমে যাচ্ছে। কিছু বোঝার আগেই দেখি যে, সম্পূর্ণ কারখানাই শ্রমিকদের সাথে লাইন চীফদের ধরাধরি শুরু হয়েছে। এমনকি বাইরে থেকেও লোকজন এসে মারামারিতে অংশ নিচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে কর্তৃপক্ষ ঐ দিনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলেন এবং ডব্লিউ পিসি কমিটির সবাইকে থাকতে বললেন। সাধারণ শ্রমিকরা সকলেই চলে গেল। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পুলিশের সদস্যরা আসলো। পরিবেশ কিছুটা শান্ত হলো। প্রতিষ্ঠানের এম,ডি কে জানানো হলো।তিনি তখন নিজ বাসভবন উত্তরায় অবস্থান করছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এম,ডি হলেন সাবেক

বিজিএমইএর প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ আতিকুর রহমান। বেলা তখন ১১:০০ টা। ফ্যাক্টরিতে এম,ডি এসে পৌছালেন। আমরা তখন জি,এমদেরকে নিয়ে মিটিং করছিলাম। তিনি এসে আমাদের সাথে পরিচিত হলেন এবং তার রুমে আরেকদফা মিটিং এর আয়োজন করলেন। আমাদেরকে অনুরোধ করলেন, ম্যাডাম আপনারা সরকারি লোক। এটা মীমাংসা করে দিয়ে যান। তিনি আরও বললেন যে, ফ্যাক্টরীতে এক দিন কাজ বন্ধ থাকলে ৩০-৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। এখন যদি মীমাংসা না হয় তা হলে কোম্পানী ক্ষতিতে চলে যাবে।

এসব দেখে শুনে আমি যে ভয় পাইনি তা নয়। কিন্তু আমার নিজের ভয়কে অন্তরালে রেখে সাহসের সাথে বললাম, ইনশাআল্লাহ আপনার ফ্যাক্টরীতে আগামীকাল থেকে উৎপাদন কাজও হবে এবং প্রশিক্ষণও হবে যথারীতি।

তারপর আমি কয়েক দফা মিটিং করলাম। শ্রমিকের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা করেছি। কিন্তু তারা ছিল খুবই ক্ষিপ্ত। তারা বারবারেই আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে, দোষ লাইন চীফের। আমিও যে বুঝিনি তা নয়। কিন্তু কি করবো "পড়েছি মোঘলের হাতে খানা খেতে হবে এক সাথে "। বুঝলেও বলাতো যাবে না। আমি কিছুটা কৌশল অবলম্বন করলাম। আমি তাদের উপরই দোষ ছুড়লাম। বললাম যে, আমি বুঝলাম মালিকের কিছুটা গাফিলতি আছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী অন্যায়তো করেছেন আপনারা। কেননা আপনারা প্রশিক্ষণে তো আসেননি বরং যারা এসেছিল তাদেরকেও ডেকে নিয়ে গেছেন। তারপর সবাইকে নিয়ে মারামারি করেছেন। যার দরুন ফ্যাক্টরীতে কাজ বন্ধ হয়েছে। আপনারা দায়িত্বে অবহেলা করেছেন এবং আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।
তারপর জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের কমিটি কবে হয়েছে ? তারা বললো ২৫শে ডিসেম্বর/২০১৫ নির্বাচন হয়েছে। তখনই আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম। আপনারাতো ডব্লিউ পিসি কমিটির সদস্য, তাই না ?

বলেনতো ডব্লিউ পিসি কমিটির কাজ কি কি এবং তাদের দায়িত্ব কি? শ্রম আইনের কত ধারায় ডব্লিউ পিসি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ?
বিভিন্ন জনের কাছ থেকে বিভিন্ন উত্তর আসছিল। কিন্তু ততক্ষণে আমি বুঝে গেলাম যে, তারা শ্রম আইনে পিসি কমিটির কাজ সম্পের্কেইতো কিছু জানেনা এবং অন্যান্য শ্রম আইনও সঠিকভাবে জানেনা। আমি ঐ পথেই আগালাম। শ্রম আইনে বিভিন্ন ধারা, বিধি বুঝালাম, ব্যখ্যা করলাম। সাথে ছিলেন এম,আর,খান মজলিস সাহেব। তিনিও পিসি কমিটির কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য কি তা নিয়ে আলোচনা করলেন।

আমি উদাহারণ স্বরুপ পাশ্ববর্তীদেশ ভারতের টাটা গ্রুপের উদাহারণ দিলাম। সেখানে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের কথা বললাম। মালিক-শ্রমিকের সু-সম্পর্কের কারণেই আজ টাটা গ্রুপ বিশ্ব বিখ্যাত। তারা মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনলো এবং বুঝতে পারলো যে, তারাই বেশী অন্যায় করেছে।

সর্বশেষ আমরা মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষ (ডব্লিউপিসি) কে নিয়ে বেলা ৫.০০ ঘটিকায় আলোচনায় বসলাম। যেখানে মালিকপক্ষকে বললাম যে, আপনাদের উচিৎ ছিল প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে নোটিশের মাধ্যমে সকল লাইনচীফকে জানানো যে, ২৮/০২/২০১৬ থেকে পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ হবে এবং যাদেরকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে তাদের নামের তালিকাসহ তারা প্রতিদিন ৯.০০ ঘটিকা হতে ৪.৩০ ঘাটিকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করবে তা জানানো। মালিকপক্ষ এক বাক্যে তাদের দোষ স্বীকার করে নেন এবং ভবিষ্যতে এমন হবে না বলে অঙ্গীকার করেন।

এভাবে কখনও শ্রমিকের পক্ষ কখনও মালিকের পক্ষ নিয়ে শ্রম আইনের মাধ্যমে তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা করে অবশেষে দুই পক্ষকেই তাদের শ্রম আইনের বিষয়ে অজ্ঞতা ও নিজেদের দোষ সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম হই। এভাবে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং একে অন্যর কাছে ক্ষমা চায়, হাতে হাত মিলায়।

ভবিষ্যতে তারা আইনের বাহিরে কোন কাজ করবে না এবং আগামি কাল থেকেই ফ্যাক্টরীতে কাজ করবে এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করবে অঙ্গীকার করে। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ। আমরা নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। ঠিক পরদিন থেকেই ফ্যাক্টরীতে পুরোদমে কাজ হয়েছে এবং ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। শেষের দিন তারা (মালিক-শ্রমিক পক্ষ) এতোটাই আনন্দিত ছিল যে, শ্রম আইনের উপর আরো বেশী বেশী প্রশিক্ষণ আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করলো।

আমরা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তা। যেখানে যে পরিস্থিতি হোক না কেন আমরা আমাদের ধৈর্য্য, শ্রম ও মেধা দিয়ে শ্রম আইনের ভিত্তিতে তা সমাধানের চেষ্টা করব। এটাই আমাদের অঙ্গীকার। শিল্পে মালিক - শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন, সুস্থ্য শিল্প সম্পর্ক বজায়, মোট কথা শ্রম আইন বাস্তবায়ন করাই হোক আমাদের সবার লক্ষ্য। কেননা ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বুঝা যাবে যে, অতীতেও আমরা পেরেছি এবং আগামীতেও পারবো ইনশাআল্লাহ।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

জার্মানীতে Workers Council এবং বাংলাদেশে অংশগ্রহণকারী কমিটি ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহকারী শ্রম পরিচালক
আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর
টঙ্গী, গাজীপুর।

আই.এল.ও কনভেনশনের ৮৭ ও ৯৮ এ সংগঠনের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। শ্রম সমাজকে এগিয়ে নেয়া এবং শ্রমিক অধিকার রক্ষায় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা অপরিহার্য। আবার ট্রেড ইউনিয়নকে নিয়ে কেউ মন্তব্য করে "They know their rights but don't know their responsibility"। কিন্তু তাই বলে তো ট্রেড ইউনিয়ন থেমে যেতে পারে না। এটা ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সামাজিক অধিকার রক্ষায় Social Dialogue এর মাধ্যমে সমাজকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা অপরিসীম।

অংশগ্রহণকারী কমিটি, ট্রেড ইউনিয়নের মত না হলেও কারখানা বা কোন অর্থনৈতিক ইউনিট এ শ্রমিক অধিকার রক্ষায় ইহা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

অংশগ্রহণকারী কমিটি যার দর-কষাকষির ক্ষমতা নেই তথাপি প্রতি মাসে বা দুই মাস অন্তর মালিকের উপস্থিতিতে সভায় শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় ইহা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে যদি ইহাকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হতে স্বাধীনতা দেয়া হয়।

গত বছর জার্মানীতে সরকারী সফরে বিভিন্ন কারখানায় Workers Council পরিলক্ষিত হয় যা অনেকটা বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কমিটির মতোই।

বাংলাদেশে যেমন কোন কারখানায় শ্রমিকের প্রত্যক্ষ ভোটে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত বা নির্বাচিত হয় তেমনি জার্মানীতে কারখানায় শ্রমিকের প্রত্যক্ষ ভোটে Workers Council নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশে এ কমিটির মেয়াদ ২ বছর হলেও জার্মানীতে এর মেয়াদ ৪ বছর।

বাংলাদেশে অংশগ্রহণকারী কমিটি শ্রমিকের বিভিন্ন আইনানুগ অধিকার ও কোম্পানীর সুনাম রক্ষায় কাজ করে তেমনি জার্মানীতেও Workers Council শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থে কাজ করে।

বাংলাদেশে অংশগ্রহণকারী কমিটি যেমন প্রতিমাসে বা ২ মাসে অন্তত: ১টি সভা করে তেমনি জার্মানীতেও Workers Council প্রতিমাসে ১টি সভা করে যেখানে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে Social Dialogue হয়। আর সামাজিক আলোচনা ছাড়া সামাজিক সমস্যার সমাধান কোনভাবেই সম্ভব নয়।

এককভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্রেড ইউনিয়ন জার্মানিতে যার নাম IG-Metal/Textile, যার শ্রমিক সংখ্যা ১০ মিলিয়ন এর বেশী। আর জার্মানীতে ট্রেড ইউনিয়ন হয় সেক্টরভিত্তিক।
যেমন

১. মাইনিং, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কেমিক্যাল এর জন্য একটি ইউনিয়ন।
২. নির্মাণের জন্য একটি ইউনিয়ন।
৩. রেলওয়ের জন্য একটি ইউনিয়ন।
৪. শিক্ষার জন্য একটি ইউনিয়ন।

আর এ ট্রেড ইউনিয়ন গুলোতে শ্রমিক নির্বাচিত হয় Workers Council এ নির্বাচিত শ্রমিক থেকে। একই সেক্টরে যত Workers Council আছে, সেখানে প্রতি ৪ বছর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে ঐ সেক্টর ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হবে, যারা সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মালিকদের সংগঠনের সাথে শ্রমিক অধিকার রক্ষায় Social Dialogue করবে।

সকল ট্রেড ইউনিয়ন থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন গঠন করা হবে যারা সরকার প্রধানেরসাথে রাষ্ট্রীয়ভাবে Social Dialogue করবে।

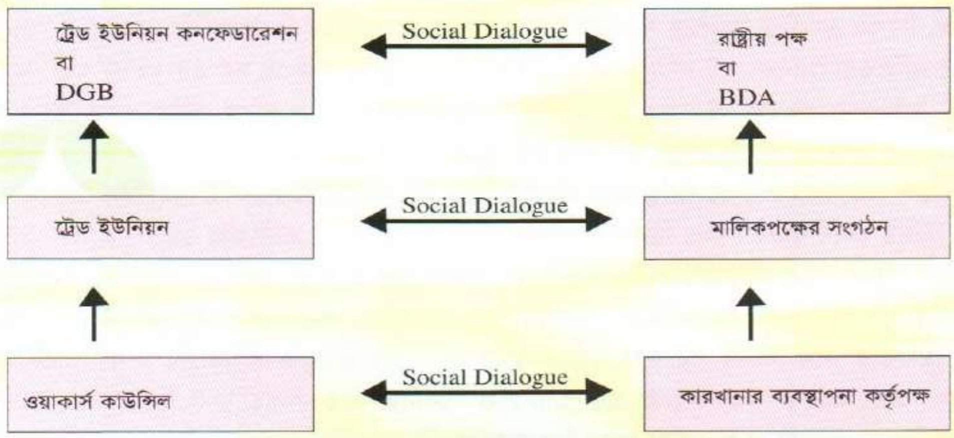

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ধারা ২০৫এ অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের জন্য যেখানে ৫০ জন শ্রমিকের কথা বলা হয়েছে সেখানে জার্মানীতে শ্রমিক সংস্থা ২০ জনের নীচে থাকলেও Workers Council এর কথা বলা হয়েছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিল পরিলক্ষিত হলেও Workers Council ও অংশগ্রহণকারী কমিটির মধ্যে নিম্লোক্ত ক্ষেত্রে দারুণ অমিল পরিলক্ষিত হয়।

(১) কারখানায় শ্রমিক সংস্থা ২০০ জন হলে ১ জন প্রতিদিন ২ ঘন্টা ওয়ার্কাস কাউন্সিলের জন্য সময় ব্যয় করবে এবং মালিক উক্ত ২ ঘন্টার জন্য বেতন কর্তন করবে না।

(২) কারখানার শ্রমিক সংস্থা ৪০০ জন হলে ২ জন নির্বাচিত ওয়াকার্স কাউন্সিল সদস্য প্রতিদিন ২ ঘন্টা সংগঠনের জন্য সময় ব্যয় করবে এবং মালিক পক্ষ ২ ঘন্টার বেতন কর্তন করবে না।

(৩) কারখানায় শ্রমিক সংস্থা ৬০০ জন হলে ৩ জন প্রতিদিন ২ ঘন্টা ওয়ার্কাস কাউন্সিলের জন্য সময় ব্যয় করবে এবং মালিক উক্ত ২ ঘন্টার জন্য বেতন কর্তন করবে না। এভাবেশ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিদিনের জন্য ২ ঘন্টা করে সুবিধা পাওয়া ওয়ার্কাস কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে, যা বাংলাদেশে কল্পনাতীত।

একটি উন্নয়নশীল দেশ আর একটি উন্নত বিশ্ব। বিভিন্ন পর্যায়ে মিল-অমিল থাকলেও মমার্থ একটিই Social Dialogue এর মাধ্যমে শ্রম সমাজের উন্নয়ন। সমাজের রন্ধেরন্ধে অস্থিরতা নিরসনে Social Dialogueএর ভূমিকা অপরিসীম। কার্যকর Social Dialogue এর জন্য শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক, নির্বাচিত, অকুতোভয়, স্বাধীন, শ্রম বান্ধব অংশগ্রহণকারী কমিটির বিকল্প নেই। এখানে অংশগ্রহণকারী কমিটির মাধ্যমে বেতন, বোনাস, ওভারটাইম, কারখানার কর্মপরিবেশ, পেশাগত দূর্ঘটনা, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ছুটি ইত্যাদি শ্রম বিষয়ক সমস্যাসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতিরোধ সম্ভব।

শ্রমিকের সাফল্যের অন্তরালে

মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার
সহকারী শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।

পহেলা মে, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংহতির দিন । ১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোসহ বড় বড় শহরে শ্রমিকেরা দৈনিক আট ঘন্টা কাজ ও শ্রমের ন্যায্য মজুরির দাবিতে সর্বাত্নক ধর্মঘট শুরু করেন। বিক্ষুদ্ধ শ্রমিকেরা মালিকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মিছিল-সমাবেশ করেন। এর আগে শ্রমিকদের সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করতে হতো। দৈনিক ১৪-১৮ ঘন্টা শ্রম দেয়ার পরও শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হতো। শ্রমিকের তিল তিল শ্রমের উপর ভিত্তি করে সভ্যতা গড়ে উঠলেও শ্রমিকেরা বরাবরই ছিল উপেক্ষিত। এমনকি শ্রমিকের নির্দিষ্ট কোন ছুটির দিনও ছিলনা। শোষন- বঞ্চনার প্রতিবাদে শ্রমিকেরা ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে আন্দোলনের সূচনা করে, যা চুড়ান্ত পরিনতির দিকে এগিয়ে যায় ৩ ও ৪ 'মে'তে। শিকাগো শহরের এই শ্রমিক আন্দোলনের পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে কমপক্ষে ১০ জন শ্রমিক নিহত এবং বহু আহত হন। অনেক শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করে দিনের পর দিন আটকে রাখা হয়। গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের মধ্যে ৭ জনকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। শ্রমিক আন্দোলনের এই অধ্যায়কে স্মরনীয় করে রাখার জন্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্যারিস কংগ্রেসের সিদ্বান্ত অনুযায়ী ১৮৯০ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে মে দিবস পালিত হয়ে আসছে।

কাজের সময়সীমা আট ঘন্টা করার দাবিতে বিশ্বের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল বঙ্গদেশেই ১৮৬২ সালের মে মাসে। অর্থাৎ শিকাগো ঘটনার ২৪ বছর আগে রেলওয়ে শ্রমিকেরা ধর্মঘট অংশ নেয়। তাদের দাবি ছিল একই প্রতিষ্ঠানের শ্রম ও কর্মঘন্টা অভিন্ন করা। রেলওয়ের কোন কোন বিভাগের শ্রমিকেরা আট ঘন্টা আবার কোন কোন বিভাগ ১০ ঘন্টা কাজ করতো। এই বৈষম্য দূর করার জন্য হাওড়া রেলষ্টেশনের ১২০০ রেলশ্রমিক ধর্মঘট ডেকেছিল। তারা ১০ ঘন্টার বদলে ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে এই ধর্মঘট বেশ কয়েকদিন বহাল রেখেছিল। কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি মেনে নিয়েছিল। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষন সম্পাদিত সপ্তাহিক "সোম প্রকাশ" পত্রিকায় ২ বৈশাখ, ১২৬৯ বাংলা সন ও ৫ মে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত সংখ্যায় ৩০৫ পৃষ্ঠায় "বিবিধ সংবাদ" শিরোনামে খবরটি ছাপা হয়েছিল। ধর্মঘটের কারনে ছাঁটাই করা হলে নতুন দক্ষ লোক পাওয়া যে সহজবোধ্য হবে না, শাসক ব্রিটিশ সরকার তা উপলব্ধি করেছিল। যে কারনে বঙ্গদেশে শ্রমিকেরা ৮ ঘন্টা কাজের অধিকার পায় রেলওয়েতে। আধুনিক শিল্প শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা কমানোর দাবিতে আন্দোলনের এটাই প্রথম নথিভূক্ত ঘটনা।

৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন শুধু আমেরিকাতে নয় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও হয়েছে । কেবল বাংলাদেশেই ছিল রক্তপাতহীন। ৮ ঘন্টার আগে ১০ ঘন্টা কাজের দাবিতেও আন্দোলন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতকে ইউরোপে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব লগ্ন থেকেই শ্রমজীবী মানুষদের লড়াই করতে হয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং নিজেদের অধিকারের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে ।

বাঁচা -মরার সেই লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকেরা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের বিজয়কেই সুনিশ্চিত করেছে এবং বিশ্ব ইতিহাসে সূচনা করেছে সেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যুগকে ,যা প্রবর্তনে সবচেয়ে অনিচ্ছুক ছিল বুর্জোয়া সম্প্রদায় নিজেরাই। ষোড়শ শতকে র্জামানিতে আনাব্যাপটিষ্টদের আন্দোলন, সপ্তদশ শতকে ব্রিটেনে লেভেলার ও ডিগারদের আন্দোলন এবং অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে সাম্যের জন্য বেরুপন্থীদের আন্দোলন সেই শ্রমজীবী মানুষদেরই প্রতিরোধ, যারা সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের পূর্বসুরী।

এভাবে দেশে দেশে ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকদের রক্তঝরা আন্দোলনের মাধ্যমে মহান মে দিবস এসেছে কিন্তু এর পুরোপুরি স্বার্থকতা সমগ্র বিশ্বে সকল শ্রমিক সমাজ কি পেয়েছে? তারপরও বলা যায় শ্রমিক শ্রেণী যে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছিল , তার সুফল অবশ্যই বিশ্বের শ্রমিকদের কাছে পৌছেছে। শ্রমিকদের জীবন স্তরের উন্নতি দেশ, জাতি ও সমাজের বিকাশ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৮৮৬ সনের শ্রমিকদের জীবন দানের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে -শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার।

শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস নতুন নয়। সব যুগে সব সমাজে এটি ছিল। শ্রমিকদের ঘামে মালিকদের প্রাসাদ অট্রালিকা তৈরী হলেও অনেক শ্রমিককে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়। দিন- রাত শ্রম দিয়েও জীবনের ন্যূনতম চাহিদা তারা পূরণ করতে পারেন না। অনেক সময় শ্রমিক তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য পথে নামতে বাধ্য হয়।

আজ সময় এসেছে শ্রমিকদের সকল আইনানুগ দাবী পূরণে মালিকগণকে সর্বোচ্চ আন্তরিক হতে হবে। তবেই শ্রমিকদের রক্তঝরা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মহান মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়ন হবে।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

আমার পতাকা

মোহাম্মদ আলী খান

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে রক্তেভেজা হে মার্কেট স্কোয়ারের
কঠিন মৃত্তিকা ছিন্ন ভিন্ন করে
শতাব্দী পেরিয়ে আমি আবার এসেছি
এক হাত শূন্যে অন্য হাতে লাল ঝাণ্ডা
বাতাসের কোলে উড়ছে পতাকা- লাল একদম লাল,
এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকার
সুবিস্তৃত জনপদ ঘিরে শোষণ বঞ্চনা আর হাহাকার
বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়ে মিশে আছে মাটির শরীরে,
জোহান্সবার্গের স্বর্ণখনি, রোরস তামার খনি
এশিয়ার রাবার বাগান
মরু বালুকাবেলায় তেলের আধার
ল্যাটিন আমেরিকার কলা গাছের সঘন সারি
বঙ্গোপসাগরে মাছধরা নৌকা,
সবখানে আজ ক্ষুধার যন্ত্রণা,
ঝড়ো হাওয়ার মাতম, বিদ্যুৎ চমকানো, রোদ-বৃষ্টি
ঘর্মাক্ত শরীরে আছে লেপ্টে,
আমাদের ফুসফুসে পোকার নিবিড় আমন্ত্রণ,
আমি তাই লাল পতাকা উড়িয়ে চলেছি এগিয়ে
পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে সেই প্রান্তে,
ঐ লাল পতাকা গুটানোর জন্য আর কতকাল কত
বছর শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে,
পার হতে হবে আর কত গিরি প্রান্তর সাগর
হাওর অরণ্য খেয়াঘাট ছায়াঘন লোকালয়,
আমি আজ কান্ত অশান্ত বিক্ষুব্ধ,
আমি রক্তমাখা লাল পতাকাটি ফেলে
বিপুল পৃথিবী জুড়ে লক্ষ কোটি শ্রমজীবী মানুষের
বঞ্চনার সব অবসান ঘটিয়ে উড়াতে চাই
একটি পতাকা,
সেই পতাকার রঙ হবে শুধু সাদা কেবলই সাদা।

আমাদের নাম

মুহম্মদ কামরুজ্জামান ফিরোজ
প্রভাষক, বাংলা, শিমরাইল ডি এস এন এস আলিম মাদ্রাসা

আমাদের নাম লেখা হয়ে গেছে
পৃথিবীর ইতিহাসে
আমাদের শ্রমে জ্বলজ্বল করে
এই সভ্যতা হাসে।
যুদ্ধ ধ্বংস বার বার এসে
দিয়ে গিয়েছিল হানা
ধ্বংসের থেকে পৃথিবী সাজানো
আমাদের আছে জানা।
যে প্রাসাদে যেই আসনেতে বসে
তোমরা গাইছ গান
সে প্রাসাদ গড়া কর্মযজ্ঞে
আমরা দিয়েছি প্রান।
শ্রম আর ঘামে আমরা শ্রমিক
চির সবুজের দল
আঘাত করেছে শোষকেরা তবু
আমরা ছাড়িনি বল।
পেশী গড়া হাতে
রক্ষা করি যে
স্বাধীনতা আর দেশ
শত আঘাতের চাবুক খেয়েও
আমরা হইনা শেষ।
জেগে থাকি মোরা আকাশের মত
জেগে থাকি দিনরাত
"জয় মানবতা জয় স্বাধীনতা"
শ্লোগানে উঠাই হাত।

নবগানে নবপ্রাণে

উম্মে আছমা শিখা
সহ অধ্যক্ষ
সানফ্লাওয়ার নার্সারী স্কুল, খালিশপুর, খুলনা।

রক্তের বন্যায় তখন ভাসছে স্বদেশ
পিশাচদের হলি খেলা চলছে সর্বত্র
রক্তাক্ত দেশের অলি গলি পথ
জীবন বাঁচাতে উদভ্রান্ত বাঙ্গালী
দিকভ্রান্ত সবাই
ছুটোছুটি শহর হতে গ্রামে...
বুলেটে ঝাঁঝরা বাঙ্গালীর হৃদপিণ্ড
বিবর্ণ সবুজ শ্যামল শস্য ক্ষেত
আহত সাধের বাংলাদেশ... ।

মানচিত্র খামচে ধরে লোলুপ শকুন
ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় ভূখণ্ড।

কেঁদে ওঠে দেশ
কেঁদে ওঠে মাটি
কাঁদে আকাশ বাতাস
কাঁদে দেশের ইঞ্চি ইঞ্চি ভূখণ্ড।

গর্জে ওঠে পোড় খাওয়া মানুষের হুংকার
জেগে ওঠে বাঙ্গালী, দুলে ওঠে দেশ
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানবাত্মা
এবং
একদিন
নবগানে নবপ্রাণে
মুষ্ঠিবদ্ধ শ্লোগানে
বঙ্গবন্ধুর আহবানে
হৃদয়ে জয়বাংলা লালনে
বীরবেশে ঘোষণা
দেশ আমার
বাংলা আমার
স্বাধীনতা আমার।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে নারী শ্রমিকের অধিকার

মোঃ শফিকুর রহমান
সহকারী শ্রম পরিচালক
আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট।

সমগ্র বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা এগিয়ে চলছে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখছে। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সকল নারী পুরুষ সম্মিলিত ভাবে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে। দেশের মোট জনশক্তির প্রায় অর্ধেক নারী। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে প্রায় ৪০ লক্ষ নারী শ্রমিক রয়েছে। ধান উৎপাদনের মোট ২১ টি কাজের মধ্যে ১৭ টি কাজই করে নারী শ্রমিকরা। কৃষি খাতে প্রায় ৯০ লাখ ১১ হাজার নারী কাজ করছে। ২০১০ সালের শ্রম শক্তির জরিপ অনুযায়ী ৯১ লাখ নারী গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সার্বিক মূল্যায়নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নারী শ্রমিকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৮৮৬ সালের ১ মে যদিও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু নারী শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আর একটি স্মরনীয় দিন হল ১৮৫৭ সালে ৮ মার্চ, যা নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃত । এই দিনে নিউইয়র্ক শহরের নারী গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাদের কর্ম পরিবেশ, কর্মঘন্টা ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজপথে নেমে এসেছিলেন এবং তাদের ওপর তথাকথিত পুলিশি নির্যাতন চালানো হয়েছিল। এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৯০ সালে বিভিন্ন দেশ দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় নারী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। ১৮৫৭ সালে ৮ মার্চের প্রভাব ১৮৮৬ সালের ১ মে আরও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যার ফলে এই আন্দোলনে নারী শ্রমিকদেরও অংশগ্রহন ছিল এবং এই দুইটি দিবসই শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজপথে নামার দিন।

নারী, পুরুষ সকল শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য (১৯৯৯ সালে) প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ILO) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার অবদানের জন্য ১৯৬৯ সালে এর প্রতিষ্ঠার ৫০তম বছরে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আই.এল.ও (ILO) এর মোট ১৮৯টি কনভেনশন রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর হতে এখন পর্যন্ত মোট ৩৫ টি কনভেনশন অনসমর্থন করেছে এবং দেশে কার্যকর করেছে।

আই.এল.ও কনভেনশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারী শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ প্রনয়ণ করা হয় এতে সকল শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারী শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় বিশেষ কিছু অধিকার রয়েছে যেগুলো নারী শ্রমিকের মর্যাদারক্ষা, সমমজুরি, মাতৃত্ব, নিরাপত্তা, মতপ্রকাশ ও অংশগ্রহন ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে কোন মহিলা নিযুক্ত থাকলে, তিনি যে পদমর্যাদারই হোন না কেন, তার প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য কেহ এমন কোন আচরণ করতে পারিবেন না যা অশ্লীল কিংবা অভদ্রজনোচিত বলে গণ্য হতে পারে, কিংবা যাহা উক্ত মহিলার শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থী। সার্ভিস বুকে প্রত্যেক শ্রমিকের পিতার নামের সাথে মায়ের নাম সংযুক্ত রাখতে হবে। যদি কোন প্রতিষ্ঠানে চলমান কোন যন্ত্রপাতির বেল্ট চালানো এবং নামানো, তৈলাক্তকরণ অথবা সুবিন্যস্তকরণের কোন কাজ করতে হয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ পরীক্ষা বা চালনা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন পুরুষ শ্রমিক দ্বারা

পরিচালিত হতে হবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার মহিলা শ্রমিক নিয়োগ দেয়া যাবেনা।

মাতৃত্বকালীন সুবিধার মধ্যে রয়েছে কোন মহিলা শ্রমিককে তার সন্তান প্রসবের পরবর্তী ৮ সপ্তাহের মধ্যে কোন কাজ করাতে পারবে না এবং কোন মহিলা নিজের ইচ্ছায়ও কাজ করতে পারবেনা এবং সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী ১০(দশ) সপ্তাহের মধ্যে তার দ্বারা এমন কোন কাজ করাতে পারবেনা যা দুস্কর বা শ্রমসাধ্য অথবা যার জন্য দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে হয়। তবে চা বাগানের শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চা বাগানের চিকিৎসক কর্তৃক যতদিন পর্যন্ত সক্ষমতার সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত শ্রমিক কাজ করতে পারবেন এবং অনুরূপ কাজ যতদিন করবেন ততদিন তিনি উক্ত কাজের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারে নির্ধারিত হারে মজুরি পাবেন, যা প্রসূতি কল্যাণ ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে প্রদেয় হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসূতি শ্রমিককে প্রসব পূর্ব এবং পরবর্তী সেবা ও পরামর্শ প্রদানের ব্যাবস্থা করতে হবে।

গর্ভবর্তী মহিলা শ্রমিকের প্রতি মালিক ও অন্যান্য শ্রমিকের দায়িত্ব হ'ল এমন কোন আচরন বা মন্তব্য না করা যাতে তিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয় বা অপমানিত বোধ করেন, সরকার কর্তৃক ঘোষিত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অথবা তার প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ হয় এমন কোন কাজে নিয়োজিত না করা, প্রয়োজনে ঝুঁকিবিহীন কাজে স্থানান্তর বা পদায়ন করা, কর্মকালীন লিফ্‌ট ব্যাবহারে অগ্রাধিকার প্রদান করা, সন্তান প্রসব উত্তরকালে তার শিশুর দুগ্ধপানের সুযোগ ও পরিবেশ নিশ্চিত করা।

প্রত্যেক মহিলা শ্রমিক তার মালিকের নিকট হতে সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখে পূর্ববর্তী ৮(আট) সপ্তাহ ও সন্তান প্রসবের পরবর্তী ৮(আট) সপ্তাহের জন্য প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাবার অধিকারী হবেন এবং মালিক তা দিতে বাধ্য থাকবে। তবে কোন মহিলা উক্ত সুবিধা পাবে না যদি না মালিকের অধীন তার সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পূর্বে অন্যান্য ছয় মাস কাজ করে থাকেন। এছাড়াও কোন মহিলাকে উক্ত সুবিধা প্রদেয় হবেনা যদি তার সন্তান প্রসবের সময় তার দুই বা ততোধিক সন্তান জীবিত থাকে, এক্ষেত্রে তিনি কোন ছুটি পাবার অধিকারী হলে তা পাবেন।

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য অন্তঃসত্তা মহিলা সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী ৮ সপ্তাহের যে কোন দিন তার সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা আছে তা লিখিত বা মৌখিক নোটিশের মাধ্যমে জানাবে এবং সন্তান প্রসবের পূর্বে উক্ত নোটিশ না দিতে পারলে সন্তান প্রসবের পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত নোটিশ দিবেন এবং মালিক নোটিশ প্রাপ্তির পর সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী ৮ (আট) সপ্তাহের ছুটি দিবেন এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী ৮(আট) সপ্তাহ কর্মে অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দিবেন এবং ৩ দিনের মধ্যে উক্ত সময়ের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা হিসেবে যা প্রাপ্য তা প্রদান করবেন। উল্লেখ যে, উক্ত নোটিশে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী ৩(তিন) মাসের মধ্যে পেশ না করলে তিনি এই সুবিধা পাবার অধিকারী হবেন না। প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার পরিমান নোটিশ প্রদানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসে তার প্রাপ্য মজুরিকে উক্ত সময়ে তার প্রকৃত কাজের দিন গুলি দ্বারা ভাগ করে গড় হারে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান করতে হবে। যদি কোন মহিলা শ্রমিককে সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী (০৬) ছয় মাস এবং পরবর্তী ০৮ (আট) সপ্তাহ মেয়াদের মধ্যে তাকে চাকুরী হতে ডিসচার্জ, বরখাস্ত বা অপসারন করার জন্য অথবা তার চাকুরি অন্যভাবে অবসানের জন্য মালিক কোন নোটিশ বা আদেশ প্রদান করেন এবং এই নোটিশ বা আদেশে যথেষ্ট কারণ না থাকে তা হলে সংশ্লিষ্ট মহিলা প্রাপ্য প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা হতে বঞ্চিত হবেন না।

কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ও মহিলা শ্রমিকের জন্য আলাদাভাবে উপযুক্ত গোসল খানা ও ধৌতকরণ সুবিধা রাখা ও উহা রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানে ২৫ জনের অধিক মহিলা শ্রমিক রয়েছে সেখানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পর্দাঘেরা জায়গায় ব্যবস্থা করা। সাধারনত ৪০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এমন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তাদের ০৬ (ছয়) বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সন্স্থানগণের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত কক্ষের ব্যবস্থা ও তা রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা করতে

হবে। উক্ত কক্ষে যথেষ্ট স্থান সংস্থান, আলো ও বায়ু চলাচলে ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে এবং কক্ষটি শিশুদের পরিচর্যার জন্য অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষন প্রাপ্ত মহিলার তত্ত্বাবধানে থাকবে।

মহিলা শ্রমিকের সীমিত কর্মঘন্টার ব্যবস্থায় বলা হয়েছে কোন মহিলা শ্রমিককে তার বিনা অনুমতিতে কোন প্রতিষ্ঠানে রাত ১০ ঘটিকা হতে পরদিন ভোর ৬ (ছয়) ঘটিকা পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত করা যাবেনা এবং বিধি মোতাবেক নির্দিষ্ট ফর্মে লিখিত অনুমোদন নিতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রম শক্তির বা সদস্যের শতকরা ২০ জন মহিলা থাকলে সেক্ষেত্রে ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটিতে শতকরা ১০ জন মহিলা সদস্য থাকবে। এছাড়াও কোন প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মহিলা শ্রমিক থাকলে সেইফটি কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মহিলা শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে হবে।

চিত্র: বাংলাদেশ শ্রম আইনে নারীর অধিকার

সমকাজের জন্য সম-মজুরি প্রদান করার জন্য বলা হয়েছে যে, কোন শ্রমিকের জন্য কোন মজুরী নির্ধারণ বা নিম্নতম মজুরীর হার স্থীরিকরণের ক্ষেত্রে এই প্রকৃতির বা একই মান বা মূল্যের কাজের জন্য (মহিলা, পুরুষ এবং প্রতিবন্ধী) শ্রমিকগণের জন্য সমান মজুরির নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত কোন বিষয়ে (নারী-পুরুষ- প্রতিবন্ধী) ভেদের কারণে কোন বৈষম্য করা যাবে না।

সার্বিক মুল্যায়নে বলা যায় নারী শ্রমিকের শ্রমের মুল্যায়নে ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ শ্রম আইন মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তার যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে নারীর অধিকার কিভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় এবং প্রতিষ্ঠা করা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। সারাবিশ্বের নারীদের সাথে তালমিলিয়ে আমাদের দেশের নারীরাও সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষনাসহ সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখছে তাই নারীর যথাযথ মযার্দা রক্ষা ব্যতীত চলমান উন্নয়ন অব্যহত রাখা অসম্ভব। তাই এ মে দিবসের চেতনায় সকলের উচিত নারী শ্রমিকের যথাযথ মূল্যয়নের মাধ্যমে দেশের ও বিশ্বের কল্যাণ সাধনে সহায়তা করা।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

গরীবের বস্ত্র

বেগম সুমাইয়া সফি
(জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন)

পরনের বস্ত্র পেলাম না
দাফনের বস্ত্র পেলাম,
অভাগা ইজ্জতের জন্য
জীবন সঁপে দিলাম।
ধনী লোকের বিপনীতে
অনেক বস্ত্র ঝুলে,
আমায় কেন ইজ্জত বস্ত্রে
জীবন নিলো খুলে।
সিয়াম সাধনায় রত ছিলাম
বড় লোকের বাড়ী,
আশা ছিলো সকাল বেলায়
পাবো একটা শাড়ী।
দারোয়ানে গেট খোলে
করে হুড়াহুড়ি
পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে
জীবন গেলো চলি।
বাবু বাচ্চায় ঘরে বসে
করে কান্না কাটি
মাগো তুমি কোথায় গেলে
আস তাড়াতাড়ি।
লাশ হয়ে ফিরলা বুঝি
আমাদের কাছে,
ঈদের দিনে তোমার সন্তান
থাকবে কার কাছে।

১৬

Child Labor in Bangladesh

Mahabbat Hossain
Assistant director of labour

Bangladesh is a densely populated country. Though Bangladesh is a small country, the population is about 160 million. There is scarcity of jobs and some people of the country cannot provide even foods for their children. For this reason, the poor children of Bangladesh are compelled to work, even though these works are highly risky for their health. When it's the time to go to school, they have to work in industries, ship breaking yards, mills etc to meet their needs of food..

According to the Labor Law of Bangladesh 2006, the minimum legal age for employment is 14. According to this law, children under 14 should not be employed as laborers. In RMG sector there is no child labour. but in some sectors specially in informal sectors of the country shows a different picture. It shows that child laborers face the problems like low wages, poor food and also perilous working environment (UNICEF). These problems affect both their physical and mental health, and in this way the rights of children in Bangladesh are being violated . For example, A huge no. of child laborers, whose ages are between 10 and 14, are working in ship breaking, transport, factory- workshop, glass, steel spikes and piles of metal scraps and some other sector's and the children work there from morning to evening, even in bare feet and hands. Therefore, they are highly vulnerable for any accident in this ship breaking yard, but no one pays attention to this immoral fact.

But it is mentionable that the present government is working to avoid the situation, and result is being got very positive. Government is spending huge money for the poor children to encourage them to go to school, and avoid hazardous work. The government has adopted a child labour elimination policy, the objectives of the policy are:

i. Withdrawing working children from different forms of occupations including the hazardous work and the worst forms of child labour;

ii. Involving parents of working children in income generating activities with a view to getting children out of the vicious circle of poverty;

iii. Offering stipend and grant in order to bring the working children back to school;

iv. Extending special attention for the children who are affected by floods, cyclones, tidal bores, riverbank erosions, drought and desertification, etc;

v. Providing special emphasis for indigenous and physically challenged children to bring them back to congenial environment;

vi. Ensuring coordination amongst the concerned stakeholders and sectors functioning for the welfare of working children;

vii. Enacting pragmatic laws and strengthening institutional capacity for their enforcement and.

viii. Raising awareness amongst parents, mass people and civil societies about the harmful consequences of child labour.

Every child preserves the right to enjoy a healthy and natural childhood. Government is determined to preserve child right, and according to the child labour elimination policy govt. is getting success. The people of Bangladesh specially the parents should be aware of the children's future. If we all try to eliminate child labour we will be successful and we will be able to make a healthy society.

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

"বাংলার শ্রমিক"

তানিয়া ইয়াসমিন

বিশ্বের সকল দেশে, সকল কাজে-
সফলতা এনেছে আমার বাংলার শ্রমিক।
ওরা নিখুঁত হাতের ছোয়ায় গড়ছে-
স্বদেশ এবং প্রবাসীর আরাম-আয়েশ।
অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাকে করছে স্বনির্ভর,
দুই হাজার একুশ সালের পরে দেখবে-
তোমার বাংলার দ্বারে ভিন্ন দেশীরা;
আসবে অর্থের বিনিময়ে শ্রম দিতে।
এ বাংলার শ্রমিক তুমি যোগাও
নতুন নতুন কাজের প্রেরণা।
তোমাদের সহসায় মিলবে-
একটি নতুন পৃথিবীর সম্ভাবনা।
প্রিয়জনদের ছেড়ে পরদেশে এসে,
নিজের জীবন বাজি রেখে,
ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সর্বদা থাকে ব্যস্ত?
ভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাজে ওরা ন্যস্ত।
এ বাংলার শ্রমিক পৃথিবীর সকল দেশে,
স্ব-গৌরবে মাথা উঁচু করে কাজ করছে।
শ্রমিক আমার সকল কাজের প্রেরণা,
শ্রমিক না থাকলে পরে-
সুখ-স্বাচ্ছন্দ কে আনবে বাংলার ঘরে?
বাংলার শ্রমিকের কষ্টের বিনিময়ে,
আজ আমরা বিশ্বের দরবারে সফল বাঙ্গালী।
ওদের কষ্টে, অর্জিত হচ্ছে বাংলার মান,
তৈরী পোষাক শিল্পে বিশ্বে পেয়েছে শীর্ষস্থান।
তোমার পারিশ্রমিক নিয়ে আর নেই ভয়,
সমাধান মিলবে দেখ শ্রম আইন দুইহাজার ছয়।

১৬

মে দিবস-গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমাজ বদলের চেতনা

রাজেকুজ্জামান রতন
সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

মানব ইতিহাসে বা প্রকৃতিতে কোন ঘটনাই আকষ্মিক নয়। সাধারণ চোখে দেখলে মনে হয় হঠাৎ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় হয়েছে। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারা যায় প্রকৃতির অভ্যন্তরে পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে ঘটতে ঘটতে এক সময় তার বিপুল শক্তির প্রকাশ ঘটে। সমাজের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আর ক্ষোভ পূঞ্জিভুত হয় তারপর বৃহৎ বিস্ফোরন ঘটে। বঞ্চনা থেকেই সমানাধিকারের আকাঙ্খা জাগে। শোষিত হতে হতে শোষণমুক্তির স্বপ্ন দেখেছে মানুষ। মে দিবসও তেমনি এক স্বপ্নময় পৃথিবী গড়ার সংগ্রামের দিন। যে পৃথিবীতে মানুষ পরিচিত হবে মানুষ হিসেবে। শ্রম শক্তি হচ্ছে প্রকৃতি ও সমাজকে পাল্টানোর প্রধান হাতিয়ার। সেই শ্রমশক্তি মুক্ত হবে শোষণ থেকে আর মানুষ মুক্ত হবে শোষণের শৃঙ্খল থেকে এ আকাঙ্খায় পরিচালিত মানুষেরা সমাজ অভ্যন্তরে যে গতি সৃষ্টি করেছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মে দিবসের লড়াইয়ে।

গুহাবাসী মানুষ থেকে আজকের মঙ্গলগ্রহে অভিযান পরিচালনাকারী মানুষ-সবাই টিকে আছে প্রকৃতি থেকে রসদ সংগ্রহের মাধ্যমে। কিন্ত প্রকৃতিতে বস্তু যেমন আছে তা দিয়ে তো তার চলেনা। তাই বস্তুর উপর শ্রম প্রয়োগ করে তাকে ব্যবহার উপযোগি করতে হয়। পাথর ঘষে ঘষে আগুন জ্বালানো বা পাথর সূচালো করে অস্ত্র বানানো, পশুর চামড়া ছিলে পোষাক বানানো থেকে শুরু করে আজকে মোবাইল প্রযুক্তি বা রকেট প্রযুক্তি সবই তো শ্রমের ফল। শারীরিক শ্রম করতে গিয়েই মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের জন্ম দিয়েছে।

আদিম মানুষ পানিতে ভেলা বাসিয়েছে আর আর্কিমিডিস ভেলা ভেসে থাকার নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। বল্লম ছুড়ে বা তীর ছুড়ে পশু শিকার করতে করতে মানুষের জ্ঞান এগিয়েছে তা পরবর্তীতে নিউটনের গতিসূত্র আকারে সূত্রবদ্ধ হয়েছে। তাই কায়িক শ্রম মানসিক শ্রমের ভিত্তি রচনা করে। আবার মানসিক শ্রম কায়িক শ্রমকে উন্নত করে। যেমন ক্রেন এর আবিষ্কার শ্রমজীবী মানুষের পরিশ্রমকে লাঘব করে জীবনকে সহজ করে। কিন্তু সমাজ শ্রেণিবিভক্ত বলে শ্রমিকের কায়িক শ্রম বা মানসিক শ্রম কোনটাই শ্রমিকের হাতে থাকে না। জীবনধারনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য তাকে তার একমাত্র সম্পদ শ্রমশক্তি বিক্রি করতে হয়। এর পরিপূরক চিন্তার শক্তি দ্বারা শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার সংস্কৃতিও তাই গড়ে উঠলো পাশাপাশি। যেমন, 'কাজ না করলে খাব কি?' বা 'কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে'।

মালিকদের এই চিন্তা দ্বারা শ্রমজীবী মানুষ যেমন আচ্ছন্ন থাকে পাশপাশি আর একটি চিন্তার প্রভাবও দেখা যায়, 'আগে দিও গরুকে ঘাস তারপর করিও চাষ'। প্রকৃতি জগতে যেমন পরস্পর বিরোধী সত্ত্বার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নতুন সত্ত্বার সৃষ্টি হয় সমাজের অভ্যন্তরেও তেমনি পরস্পর বিরোধী চিন্তার দ্বন্দ্বে নতুন চিন্তার বিকাশ ঘটে। চিন্তার দ্বন্দ্বে মানুষ ভাবতে শুরু করলো এত পরিশ্রম করেও শ্রমজীবীদের জীবন মানের উন্নতি হয় না কেন? তাহলে কি মালিকরা শ্রমিকদের শত্রু? সমস্ত জীবন পরিশ্রম করেও শ্রমিকদের জীবনে এত অভাব কেন? অভাবের কারণ বুঝতে না পেরে তাই প্রথমে মেশিন ভাঙ্গা শুরু করলো। কিন্তু এটা তো সমাধান নয়।

সে সময় এঙ্গেলস একটি বই লিখলেন, 'কন্ডিশন ও ওয়ার্কিং মেনস ইন ইংল্যান্ড'। সেখানে তিনি দেখালেন সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরও শ্রমিকের জীবনে কি দুর্দশা। মালিকরা বলছেন আমরা তো বেতন দিচ্ছি। কিন্তু তারপরও শ্রমিক গরীব আর মালিক ধনী হচ্ছে কেন? এর উত্তর খোজা তাই শ্রমজীবী মানুষের জন্য

অত্যাবশ্যক হয়ে পড়লো। মার্কস-এঙ্গেলসের যৌথভাবে লেখা মেনিফেস্টো অব দা কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ হলো ১৮৪৮ সালে। এর পর শ্রমিক আন্দোলন, মালিক হত্যা আর কারখানা ভাংচুর এর পরিবর্তে নতুন দিশা পেল। ১৮৫৭ সালে আমেরিকার নারী শ্রমিকদের ১০ ঘন্টা কাজসহ তিন দফা দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন পরবর্তীতে ৮ ঘন্টা কাজের দাবির ভিত্তি রচনা করেছিল। ১৮৮৬ সালের ৮ ঘন্টা কাজের দাবির অন্তরালে তাই ছিল শ্রমিকদের মানসম্পন্ন জীবনযাপনের আকুতি। শ্রমের ন্যায্য মূল্য যা দ্বারা শ্রমিক তার জীবন যাপন করতে পারবে, ৮ ঘন্টা কাজের পর সে অবসর পাবে, এই ছিল মে দিবসের সংগ্রামের আকাঙ্খা।

আজ বাংলাদেশের ৬ কোটি ১৪ লাখ শ্রমজীবী মানুষ যারা কৃষি খাত, সেবা খাত ও শিল্পখাতে কর্মরত, যাদের বিপুল অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত তাদের কাছে মে দিবস আসে যথাযথ কাজ, ন্যায্য পারিশ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রতিষ্ঠার বার্তা নিয়ে। মে দিবসের চেতনা তাদের কাছে শোষণমুক্তির স্বপ্ন হিসেবে দেখা দেয়। কায়িক শ্রমজীবী ও মানসিক শ্রমজীবী সবাই যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে শোষিত এটা আজ দৃশ্যমান। দৃশ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে তাই মে দিবস আসে বার বার।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

দক্ষ শ্রমিকই অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সাধারণ সম্পাদক
ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব)

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের জীবনে এক রক্তস্নাত দিন। এই দিনটি শ্রমজীবী মানুষ বিজয়ের, বিপ্লবের ও অর্জনের দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। ১৩০ বছরেরও বেশী সময় আগে এই বিজয়ের সূচনা হলেও আজও পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ তার ন্যায্য মজুরি, সামাজিক মর্যাদা ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। যেখানে ৮ ঘন্টা শ্রম, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম ও ৮ ঘন্টা বিনোদনের দাবি নিয়ে মে দিবস সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে এতদিন পরেও তাদের সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মহান মে দিবস উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মরণিকা প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সপ্ত আশ্চর্যের একটি আগ্রার তাজমহল থেকে শুরু করে পৃথিবীর সকল বৈচিত্রময় স্থাপনা কিংবা যত অট্টালিকার কথাই বলা হোক না কেন সব সৃষ্টির পেছনে রয়েছে নির্মাণ শ্রমিকদের শ্রম, ঘাম, মেধা ও বিচক্ষণতার প্রতিফলন। ধনবানদের একটি সুখের ঠিকানা গড়তে আদি থেকে অদ্যাবধি প্রতিটি ইট-পাথরের ভাজে ভাজে রয়েছে নির্মাণ শ্রমিকদের ঘামের ছাপ। কিন্তু দিনশেষে ঐ শ্রমিকরা যখন তার ন্যায্য মজুরী পায় না, শ্রম আইনের অন্যসব অধিকার পায় না তখন তাদের কাছে মে দিবসের বিজয় পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটির মত মনে হয়।

বাংলাদেশে ৩০ লক্ষাধিক নির্মাণ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করা প্রবাসী শ্রমিকের সিংগভাগ নির্মাণ শ্রমিকই সকল বিনির্মাণের মূল কারিগর হলেও আজও নির্মাণ শ্রমিকেরা অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত। এখনো অধিকার আদায়ের জন্য নির্মাণ শ্রমিকদের রাজপথে নামতে হয়। নির্মাণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এখানকার শ্রমিকদের যেমন জীবনের নিরাপত্তা নেই, নেই শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মপরিবেশ। ফলশ্রুতিতে দৈনন্দিন দূর্ঘটনা ঘটেই চলছে। অঙ্গহানী থেকে শুরু করে আজীবন পঙ্গু অথবা মৃত্যুই এদের ঠিকানা। যে নির্মাণ শ্রমিকরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে এমন কি নিজের জীবন দিয়ে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করে অন্যের সুখের আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করে সেই নির্মাণ শ্রমিকের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, আহত-নিহত হলে তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই।

ইমরাত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) দীর্ঘ দুই যুগ ধরে নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু নির্মাণ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবু আমরা গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার একান্ত ইচ্ছায় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতোমধ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের কাজকে নির্মাণ শিল্প হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার কিছু কিছু সুফল নির্মাণ শ্রমিকেরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছে। যেমন নির্মাণ শ্রমিকদের গোষ্ঠি বীমার আওতায় আনা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আহত, অসহায়, অসুস্থ নির্মাণ শ্রমিকদের সাহায্য প্রদান, নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। এসব কর্মসূচিতে নির্মাণ শ্রমিকরা উপকৃত হচ্ছে। যার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার।

কিন্তু বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায় অদক্ষ শ্রমিকদের প্রতারক ও দালাল চক্র বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অবৈধভাবে বিভিন্ন দেশে নিয়ে গিয়ে তাদের কাছে থেকে বিপুল অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়। ঐ সকল শ্রমিকরা দেশের ভিটে-মাটিসহ পরিবারের সহায়-সম্বল বিক্রি করে বিদেশে পাড়ি দেয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রতারক চক্রের খপ্পড়ে পড়ে সর্বশান্ত হয়ে দেশে ফিরে আসে অথবা জেল পর্যন্ত তাদের খাটতে হয়। এমনকি শ্রমিকদের মৃত্যুবরণও করতে হয়। উদ্ভুত পরিস্থিতি উত্তরণে সরকারিভাবে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পেশাগত দক্ষতার ভিত্তিতে বিদেশে প্রেরণ করা জরুরি। এতে একদিকে যেমন রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে বিদেশেও বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। এজন্য বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকেও কার্যকর ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মবাণী ছিল এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পেলেও প্রকৃত পক্ষে শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের মুক্তি মেলেনি। তারা এখনো শোষিত হচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে গেলেও সেখানেও রয়েছে প্রতিবন্ধকতা। একদিকে পুঁজিবাদী ও মুনাফালোভী কতিপয়মালিক গোষ্ঠির শ্রমিক স্বার্থবিরোধী মনোভাব। তারা শ্রমিকদের অধিকার হরণ বা শ্রমিকদের ঠকাতে পারলেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি আদায় হয় বলে মনে করে। অপরদিকে আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রমিক সংগঠনেও এক শ্রেণির সুবিধাবাদী শ্রমিক নেতা রয়েছে যারা কোনভাবেই শ্রমিকের বন্ধু নয়। এরা মালিক বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিকের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। যার কারণে প্রকৃত শ্রমিক সংগঠনগুলো সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না এবং শ্রমিকেরাও বঞ্চিত হয়ে থাকে। এসকল স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদীদের থেকে সাবধান থেকে বা প্রতিহত করে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবেই শ্রমিকের মুক্তি আসবে।

তাই আজ নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য শহর, থানা ও জেলা পর্যায়ে বাসস্থান, প্রত্যেক জেলায় শ্রম আদালত স্থাপন,পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত, পেনশন বীমা স্কীম চালু, দূর্ঘটনায় আহত ও নিহত নির্মাণ শ্রমিক Loss Of Year Earning এর ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান, রেশনিং ব্যবস্থা চালু, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিসহ ১২ দফা দাবী আজ নির্মাণ শ্রমিকদের প্রাণের দাবি।

ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) এর পক্ষ থেকে আমরা উক্ত দাবীসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

"মে দিবসের মর্মবাণী শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

উন্নত দেশ গঠনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২০০৯ থেকে ২০১৬

মিকাইল শিপার
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

দেশে শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ সমুন্নত রাখা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নসহ শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা, বিভিন্ন শ্রম এলাকায় শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত আইন, নীতি, বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন করা, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এর সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা ইত্যাদি হচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজ সমূহের অন্যতম।

একটি দেশের উন্নয়নে শ্রম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাস্তবতার কারণে উন্নত দেশগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তথা শ্রম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় দেশ ও সরকারের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। বিগত মহাজোট সরকারের প্রধান দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী **Vision-২০২১** এর আলোকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, SDG এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম আইনের যুগোপযোগিকরণ, জাতীয় শ্রম নীতি পুনমূল্যায়ণ, ন্যূনতম মজুরী পুনর্নির্ধারণ, শিশু শ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর থেকে ২০১৬ পর্যন্ত মোট ০৭ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে দেয়া হলো।

আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

১। শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনঃ শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন, কমপ্লায়েন্স ও পারস্পরিক সম্পর্কের আইনগতভিত্তি সুদৃঢ় করা, উৎপাদনশীতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখ্যযোগ্য ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে ২০১৩ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগি করা। এ সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। আশা করা যায় সংশোধিত এ শ্রম আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ : সংশোধিত শ্রম আইনের আলোকে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ শ্রম বিধামালা ২০১৫ প্রনয়ণ করা হয়েছে। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শ্রম পরিস্থিতি আরো সুসংহত হবে। এ বিধিমালায় মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব, মালিকের দায়িত্ব এবং শ্রমিকদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৩। শ্রমিকদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধিঃ রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সের সাথে বেসরকারি সেক্টরের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সের সামঞ্জস্য বিধান ও তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য শ্রমজীবী মানুষের দাবীর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় ঘোষণা অনুযায়ী জুন, ২০১০ সালে বেসরকারি সেক্টরের শ্রমিকদের অবসরগ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ২৮ সংশোধন ও কার্যকর করা হয়েছে।

৪। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনঃ চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারে অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বন্দর দু'টির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডক শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বোর্ড বিলুপ্ত করে ২০০৯ সনের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৮৫নং ধারা সংশোধনের মাধ্যমে প্রতি কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বন্দর দু'টি পরিচালনায় অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে এবং সক্ষমতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

৫। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়নঃ দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হলেও আইনের বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় এ আইনের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছিল না। এর প্রেক্ষিতে সরকার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং এ আইনের বিধান স্পষ্টীকরণ ও বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে এবং ১৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত আইনের আলোকে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রমকি কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা ২০১০ সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এর স্থিতি ছিল ৮,৪৪,৪০৫.৩০ (আটলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত পাঁচ টাকা/৩০ পয়সা) টাকা। বর্তমানে এ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে একশত বাইশ কোটি সাতান্ন লক্ষ টাকা হয়েছে।

৬। জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়নঃ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সরকারের একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী জাতীয় শ্রমনীতি থাকা আবশ্যক। গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের এক বছরের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বাধীন সরকার শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেছিল। পরবর্তীতে ১৯৮০ সনেও একটি শ্রমনীতি ঘোষিত হয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যে একটি আধুনিক শ্রমনীতি প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ায় বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৭। শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়নঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০৩ সনের সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩.৪ মিলিয়ন এবং তাদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১.২ মিলিয়ন। ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল ধরণের শ্রম থেকে শিশুদেরকে মুক্ত করে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা এ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। এ নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, (১) ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ সকল ধরনের শিশুশ্রম হতে শিশুদেরকে প্রত্যাহারপূর্বক বাংলাদেশের শ্রমজীবী

শিশুদের জীবনে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন সাধন; (২) শ্রমজীবী শিশুদেরকে দারিদ্রের চক্র হতে বের করে আনার লক্ষ্যে তাদের পিতা মাতাদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ; (৩) শ্রমজীবী শিশুদেরকে স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য বৃত্তি ও আনুতোষিক প্রদান; (৪) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জ্বলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙণ, খরা ও মরুকরণ প্রভৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনা; (৫) আদিবাসী সম্প্রদায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে উপযুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান; (৬) শ্রমজীবী শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত সকল সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় সাধন; (৭) শিশুশ্রম নিরসনে আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ; (৮) শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতা-মাতা, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ; এবং (৯) বাংলাদেশ হতে সকল ধরণের শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ।

৮। শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নঃ জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন কর্মপরিকল্পনা (NPA)-তে নয়টি কৌশলগত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ (১) জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন; (২) শিক্ষা; (৩) স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি; (৪) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধকরণ; (৫) আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ; (৬) কর্মসংস্থান এবং শ্রম বাজার; (৭) শিশু শ্রম প্রতিরোধ এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুর নিরাপত্তা; (৮) সামাজিক এবং পরিবারিক পুনর্মিলন; ও (৯) গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৭১২.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। NPA বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ (১) জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল (NCLWC), (২) বিভাগীয় শিশু শ্রম কল্যাণ কাউন্সিল (DCLWC), (৩) জেলা শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ফোরাম (DCRMF), (৪) উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (UCLMC)। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী NCLWC-এর প্রধান হবেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের কার্যক্রম চলমান।

৯। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১২ প্রণয়নঃ বিশ্বায়নের যুগে দেশের শিল্পায়ন, কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন ও বহিঃবাণিজ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়নঃ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দেশের মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে ৩৭ (সাইত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ National Skill Development Council (NSDC) গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা বৈঠকের অনুমোদনের ভিত্তিতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ জারী করা হয়েছে। নীতিমালায় বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নের সকল উপাদান ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের মধ্যে সুসমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "Time Bound Action Plan" প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১। ব্যক্তিমালিকাধীন বেসরকারী সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১২ প্রণয়নঃ বেসরকারী সড়ক পরিবহন খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০০৫ প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা না থাকায় এ আইনের সুফল শ্রমিকেরা পাচ্ছিল না। ফলে শ্রমিক কল্যাণধর্মী আইনটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি সড়ক শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ প্রণয়ন ঃ বাংলাদেশের গ্রামীণ বর্ধিষ্ণু পরিবার থেকে শুরু করে ক্রমপ্রসারমান নগর জীবনের পারিবারিক আবাসস্থল, মেস এবং ক্ষেত্রবিশেষে ডরমিটরি প্রভৃতি গৃহকর্মীদের কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র। শিক্ষা উপ-বৃত্তি এবং অবৈতনিক নারীশিক্ষার সরকারি কর্মসূচির কারণে শিশুদের গৃহকর্মী হিসেবে কাজে নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা সামগ্রিকভাবে হ্রাস পেলেও দারিদ্র্য-পীড়িত বিশেষ বিশেষ এলাকা (Poverty pocket) থেকে শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োজিত হওয়ার লক্ষে শহরে আসার প্রবণতা অব্যাহত আছে। অন্যদিকে, সাধারণত নগরবাসী মানুষের গৃহের সার্বিক নিরাপত্তা এবং গৃহকর্তা ও গৃহের সদস্যদের প্রতি ইঙ্গিত আনুগত্যের বিবেচনায় নারী গৃহকর্মীদের অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচনা করার ফলে সার্বক্ষণিক গৃহকর্মী হিসেবে নারী গৃহকর্মী বিশেষত কিশোরী বা শিশু গৃহকর্মী নিয়োগের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদানের প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। আনুগত্যপ্রাপ্তির এ মানসিকতার মাঝে বিকৃতিও লক্ষ্য করা যায় যা গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

নির্যাতনের ফলে মৃত্যু বা হত্যা কিংবা আত্মহত্যার মতো কোন কোন ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে সংবেদনশীল মানব সমাজকে চরমভাবে বেদনাবিদ্ধ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনী কাঠামো তৈরীতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠির সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পুর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের শর্ত ও নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। একই সাথে এ নীতি সংবিধানে বিধৃত সমঅধিকার এবং সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে।

১৩। শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়নঃ বাংলাদেশ ২০০১ সালে নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন-১৮২ অনুসমর্থন করেছে। উক্ত কনভেনশনের বিধান (দফা ৪) অনুসারে অনুসমর্থকারী দেশ সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা কিংবা নৈতিকতার পক্ষে হানিকর কাজের তালিকা প্রণয়ন ও সময় সময় পুনঃনির্ধারণ করবে। সে প্রেক্ষিতে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পক্ষে অন্তরায় এমন কাজের তালিকা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে সভা-সেমিনারে আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের খসড়া তালিকা প্রণয়ন করা হয়। যেখানে সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। ৩৮টি কাজকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি তালিকা ১০/০৩/২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে বিজ্ঞপ্তি (এসআরও) ৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে জারী করা হয়। তালিকাটি (বাংলা ও ইংরেজী) পুস্তিকা আকারে মুদ্রণ করা হয়েছে।

১৪। "শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতিমালা" প্রণয়নের উদ্যোগঃ 'শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতি' প্রণয়নের লক্ষ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে গত ১৭/০৭/২০১৩ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ নীতি প্রণয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। নীতিটির খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০৮/২০১৩ তারিখে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে নীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৫। ILO কনভেশন অনুস্বাক্ষরঃ ১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। একই বছরের ২২ জুন বাংলাদেশ ২৯টি আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করে, যা বিশ্বের একটি বিরল ঘটনা। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সনে ১টি এবং সর্বশেষ ২০১৪ সনে আরো ২টি কনভেনশন বাংলাদেশ অনুসমর্থন করে। বাংলাদেশ এ যাবত ৩৫টি আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে যার মধ্যে ৩২টি কনভেনশনই আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে অনুসমর্থিত হয়েছে।

১। **বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল ঃ** শ্রম আইনের ধারা ২৩৪ এর বিধান অনুযায়ী দেশের বিপুল সংখ্যক প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত কোন শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে দৈহিক ও মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে, দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে, মৃতদেহের পরিবহন ও সৎকার, দূরারোগ্য চিকিৎসার জন্য আর্থিকসহায়তা, অপ্রাতিষ্ঠানিক খতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ, বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে অসুস্থ শ্রমিক, দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিক, তাজরীণ ফ্যাশনস লিমিটেডে অগ্নিকান্ড দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবার এবং অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচিতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় মৃত ও আহত শ্রমিকসহ মোট ৩৯৪ জন শ্রমিককে উক্ত তহবিল থেকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রদানকৃত মোট আর্থিক অনুদানের পরিমান ১,৬৭,৬৮,৩৫৫/- (এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশত পঞ্চান্ন) টাকা। এ তহবিল থেকে বর্তমানে নিম্নোক্ত হারে আর্থিক অনুদান দেয়া হচ্ছেঃ

(ক) শ্রমিকদের চিকিৎসা প্রদানকারী বিভিন্ন শ্রম হাসপাতাল, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অথবা দুর্ঘটনা বা পরিবেশগত কারণে আক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নিয়োগ, ঔষধ সরবরাহ ও মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা বা চিকৎসা প্রদান ক্লিনিক বা হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যয় মিটিনোর জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা প্রদান;

(খ) কোন শ্রমিকের সন্তানের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং সরকারি কৃষি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রদান;

(গ) কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করিলে কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এককালীন অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা প্রদান;

(ঘ) মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা এবং জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রদান;

(ঙ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান;

(চ) কোন শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান; এবং

(ছ) কোন শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান।

এ ছাড়া এ তহবিলের অর্থ থেকে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত মোট ৪টি শ্রমিক সংগঠনকে (ইমরাত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ-ইনসাব, বাংলাদেশ নির্মাণ শ্রমিক লীগ-বানিশল, ফুলবাড়ীয়া রাজমিস্ত্রি সমাজ কল্যাণ সমিতি এবং বাংলাদেশ মটরযান মেকানিক ফেডারেশনকে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা স্কিমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। গত ১৮/১১/২০১৩ তারিখ থেকে উক্ত গোষ্ঠী বীমা স্কিম চালু করা হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক প্রতি শ্রমিকের বার্ষিক প্রিমিয়াম বাবদ ১৩০০/- টাকার মধ্যে ৮৫০/- টাকা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে জীবন বীমা কর্পোরেশনকে পরিশোধ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৪০৫ জন শ্রমিককে গোষ্ঠী বীমা স্কিমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত তহবিল থেকে জীবন বীমা কর্পোরেশনকে গোষ্ঠী বীমার প্রিমিয়াম বাবদ এ পর্যন্ত ৩১,৬৯,৬৫০/- (একত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গোষ্ঠী বীমাভুক্ত ১০ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করায়

তাদের প্রত্যেক নমিনিকে বীমার অর্থ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা করে পরিশোধ করা হয়েছে। গোষ্ঠী বীমাভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

২। শতভাগ রপ্তানীমূখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীগণের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিলঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩২ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর ২১৮ বিধি অনুযায়ী শতভাগ রপ্তানীমূখী শিল্প সেক্টর বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের জন্য ত্রিপক্ষীয় মতামতের ভিত্তিতে এ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণার্থে গঠিতব্য কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানী মূল্যের শতকরা ০.০৩ (দশমিক শূন্য তিন) ভাগ অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি জমা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে এ তহবিলে প্রতি বছর প্রায় ৭৫ কোটি টাকা জমা হবে। এটি শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জমাকৃত অর্থ থেকে রপ্তানীমূখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীগণ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।

৩। অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমঃ ILO এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে গত ১৬-০৩-২০১৩ তারিখে তৈরী পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনার কারণে তৈরী পোশাক শিল্পে ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত কর্মপরিকল্পনায় ভবন নিরাপত্তা সংযুক্ত করে গত ২৫-০৭-২০১৩ তারিখে National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrety in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh গৃহীত হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় আইন ও নীতি সংক্রান্ত, প্রশাসনিক সংক্রান্ত এবং প্রায়োগিক কার্যাবলী সংক্রান্ত তিনটি মূল ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধিনে BUET, ACCORD ALLIANCE এর মাধ্যমে সর্বমোট ৩,৭৪৬টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

৪। Better Work Programme ঃ ILO এর সহায়তায় তৈরী পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। এতুদ্দেশ্যে গত ২২/১০/২০১৩ তারিখে আনুমানিক ৩০০টি পোষাক কারখানায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম আধুনিকায়ন, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং তৈরী পোশাক শিল্পের প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিককে কারখানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৫। ডিজিটাল কার্যক্রমঃ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসুচির আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে অন্যদিকে কাজের গতিশীলতা বাড়বে এবং সময়ের অপচয় কমবে। এ ছাড়া একটি Publicly Accessible Database এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ৩,৭৪৩টি রাপ্তানীমূখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৬। গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরী নির্মাণঃ গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্টগ্রামে বালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জে বন্দরে ২টি ডরমিটরী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প ২টির ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। সরকারের গৃহায়ণ তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ ও এডিবি বরাদ্দ নিয়ে এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। **পিপিপি এর আওতায় ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণঃ** শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে পিপিপি এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ ও টংগীতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও কমার্শিয়াল সেন্টার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে পরামর্শক নিয়োগের কাজ চলছে।

৮। **বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ তহবিলঃ** তৈরী পোষাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২% সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ তহবিল ও বিজিএমইএ এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৯। **নিম্নতম মজুরি নির্ধারণঃ**

(ক) রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প সেক্টরের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণঃ বিগত মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১০ গঠন করে। কমিশনের সুপারিশের আলোকে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৬ (ষোল)টি ধাপে সর্বনিম্ন ২,৪৫০/-(দুই হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা হতে ৪,১৫০/-(চার হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩,৫০০/-(তিন হাজার পাঁচশত) টাকা হতে ৫,৬০০/-(পাঁচ হাজার ছয়শত) টাকায় মজুরি স্কেল ও ভাতা/প্রান্তিক সুবিধাদি নির্ধারণ করে পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরির শর্তাবলী) আইন, ২০১২ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এ ছাড়া সরকার কর্তৃক জাতীয় বেতন কাঠামো, ২০১৫ ঘোষণার পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপিত রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১৫ গঠনের অর্থনৈতিক সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির অনুমোদন লাভ করেছে।

(খ) বেসকারী শিল্প সেক্টরে নিম্নতম মজুরি ঘোষণাঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর আওতায় ঘোষিত মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ)টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৮ (আটত্রিশ)টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ/ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৪(চার)টি সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণের কার্যক্রম চলমান।

(গ) গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণাঃ ২০০৯ সনে সরকার ক্ষমতায় এসে ২০১০ সনে দেশের শ্রমঘন ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী RMG সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ১৬৬২ টাকা হতে ৮২% বৃদ্ধি করে ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা পুনঃনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করেছে। পরবর্তীতে পূণরায় ২০১৩ সনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা হতে ৭৭% বৃদ্ধি করে ৫,৩০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

(১) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC)ঃ বর্তমান সরকার বাংলাদেশের বিপুল শ্রম শক্তির দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও কর্মমুখী শ্রম শক্তিতে পরিণত ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুমোদন করেছে। এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকার দেশের সরকারি-বেসরকারি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ এবং দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদা মাফিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) গঠন করেছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলকে সহায়তার নিমিত্ত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সরকারি বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে 'এক্সিকিউটিভ কমিটি অব ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (ECNSDC) গঠন করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে NSDC এবং ECNSDC-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য NSDC-সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বতমানে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে এ সচিবালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারে বিকাশমান এবং পরিবর্তনশীল পেশাগত দক্ষতা যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার জন্য

সরকার জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো অনুমোদন করেছে এবং এর আওতায় দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম চালু করেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের বাস্তবমুখি কার্যক্রম, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং অর্থায়ন করছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স এবং ডিপ্লোমা কোর্সের কারিকুলাম যুগপোযোগীকরণ, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, ল্যাবের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন, এ্যাসেসর তৈরি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (Training of Trainer) পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning) শিক্ষানবিশী (Apprenticeship)'র মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সেক্টর ভিত্তিক শিল্প দক্ষতা পরিষদ (Industry Skills Council) গঠনসহ দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল এর মাধ্যমে পোষাক শিল্পসহ সকল সেক্টরের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বহুমুখী কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত কয়েকটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং কারিগরি শিক্ষা বিদ্যালয় ও কলেজে গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল এর নির্দেশনায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এযাবৎ ২৬ (ছাব্বিশ) টি সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে NTVQF (National Technical and Vocational Qualification Framework) এর আওতায় দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

দেশে এবং বিদেশে অনেক ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থেকে কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। কিন্তু তাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি না থাকায় চাকুরী ও যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রাপ্তিতে অসুবিধা হয়। এমনকি তাদের সামাজিক স্বীকৃতিও নেই। এনএসডিসি'র পরামর্শ ও নির্দেশনায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধায়নে ৫০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত Assessment Centre এর মাধ্যমে সার্টিফাইড এসেসর দ্বারা তাদের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক যোগ্যতা অনুযায়ী Recognition of Prior Mearning (PRL) সনদ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪,০০০ ব্যক্তিকে সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে তারা দেশে বিদেশে দক্ষ শ্রমশক্তি হিসাবে কর্মসংস্থান ও যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছেন।

(২) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI) ঃ শ্রম পরিদপ্তরের অধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় শহরে চারটি IRI স্থাপনের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সময় পরিসরে এ ৪টি IRI-তে ৩৭৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১৩,০৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন শীর্ষক প্রকল্পঃ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির ১ম পর্যায় ২০০০-২০০৫ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রিন্টিং, বই বাঁধাই, ট্যানারী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ওয়েল্ডিং, অটো মোবাইল ওয়ার্কশপ ইত্যাদি খাতে ঝুঁকিপূণ কাজে নিয়োজিত ১০,০০০ শিশুকে প্রত্যাহার করে তাঁদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ ছাড়া ৫০০০ শ্রমজীবী শিশুর পিতা-মাতাকে ৩.৫৬ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ৩০,০০০ হাজার শ্রমজীবী শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করে তাঁদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে গণসচেতনামূলক পোস্টার, পুস্তিকা তৈরী করে বিতরণসহ ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে, যার আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাসহ সাভার, কেরানিগঞ্জ, টঙ্গী শিল্প এলাকা , গাজীপুর , নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর জেলা সদর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, কক্সবাজার, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, বগুড়া, পাবনা , রংপুর এবং পঞ্চগড় জেলা সদর এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ৫০,০০০ হাজার শিশুকে প্রত্যাহার করে তাঁদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে গণসচেতনামূলক পোস্টার, পুস্তিকা তৈরী করে বিতরণ করাসহ ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রকল্পটি ৪র্থ পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪) "Strengthening of Compliance Level of Labour Laws Across the Shrimp Value Chain in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণঃ রপ্তানিমূখী চিংড়ি শিল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজার বিশেষ করে ইউরোপিয়ান বাজারে বাংলাদেশের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে।

নারী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম

(১) Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ ঃ উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে RMG সেক্টরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ৩২৬ কোটি (তিনশত ছাব্বিশ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩টি এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরদি) ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলে দেশের উত্তরবঙ্গের (লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম,নীলফামারী এবং গাইবান্ধা) দারিদ্রপীড়িত এলাকার ১০,৮০০ (দশ হাজার আটশত) জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

(২)"প্রোমোশন অব রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ্, রিপ্রোডাক্টিভ রাইট, জেন্ডার ইকোয়ালিটি এন্ড প্রিভেনশন অব এইচআইভি/এইডস ইন টি প্ল্যানটেশন কমিউনিটিজ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় UNFPA-এর অর্থায়নে জানুয়ারি, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে ৫৪৯.০০ লক্ষ (পাঁচ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের ৬২ (বাষট্টি) টি চা বাগানে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের সাধারণ স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাসহ এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

(৩) প্রোমোটিং জেন্ডার ইকুয়্যালিটি এন্ড প্রিভেনটিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এ্যাট ওয়ার্কপ্লেস শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্পেন সরকারের অর্থায়নে ২৯৯.২০ লক্ষ (দুই কোটি নিরানব্বই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ILO কর্তৃক জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে এ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের Sexual and Non Sexual harassmen ঃ কমানো, মহিলা শ্রমিক/ চাকুরিজীবীদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও Violence against Women বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) প্রোমোশন অব রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ্, জেন্ডার ইকোয়ালিটি এন্ড উইমেন'স এমপাওয়ারমেন্ট ইন দি গার্মেন্টস সেক্টর শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় UNFPA-এর অর্থায়নে ৫০৩.০০ লক্ষ (পাঁচ কোটি তিন লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৬ হতে ডিসেম্বর' ২০১১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পে ৪৫,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার) নারী শ্রমিককে স্বাস্থ্য সচেতন করে গড়ে তোলা হয়েছে।

(১) ILO এর ৯৮ তম আন্তর্জাতিক শ্রম সংম্মেলনে বাংলাদেশের সভাপতিত্ব করণঃ ২০০৯ সালে ৭ থেকে ২২ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত ILO এর ৯৮ তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশ সভাপতির আসন অলংকৃত করার দায়িত্ব পায়। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি।

(২) চাইল্ড লেবার ইউনিটঃ Urban Informal Economy (UIE) programme of the project of support to the time bound programme towards the elimination of worst forms of child labor in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং-এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (সিএলইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব এই ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম ইউনিট অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে।

(৩) যানজট নিরসন এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গৃহীত কার্যক্রম ঃ যানজট নিরসনে এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের কৌশল হিসেবে ঢাকা মহানগরীর দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করে সাপ্তাহিক ছুটির জন্য এলাকা ভিত্তিক পৃথক পৃথক দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে যানজট এবং বিদ্যুৎ সমস্যায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তাছাড়া দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও জনগনের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে সরকার সকল দোকানপাট, মার্কেট, শপিংমল ও বিপনীবিতানসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার সময় সন্ধ্যে ৮.০০ টায় নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।

(৪) গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ঃ গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে স্থিতিশীল পরিবেশ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ জন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে ৫ টি সভায় মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত গুলো বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত কমিটি পোশাক শিল্পে ভবন ও অগ্নি-নিরাপত্তা বিষয়ক এবং তৈরী পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ বিষয়ক দুইটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। ফলে গার্মেন্টস সেক্টরের অগ্রগতির অন্তরায়সমূহ নিরসন করে কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।

(৫) Standing Committee গঠন ঃ দেশের তৈরী পোশাক কারখানাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ শিল্পে নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ সুরক্ষা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীকে সভাপতি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে সহ-সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি Standing Committee গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৬) ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি গঠন ঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি কোন শ্রমঘন এলাকায় বা কোন কারখানায় শ্রম অসন্তোষের সম্ভাবনা দেখা দেয়ার আগে বা পরে উক্ত এলাকার কারখানার মালিক, শ্রমিক নেতা ও সংশ্লিষ্ট কারখানার শ্রমিকদের সমন্বয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন করে থাকে। এছাড়াও আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটি সমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

(৭) আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটি গঠন ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার

শ্রমঘন এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যদের সভাপতিত্বে ৯টি আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটি রয়েছে। কমিটির আওতাধীন এলাকায় কোন শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে স্থানীয় পর্যায়ে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অসন্তোষ নিরসন করে থাকে।

(৮) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ ঃ তৈরি পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প সেক্টরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। উন্নীত হওয়ায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর ১ম পর্যায়ে ২৩টি জেলায় ৯৯৩ জন অনুমোদিত জনবল নিয়ে কাজ শুরু করেছে। পূর্বে এর জনবল ৩১৪ জন ছিল। এ ছাড়া ইতোমধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রম পরিদপ্তরের ক্ষমতা ও জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৯) কারখানা পরিদর্শন ঃ গার্মেন্টস কারখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক গার্মেন্টস অধ্যুষিত জেলায় অধিক সংখ্যক পরিদর্শক পদায়ন করা হয়েছে। গার্মেন্টস কারখানাসমূহ পরিদর্শনের জন্য মোট ৫০টি টিম কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪ সালে ২২৬৯টি, ২০১৫ সালে ২৫২৭টি এবং মার্চ/২০১৬ পর্যন্ত ৬২৪টি গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অমান্য করায় শ্রম আদালতে ২০১৪ সালে ২১৬টি, ২০১৫ সালে ২১৩টি এবং মার্চ/২০১৬ পর্যন্ত ১২৩টি মামলা রুজু করা হয়েছে।

(১০) সমীক্ষা কার্যক্রম ঃ গার্মেন্টস সেক্টরে এলাকা ভিত্তিক গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা, মোট শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানসহ এ সেক্টরকে বিশ্বের এক নম্বর শিল্প সেক্টরে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কার কি করণীয় তা নির্ধারণের লক্ষ্যে দেশের খ্যাতিমান সংস্থা BIDS এর মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সরকারী অর্থায়নে একটি স্টাডি করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে BIDS তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

(১১) শিশুশ্রমের পরিসংখ্যান ঃ বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশুদের শ্রমে নিয়োগের হার অনেক বেশী। আইএলও-এর সহায়তায় বিবিএস কর্তৃক শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৩ সালের শিশুশ্রম সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩.৪ মিলিয়ন এবং তাদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১.২ মিলিয়ন।

(১২) জার্মানির সাথে সহযোগিতা চুক্তি ঃ বাংলাদেশে জাতীয় কর্মসংস্থানে দুর্ঘটনা বীমা ব্যবস্থা বিষয়ক একটি আইনি কাঠামো স্থাপনে বিগত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জার্মানির ডিজিইউভি ও জিআইজেড বাংলাদেশ এর মধ্যে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

(১৩) ডেনমার্ক সরকারের সাথে সমঝোতা চুক্তি ঃ RMG সেক্টরে কর্মপরিবেশ বিশেষতঃ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতার বিষয়ে বিগত ১৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ডেনমার্কের সরকারের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর হয়।

(১৪) সুইডেন সরকারের সাথে সহযোগিতা চুক্তি ঃ RMG সেক্টরে সামাজিক মতবিনিময়/বির্তক ও শিল্পে সুসম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প চালুকরণে বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সরকার এবং সুইডেন সরকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

১। **শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ** ঢাকাস্থ বিজয় নগর এলাকায় ২০ শতাংশ জমির উপর একটি ২৫ তলা "শ্রম ভবন" নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৬৩ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে ভবন নির্মাণের পাইলিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

২। **কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ০৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্পঃ** এই প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নীতকৃত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ০৯টি জেলায় কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গাজীপুর জেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৭২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

৩। **চেইঞ্জিং নর্মস অব গার্মেন্টস এমপ্লইজ প্রকল্পঃ** এ প্রকল্পের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীর জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি, মিডলেভেল ম্যানেজমেন্ট এর জন্য প্রশিক্ষণ, বিজিএমইএ ও সংশ্লিষ্ট কারখানার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ডাক্তার, নার্স ও ফার্মাসিস্ট প্রমুখের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ইত্যাদি কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ কাল ডিসেম্বর ২০১৬। এ পর্যন্ত ৪০টি কারখানায় ৪১০টি ব্যাচে ২০,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আরো ২৯০টি ব্যাচে ১৪,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ০৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

৪। **প্রমোটিং ফান্ডামেন্টাল রাইটস এ্যাট ওয়ার্ক এন্ড লেবার রিলেশনস ইন এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ প্রকল্পঃ** এ প্রকল্পের মাধ্যমে গার্মেন্টস, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ও চামড়া শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে লেবার রাইটস, শ্রম আইন ও শ্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা।

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

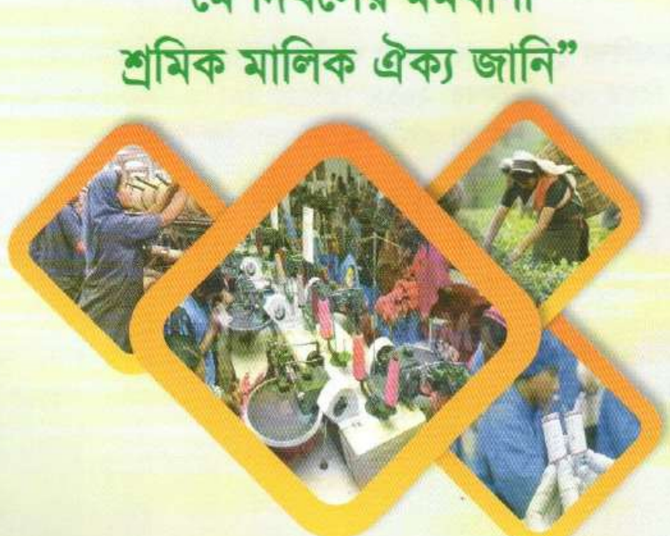

আহবায়কের মাননা

বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের কাছে মে দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। সারা দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১লা মে সংগ্রাম ও চেতনায় উদ্বেলিত, অনুপ্রাণিত হওয়ার দিন। বিশ্বব্যাপী এ দিনটি পালিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের দীপ্ত শপথ গ্রহণের জন্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বাংলাদেশেও সরকারিভাবে দিবসটি পালিত হচ্ছে।

মে দিবস শিক্ষা দেয় ঐক্য, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার। এসব আদর্শ যে কোন দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধশালী ও স্থিতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মে দিবসের এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেই মহান মে দিবস উদযাপন স্বার্থক হবে।

মে দিবসের অনুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে মহান মে দিবসের তাৎপর্য ও গৃহীত কর্মসূচীর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় স্মরণিকা প্রকাশের জন্য সদয় নির্দেশনা এবং উপদেশ দিয়ে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

এবারের মহান মে দিবস উদযাপনে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, গ্রামীণ ফোন লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ, প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ (সিটিসেল), বাংলালিংক, এয়ারটেল, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ, থারমেক্স গ্রুপ লিঃ, বাটা সু কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ, বসুন্ধরা গ্রুপ, কোটস বাংলাদেশ লিঃ, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লিঃ, নেসলে বাংলাদেশ লিঃ, নোভারটিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড, আকিজ গ্রুপ, রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেল, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ, দি ওয়েস্টিন হোটেল ঢাকা, বি,আর,বি, ক্যাবলস লিঃ, ওয়াল্টন বাংলাদেশ লিঃ, লিনডে বাংলাদেশ লিঃ, নীট কনসার্ন লিঃ, মেট্রো গ্রুপ, দাদা (ঢাকা) লিঃ, সিন সিন লিঃ, অবন্তি গ্রুপ, ফকির ফ্যাশন, মেটাডোর বল পেন ইন্ডাঃ লিঃ, বার্জার পেইন্ট লিঃ, পিএইচপি, প্রাণ গ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, ইনসেপ্টা, ফকির নিটিং লিঃ, মাইক্রোফাইবার লিঃ, মেরিকো বাংলাদেশ লিঃ, প্যানটেক্স এবং ডিবিএল গ্রুপ আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সহযোগিতা করায় তাদের প্রতিও রইল আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন স্মরণিকা প্রকাশে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তথাপি এ প্রকাশনায় নানা অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘাটতির বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। নানা ব্যস্ততার ভেতরও যাঁরা লেখা দিয়ে স্মরণিকা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা। স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া, স্মরণিকা প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এ, বি, এম, সিরাজুল হক
আহবায়ক
স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদ

স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদ

জনাব এ,বি,এম, সিরাজুল হক উপ-সচিব	আহবায়ক
জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া উপ-সচিব	সদস্য
জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা উপ-সচিব	সদস্য
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপ-সচিব	সদস্য
জনাব মুহাম্মদ তাইয়েবুল ইসলাম উপ-সচিব	সদস্য
জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী উপ-প্রধান	সদস্য
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির সিনিয়র সহকারী প্রধান (শ্রম)	সদস্য
জনাব এস, এম, এনামুল হক যুগ্ম-শ্রম পরিচালক	সদস্য
জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া উপ-মহাপরিদর্শক	সদস্য
জনাব মঞ্জুর কাদের খান উপ মহাপরিদর্শক	সদস্য
জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম সহকারী শ্রম পরিচালক	সদস্য

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

সিটিজেন চার্টার

শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম পরিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সহ অন্যান্য শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ পরিদপ্তর শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরসহ তার অধীন ৪৯টি দপ্তরে ১৭৬ জন কর্মকর্তা এবং ৫৩৬ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ৭১২ জনবল কর্মরত রয়েছে। একজন শ্রম পরিচালক এ পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান সেবাসমূহ

- ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;
- অংশগ্রহণ কমিটির তত্ত্বাবধান করা;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;
- ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;
- এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন নিষ্পত্তি করা;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ করা;
- আই.এল.ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই.এল.ও কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরী প্রশাসন, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা;

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শ্রম আইন তার অধীনে প্রণীত বিধিমালার আলোকে শ্রম পরিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়, ৪ টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ১১টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে সরাসরি যোগযোগ করে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ শ্রম পরিদপ্তর প্রদত্ত নিন্মোক্ত সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারেন ঃ

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
১।	ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রেজিষ্ট্রেশন ঃ (ক) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন	☐ কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান সমূহপ্রতি পালন সাপেক্ষে রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন্সের নিকট দরখাস্ত করবেন (শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক) ☐ যদি শ্রম পরিচালক উক্তদরখাস্তে অত্যাবশ্যক কোন তথ্যের অসম্পূর্ণতা দেখতে পান তাহলে তিনি দরখাস্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে আপত্তি সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নকে লিখিত ভাবে জানাবেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন তা প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপত্তি জবাব দিবে। ☐ শ্রম পরিচালক কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সন্তোষজনক ভাবে মিটানো হলে নির্ধারিত রেজিষ্টারে তা রেজিষ্ট্রি করা হবে এবং রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিষ্ট্রিকরণ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হবে। ☐ যদি আপত্তি বা আপত্তিসমূহ সন্তোষজনক/আইনানুগভাবে মিটানো না হয়, তাহলে রেজিষ্ট্রিকরণের দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করা হবে। ☐ যে ক্ষেত্রে শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক কোন দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করেন অথবা আপত্তি মিটানোর পরেও আইনে উল্লিখিত ৬০ (ষাট) দিন সময়সীমার মধ্যে রেজিষ্ট্রি প্রদান না করেন সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন উক্তরুপ প্রত্যাখ্যানের তারিখ অথবা উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখের পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রম আদালতে আপীল করতে পারে। ☐ শ্রম আদালতে আপীলটি শুনানীর পর তা উপযুক্ত বিবেচনা করলে রায়ের কারণ লিপিবদ্ধ করে শ্রমপরিচালক/সংশ্লিষ্ট যুগ্ম শ্রম পরিচালককে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে অথবা আইনানুগ অসম্পূর্ণতার কারণে আপীলটি খারিজ করতে পারবে। ☐ শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আদালতের আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রম আপীল আদালতে আপীল দায়ের করতে পারবে এবং এ বিষয়ে আপীল আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।	শ্রম পরিচালক ও যুগ্ম শ্রম পরিচালকের কার্যালয় সমূহ (শেষ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য)
	(খ) ফেডারেশন	☐ একাধিক বিভাগের একই প্রকৃতির পাঁচ বা তার অধিক ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে একটি ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হয়।	
	(গ) জাতীয় ফেডারেশন	☐ বিভিন্ন প্রকৃতির বিশ বা তার অধিক ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে একটি জাতীয় ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হয়।	
	(ঘ) কন-ফেডারেশন	☐ জাতীয় ভিত্তিক দশটি ফেডারেশন নিয়ে কন-ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হয়।	
	(ঙ) ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন	☐ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের বিধানসমূহ যেরূপ প্রযোজ্য হয় ফেডারেশনের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে এবং ৬০ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনটি নিষ্পত্তি করতে হয়।	

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন /প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
		(১) একক ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন ফি ৫০০/- টাকা (২) শিল্প ভিত্তিক ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন ফি ১০০০/- টাকা মাত্র (৩) জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন ফি ৩০০০/- টাকা (৪) জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন ফি ৫০০০/- টাকা।	
২।	অংশগ্রহণ কমিটি গঠন	☐ যে সকল প্রতিষ্ঠানে অনূন্য ৫০ জন স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী নিয়োজিত আছেন সে সকল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ☐ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এবং শ্রমিক কর্মচারী/সিবিএ ইউনিয়নের মধ্যে হতে প্রতিনিধির সমন্বয়ে (উক্ত কমিটিতে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি সংখ্যা মালিকের সংখ্যার কম হবে না) গঠিত হবে। ☐ যে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন বা সিবিএ নেই সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শ্রম পরিচালককে অবহিত করে নির্বাচনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি নির্ধারণ করিতে হবে। ☐ অংশগ্রহণ কমিটি কর্তৃক ০২ মাস অন্তর অন্তর সভা অনুষ্ঠান করা এবং সভার সিদ্ধান্ত ০৭ দিনের মধ্যে শ্রম পরিচালককে অবহিত করতে হবে।	শ্রম পরিদপ্তর
৩।	সিবিএ নির্ধারণ	☐ কোন প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে তাদের মধ্যে থেকে একটি ইউনিয়নকে গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে সর্বোচ্চ ১২০ দিনের মধ্যে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) ঘোষণা করা হয়।	শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক আইনের বিধান মোতাবেক স্ব স্ব আওতাভুক্ত এলাকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সিবিএ নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ
৪।	শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	☐ কোন মালিক অথবা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক (একে অপরের বরাবরে) শিল্প বিরোধ উত্থাপন করতে পারে। ☐ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ইচ্ছুক দু'পক্ষের (মালিক ও শ্রমিক) মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে উত্থাপিত শিল্প বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য ১৫ দিনের মধ্যে সালিস (কনসিলিয়েটর) এর নিকট আবেদন প্রেরণ করতে হবে। ☐ সালিস (কনসিলিয়েটর) কর্তৃক বিরোধটি প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে বিরোধের পক্ষগণকে নিয়ে সালিস বৈঠক করবেন ১৫ দিনের মধ্যে এবং আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিরোধটির নিষ্পত্তি হবে। ☐ সালিস নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে এবং উভয় পক্ষ সম্মত হলে কোন মধ্যস্থতাকারীর নিকট বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে। উভয় পক্ষ সম্মত না হলে সালিস ব্যর্থতার ৩ দিনের মধ্যে ব্যর্থতার প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। ☐ মধ্যস্থতাকারীর প্রদত্ত রোয়েদাদ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং রোয়েদাদ প্রদানের কপি উভয় পক্ষ ও সরকারকে প্রদান করতে হবে। সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রম আদালতে যেতে পারে।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর
৫।	শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা	☐ দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে আসছে।	সংশ্লিষ্ট শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহ

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন /প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
		☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং পরিবার-পরিকল্পনা সেবা, চিত্তবিনোদন সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি শ্রম কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। ☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ থেকে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যগণ রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের মাধ্যমে বিনামূল্যে সকল কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে চিকিৎসা পেয়ে থাকেন। ☐ শ্রমিক পরিবারকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবার পরকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী প্রাপ্তির বিষয়ে সহায়তা করা হয়। ☐ কেন্দ্রের শ্রম কল্যাণ সংগঠকগণ শ্রমিকদের সংগঠিত করেন এবং শ্রমিক কলোনীগুলো পরিদর্শন করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। ☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন প্রকার চিত্ত বিনোদন সামগ্রী (সংবাদপত্র, টিভি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম) থাকে। শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যগণ এগুলোর সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। ☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে কোন কোন সময় শ্রমিক জন্য "শ্রমিক প্রশিক্ষণ কোর্স" শীর্ষক ১ (এক) সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকরা দেশের শ্রম আইন, শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব, উৎপাদনশীলতা, কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে।	
৬।	প্রশিক্ষণ প্রদান	☐ দেশের ৪টি পুরাতন বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী) ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন রয়েছে। এসব শিক্ষায়তনে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালতি হয়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দু'টি কোর্স অন্যতমঃ- (ক) চার সপ্তাহব্যাপী শিল্প সম্পর্ক কোর্সঃ ☐ শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি এবং শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এ কোর্সে অংশগ্রহণ করে থাকেন। শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম প্রশাসন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কার্যাবলী, বিভিন্ন শ্রম কনভেনশন এবং চলমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকে। (খ) শ্রমিক শিক্ষা কোর্সঃ ☐ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সমূহে এবং বিভিন্ন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য এক সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। ☐ প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স অংশগ্রহণকারীগণ জন প্রতি দৈনিক টাকা ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা) হারে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়ে থাকেন।	শিল্প সম্পর্ক (IRI) শিক্ষায়তন সমূহ।
৭।	কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে শ্রম সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ	☐ প্রতি বছর দেশের কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে শ্রম আইনের আওতায় নির্ধারিত ফরমে শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ☐ প্রতিবছর সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত একটি লেবার জার্ণাল' শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশ করা হয়। ☐ নির্ধারিত মূল্যে যে কেউ শ্রম পরিদপ্তর থেকে লেবার জার্ণাল" সংগ্রহ করতে পারেন।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর।

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন /প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
৮।	অন-লাইন সেবা প্রদান	☐ শ্রম পরিদপ্তর ইতোমধ্যে অন-লাইনে ট্রেড ইউনিয়ন/ ফেডারেশন/ কন-ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন সেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও অসদশ্রম আচরণের বিষয়ে অন-লাইনে অভিযোগ দাখিল করার সুযোগ রয়েছে। এ সেবাটি গ্রহণ করার জন্য শ্রম পরিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dol.gov.bd তে প্রবেশ করতে হবে। ☐ ০১টি সুরক্ষিত ডাটাবেজের মাধ্যমে শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর।
৯।	এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন	☐ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়টি প্রাপ্তির ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত নিস্পত্তি করা হয়।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর।
১০।	ওয়েব-সাইট	☐ শ্রম পরিদপ্তরের ওয়েব-সাইট www.dol.gov.bd তে শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানসহ অন্যান্য তথ্যাদি আপ-লোড করা আছে। প্রয়োজনে যে কেউ বর্ণিত আইন ও বিধি-বিধানসমূহ ডাউন-লোড করতে পারবে।	শ্রম পরিদপ্তর
১১।	হট লাইন	☐ পোশাক শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে নিস্পত্তি করার জন্য একটি হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। যার নম্বর ০৮০০-৪৪৫৫০০০।	শ্রম পরিদপ্তর

শ্রম পরিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস সমূহের নাম ও ঠিকানা

১ শ্রম পরিদপ্তর, শ্রম ভবন, ৪ রাজউক এভিনিউ,ঢাকা-১০০০।

২ যুগ্ম শ্রম পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, শ্রম ভবন (৯ম তলা), ৪ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

৩ যুগ্ম শ্রম পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, জাম্বুরীমাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৪ যুগ্ম শ্রম পরিচালক, খুলনা বিভাগ, বয়রা, খুলনা।

৫ যুগ্ম শ্রম পরিচালক, রাজশাহী বিভাগ, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।

৬ অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, মন্নুনগর, টঙ্গী, গাজীপুর।

৭ অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

৮ অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, সোনালী জুট মিলস, মীরের ডাংগা, খুলনা।

৯ অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ক্যান্টনমেন্ট, তেরখাদা, রাজশাহী।

১০ উপ শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, চকসূত্রাপুর, বগুড়া।

১১ উপ শ্রম পরিচালক, চা-শিল্প শ্রম কল্যাণ বিভাগ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

১২ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

১৩ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, মন্নুনগর, টুংগী, গাজীপুর।

১৪ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সাটিরপাড়া, নরসিংদী।

১৫ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভবন নং ২, কক্ষ নং ২০৫, সিলেট।

১৬ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, হোল্ডিং নং ১০৩, ব্লক এ, কলাবাগান হাউজিং, ধর্মপুর, কুমিল্লা।

১৭ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, পুরাণবাজার, চাঁদপুর।

১৮ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৫ মাহতাবুদ্দিন রোড, কুষ্টিয়া।

১৯ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, মংলা, বাগেরহাট।

২০ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, মুলাটোলা, রংপুর।

২১ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও ঢাকা।

২২ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মুন্নুনগর, টংগী গাজীপুর।

২৩ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শিমলা বাজার, সরিষাবাড়ী,জামালপুর।

২৪ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

২৫ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

২৬ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সাটিরপাড়া, নরসিংদী।

২৭ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পলাশ, ঘোড়াশাল।

২৮ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া।

২৯ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পুরাণ বাজার, চাঁদপুর।

৩০ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ষোলশহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩১ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কালুরঘাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

৩২ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, খান জাহান আলী রোড, রূপসা, খুলনা।

৩৩ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, খালিশপুর, খুলনা।

৩৪ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মংলা, বাগেরহাট।

৩৫ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ৫, মাহতাবুদ্দিন রোড, কুষ্টিয়া।

৩৬ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।

৩৭ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সপুরা, রাজশাহী।

৩৮ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ফজলুল হক রোড, মিরপুর, সিরাজগঞ্জ।

৩৯ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চকসূত্রাপুর, বগুড়া।

৪০ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

৪১ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গোডাউন রোড, গাইবান্ধা।

৪২ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ফুসকরী খেজুরী ছড়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

৪৩ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শমশেরনগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

৪৪ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পাত্রখোলা চা বাগান, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

৪৫ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চন্ডিছড়া চা বাগান, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

৪৬ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কাপনাপাহাড় চা বাগান, জুরি, মৌলভীবাজার।

৪৭ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, লুয়াইউনী চা বাগান, কাজলধারা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

৪৮ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চিকনাগুল, খান চা বাগান, সিলেট।

৪৯ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কলেজ রোড, লালমনিরহাট।

সিটিজেন চার্টার

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বিধিমালা ২০১৫ বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, কল্যাণ, মজুরী পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় প্রয়োগের জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা- বাগান, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা;
- শ্রমিকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ তদন্ত করে আইনানুগ ভাবে নিষ্পত্তি করা;
- আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা;
- কারখানা নিমার্ণ, প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ এর জন্য কারখানা ভবনের নকশা ও মেশিন লে-আউট প্লান ইত্যাদি অনুমোদন করা;
- কারখানা রেজিষ্ট্রেশন, সনদপত্র ইস্যু ও নবায়ন প্রদান করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও) সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধির সাথে আলোচনার মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়ন করা;
- করাখানা কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা হতে অব্যাহতি প্রদান করা;
- শ্রম আইন বা পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- আই,এল, ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই,এল, ও কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরী প্রশাসন, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

সেবা প্রদান

ক্রমিক নং	সেবা	সেবাদানের সময়সীমা	সেবাদানকারী কর্মকর্তা	যথাসময়ে সেবা পাওয়া না গেলে
০১	কারখানার মেশিন লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন	৯০ দিন	উপমহাপরিদর্শক	মহাপরিদর্শক
০২	কারখানার রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়ন	৯০ দিন		
০৩	শ্রমিক কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিষয় সমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ	৩০ দিন		
০৪	টোল ফ্রি হেল্প লাইন সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি	১৫ দিন		
০৫	কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন	৯০ দিন	মহাপরিদর্শক/ উপমহাপরিদর্শক	
০৬	কারখানা কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা হতে অব্যাহতি প্রদান	৩০ দিন		
০৭	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর বিভিন্ন ধারা ও বিধি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব	৫- ৭ দিন	মহাপরিদর্শক/ উপমহাপরিদর্শক	
০৮	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান	আইনানুযায়ী সময়সীমা		
০৯	বিভিন্ন শ্রমিক/ মালিক সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা/ সেমিনার ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে সহযোগিতা করা	...		

ওয়েবসাইটে তথ্য সেবা সমূহ

ওয়েবসাইটে তথ্য সেবা সমূহ (www.dife.gov.bd)

- অর্গানোগ্রামসহ অধিদপ্তর সম্পর্কিত তথ্য;
- প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা;
- সেবা প্রদানের পদ্ধতিসহ সেবা গ্রহণের তালিকা;
- ডাউনলোড সুবিধাসহ শ্রম আইন ও নীতিমালা সমূহ;
- গার্মেন্টস সেক্টরের ডাটাবেজ;
- ডাউনলোড সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় ফরম সমূহ;
- দপ্তরের সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত নোটিশ ও নিউজ ফ্ল্যাশ।

অনলাইন সেবা সমূহ

অনলাইন সেবা সমূহ (www.dife.gov.bd/apps)

- কারখানার লে-আউট প্লান বা সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্লান অনুমোদনের আবেদন;
- কারখানার লে-আউট প্লান অনুমোদন সহ কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন;
- কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন;
- কারখানার লাইসেন্স নবায়ন এর আবেদন;
- কারখানার লাইসেন্স সংশোধন এর আবেদন;

- কারখানার লে-আউট প্লান বা সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্লান অনুমোদনসহ লাইসেন্স সংশোধনের জন্য আবেদন;
- কারখানার ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন;
- কাজ শুরু করার পূর্বের নোটিশ;
- কোন শ্রমিকের বা শ্রমিকদের মজুরীসহ আইনগত প্রাপ্য পাওনাদির বিষয়ে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করণ;
- আবেদন পত্রের স্ট্যাটাস বা অবস্থান সম্পর্কে তথ্য।

অনলাইন কারখানা রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

১। অনলাইন কারখানা রেজিস্ট্রেশন আবেদন করার জন্য প্রথমে www.dife.gov.bd/apps এ যেতে হবে।

২। এরপর ওয়েবসাইটের যে সেবাটি নিতে চান, সেই সেবাটিতে ক্লিক করলে আবেদনের ফরম চলে আসবে।

৩। নির্ধারিত ফরমটি যথাযথ ভাবে পূরণ করে সেন্ড বাটনে ক্লিক করলেই আবেদন সম্পূর্ণ হবে।

৪। আবেদন সেন্ড হওয়ার ফিরতি মেইলে আপনার নিকট একটি Tracking ID Number চলে আসবে।

৫। Tracking ID Number টি মূল কাগজপত্র সহ সংশ্লিষ্ট জেলার উপ মহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

শ্রমিকের অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি

১। অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের জন্য প্রথমে www.dife.gov.bd/apps এ যেতে হবে।

২। এরপর ওয়েবসাইটের অভিযোগের জন্য নির্ধারিত আবেদন পত্রে ক্লিক করলে আপনার ফরমটি চলে আসবে।

৩। নির্ধারিত ফরমটি যথাযথ ভাবে পূরণ করে সেন্ড বাটনে ক্লিক করলেই আবেদন সম্পূর্ণ হবে।

৪। টোল ফ্রি হেল্প লাইন -০৮০০-৪৪৫৫০০০।

সদর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

সৈয়দ আহমদ মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০১৩৬২৬ chief.dife@gmail.com	মোঃ মঞ্জুর কাদের খান উপ-মহাপরিদর্শক ফোন: ০২-৯৫৫৫৫৪৫ মোবাইল: ০১৯১১৫৪৮২৩০ dig.admin@dife.gov.bd
মো: শামসুজ্জমান ভূঁইয়া অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: ০২-৯৫৬৮৭০৬ addig@dife.gov.bd	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭১৮২৩৯২০০ dig.admin@dife.gov.bd
মো: ওবায়দুল ইসলাম যুগ্ম-মহাপরিদর্শক ফোন: ০২-৯৫৫৭৯৫০ মোবাইল: ০১৮১৬৪৭৩২৩৬ obaidul_dife@yahoo.com	মোসা: জুলিয়া জেসমিন উপ-মহাপরিদর্শক ফোন: +৮৮-০২-৫৫০১৩৬২৭ dig.general@dife.gov.bd
মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া উপ-মহাপরিদর্শক (সেফটি) মোবাইল: ০১৯১৪-৩৪৭৭৯৩ bhuiya0207@gmail.com	সোমা রায় সহকারি মহাপরিদর্শক (সাধারণ) ফোন: ০২৯৫৭৭৪৪৯

মোঃ মিজানুর রহমান জনি সহকারি মহাপরিদর্শক (সেফটি) ফোন: ০১৯১১৪০৯৪০৬ johnbd88@yahoo.com	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন সহকারি মহাপরিদর্শক (সাধারণ) ফোন: ০১৭১১-৪৩৯৭১০ mhsikto@gmail.com
সিকদার মোঃ তৌহিদুল হাসান সহকারি মহাপরিদর্শক (সেফটি) ফোন: ০১৭১১-৪৩৯৭১০ tawhid.hasan777@gmail.com	মোঃ আল-আমিন সহকারি মহাপরিদর্শক (সেফটি) ফোন: ০১৭১১-০৮৩০৬৮
ফরহাদ ওহাব সহকারি মহাপরিদর্শক (সেফটি) ফোন: ০১৭২৯-৭১৩৩৮২	

জেলা কার্যালয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ

আব্দুল কাইয়ুম উপ-মহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৬৭৬১১৯৫৬৫ akaium.du@gmail.com রংপুর, বাংলাদেশ	মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭১১১৭০০৫৩ narsingdidife@gmail.com নরসিংদী, বাংলাদেশ
মোঃ হাসিবুজ্জামান উপ-মহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭১৫-৩০০৯৫০ dig.barisal@dife.gov.bd বরিশাল, বাংলাদেশ	মোঃ খোরশেদ আলম উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭৩৯৭৯৯৯২৫ dig.kishorgonj@dife.gov.bd কিশোরগঞ্জ, বাংলাদেশ
মোঃ আব্দুল হাই খান উপ-মহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৯২০-৬৬৭৯৩৩ digctg@gmail.com চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	প্রকৌ: ফরিদ আহমেদ উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭১৫০৯৮৩৮৩ dig.gazipur@gmail.com গাজীপুর, বাংলাদেশ
মোঃ সহিদুল ইসলাম উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭১২০২৯২৯৭ digmanikgonj2014@gmail.com মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ	মোঃ সিরাজুল ইসলাম উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭১৬০৩২৯১৬ dig.jessore@gmail.com যশোর, বাংলাদেশ
শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭১২২০৩৫৯৬ dig.narayanganj@gmail.com নারায়নগঞ্জ , বাংলাদেশ	মোরতাজা মোরশেদ উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭৪৪৩০০৩০০ digpabna@gmail.com পাবনা, বাংলাদেশ

মোহর আলী মোল্লা উপমহাপরিদর্শক ফোন: ০৪১-২৮৫০১৪৩ মোবাইল: ০১৭১২৪২৮১২৭ digkhulna1@gmail.com খুলনা, বাংলাদেশ	মোঃ মতিউর রহমান উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৯১৫৮১৩৪৫০ dig.munshigonj@dife.gov.bd মুন্সিগঞ্জ, বাংলাদেশ
মোঃ কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শক মোবাইল:০১৭১৯২৩০৭৭৩, ০১৭১৮৫০৬২৬৯ dig.mole.rajshahi@gmail.com রাজশাহী, বাংলাদেশ	ডা: মোস্তাফিজুর রহমান উপ-মহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭১১৬৪১৩৪৫ dig.tangail.dife@gmail.com টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ
মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার উপমহাপরিদর্শক ফোন: ০৫১৬৬৩৮৭ মোবাইল: ০১৭১১৯০০৭৮৭ digbogra@gmail.com বগুড়া, বাংলাদেশ	মোঃ জাকির হোসাইন উপমহাপরিদর্শক ফোন: ০২-৯৫৬৬৭১১ মোবাইল: ০১৭১১৮৬৮৭৭৮ digfe.dhaka@gmail.com ঢাকা, বাংলাদেশ
প্রকৌ: মো: শামসুল আলম খান উপ-মহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৫৫৩৫৬০৬৩৩ dig.mymensingh1@gmail.com ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ	হিমন কুমার সাহা উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭১২৯৭৯৬৮২ digkushtia@gmail.com কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
মোঃ আরিফুল হক উপ-মহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৯১১৫৫৮৫১১ dig.sylhet.bd@gmail.com সিলেট, বাংলাদেশ	মোঃ বুলবুল আহমেদ উপমহাপরিদর্শক মোবাইল: ০১৭২৫-৯১৪৮৪১ digsirajgonj@gmail.com সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ
মোঃ ইকবাল আহম্মেদ উপমহাপরিদর্শক ফোন: ০৮১-৭৬৭৯২ মোবাইল: ০১৭১৪২১১১৫৮ digfcom@gmail.com কুমিল্লা, বাংলাদেশ	মোঃ আজিজুল ইসলাম উপমহাপরিদর্শক ফোন: ০৮৬২৬-৭১৪০১ মোবাইল: ০১৭১১৮৩৫৫৫২ dig.moulovibazar@gmail.com মৌলভীবাজার, বাংলাদেশ

"মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি"

(১৬)

উদযাপন উপলক্ষে গঠিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	ঃ	জনাব মিকাইল শিপার সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রধান সমন্বয়কারী	ঃ	মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মুখ্য সমন্বয়ক	ঃ	জনাব সৈয়দ আহম্মদ মহা-পরিদর্শক (অতিঃ সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সমন্বয়ক	ঃ	জনাব এস, এম, আশরাফুজ্জামান শ্রম পরিচালক (যুগ্ম সচিব), শ্রম পরিদপ্তর

অতিথি তালিকা প্রণয়ন/ আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ ও বিতরণঃ

১।	মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
২।	ম.আ. কাশেম মাসুদ	যুগ্ম-সচিব (শ্রম)
৩।	জনাব বি.এম এনামুল হক	যুগ্ম-সচিব (আদালত ও সমন্বয়)
৪।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ সচিব (প্রশাসন)
৫।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
৬।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৭।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	উপ শ্রম পরিচালক
৮।	জনাব সালাহউদ্দীন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক
১০।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী প্রধান
১১।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক
১২।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
১৩।	ইঞ্জিনিয়ার ফরিদ আহমেদ	উপ মহাপরিদর্শক
১৪।	জনাব ইকবাল আহমেদ	উপ মহাপরিদর্শক
১৫।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
১৬।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
১৭।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক

র‍্যালী ব্যবস্থাপনা ঃ

১।	জনাব এস, এম, আশরাফুজ্জামান	শ্রম পরিচালক
২।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
৩।	জনাব আই,কে,এম,এহ্‌তেশামুল হক	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব এস, এম এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	উপ শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব আবদুল মতলেব হাওলাদার	সহকারী সচিব
৮।	জনাব মোঃ আবু আশরীফ মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহা পরিদর্শক
১০।	জনাব মোঃ ইকবাল আহম্মেদ	উপ মহা পরিদর্শক
১১।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
১২।	জনাব আব্দুর রশিদ পাঠান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১৩।	জনাব মোঃ ফয়জুল্লাহ বিশ্বাস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সেমিনার আয়োজন

১।	সৈয়দ আহম্মদ	মহাপরিদর্শক
২।	জনাব ম. আ. কাশেম মাসুদ	যুগ্ম সচিব (শ্রম)
৩।	জনাব এস.এম জাহেদুল করিম	যুগ্মসচিব
৪।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপসচিব
৫।	জনাব মুহাম্মদ তাইয়েবুল ইসলাম	উপসচিব
৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	উপসচিব
৭।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
৮।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উম মহাপরিদর্শক
৯।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
১১।	জনাব মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া	উপ মহাপরিদর্শক
১২।	জনাব মোজাম্মেল হোসেন	সহকারী মহাপরিদর্শক
১৩।	জনাব খন্দকার হাসান কবির	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
১৪।	জনাব মোহাম্মদ কেফাত আলী	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১।	খোন্দকার মোস্তান হোসেন	যুগ্ম সচিব (আইও)
২।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপসচিব
৩।	জনাব হুমায়ুন কবির	সিনিয়র সহকারী প্রধান
৪।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক
৫।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৬।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী'র একজন প্রতিনিধি	
৭।	জনাব এস, এম এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৮।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
৯।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সহকারী শ্রম পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক

মেইন গেইট ও সড়ক দ্বীপ সজ্জিতকরণ এবং ব্যনার স্থাপন

১।	জনাব এস, এম আশরাফুজ্জামান	শ্রম পরিচালক (যুগ্মসচিব),
২।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
৩।	জনাব মোঃ আবু আশরীফ মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব ইকবাল আহমেদ	উপ মহাপরিদর্শক
৫।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ নাজমুল রাশেদ	মহা পরিদর্শক
৮।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব কবির উদ্দিন হাওলাদার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১০।	জনাব শোভন দাশ	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)

মূল প্রবেশ পথে অভ্যর্থনা

১।	মিএগ্রা আব্দুল্লাহ মামুন	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
২।	জনাব এ,বি,এম, খোরশেদ আলম	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
৩।	সৈয়দ আহম্মদ	মহাপরিদর্শক
৪।	জনাব মোঃ সামসুজ্জামান ভূঁইয়া	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
৫।	খোন্দকার মোস্তান হোসেন	যুগ্মসচিব
৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	উপসচিব
৭।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপসচিব
৮।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
৯।	শ্রী নিবাস দেবনাথ	সিনিয়র সহকারী প্রধান
১০।	জনাব সঞ্জয় কুমার ঘোষ	সহকারী প্রধান

স্মরণিকা লেখা আহ্বান, প্রকাশনা ও সম্পাদনা ঃ

১।	জনাব এ,বি,এম, সিরাজুল হক	উপ-সচিব
২।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ-সচিব
৩।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপ-সচিব
৪।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	উপ-সচিব
৫।	জনাব মুহাম্মদ তাইয়েবুল ইসলাম	উপ-সচিব
৬।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী	উপ-প্রধান
৭।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	সিনিয়র সহকারী প্রধান (শ্রম)
৮।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	যুগ্ম-শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া	উপ-মহাপরিদর্শক
১০।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক

স্মরণিকা বিতরণ

১।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপ-সচিব
২।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
৩।	মোসাঃ জুলিয়া জেসমিন	উপ মহাপরিদর্শক
৪।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক
৬।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	উপ শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৮।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক
১০।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সহকারী শ্রম পরিচালক
১১।	জনাব মোঃ আল আমিন	সহকারী মহাপরিদর্শক
১২।	জনাব মোঃ তোফায়েল আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

আসন বিন্যাস ও স্টিকার তৈরি করা

১।	ড. মোঃ রেজাউল হক	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
২।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপসচিব
৩।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপসচিব
৪।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	সিনিয়র সহকারী প্রধান
৫।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৬।	ইঞ্জিনিয়ার ফরিদ আহমেদ	উপ মহাপরিদর্শক
৭।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহা পরিদর্শক
৮।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী	সিনিয়র সহকারী প্রধান
১০।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী প্রধান
১১।	ডাঃ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক
১২।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সহকারী শ্রম পরিচালক
১৩।	বেগম রোকসানা চৌধুরী	সহকারী শ্রম পরিচালক
১৪।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক

আসন সংরক্ষণ

১।	ড. মোঃ রেজাউল হক	যগ্মসচিব (উন্নয়ন)
২।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ-সচিব
৩।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপ-সচিব
৪।	বেগম শাকিলা জেরিন আহমেদ	উপ-সচিব
৫।	জানব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)
৬।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ মতলেব হাওলাদার	সহকারী সচিব
৮।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক
৯।	জনাব মোঃ হাফেজ আহমেদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ ইকবাল আহম্মেদ	উপ মহাপরিদর্শক
১১।	বেগম জুলিয়া জেসমিন	উপ মহা পরিদর্শক
১২।	জনাব সৌমেন বড়ুয়া	সহকারী মহাপরিদর্শক
১৩।	শিকদার মোঃ তৌহিদ হাসান	সহকারী মহাপরিদর্শক
১৪।	শ্রীমতি সোমা রায়	সহকারী মহাপরিদর্শক
১৫।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	শ্রম পরিদর্শক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসনসহ ডায়াসে অন্যান্য আসন সংরক্ষণঃ

১।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী প্রধান
২।	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	অফিস সহায়ক
৩।	জনাব মোঃ মইনুদ্দিন	অফিস সহায়ক
৪।	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক	অফিস সহায়ক

বহিরাঙ্গন অভ্যর্থনা

১।	জনাব বি.এম এনামুল হক	যুগ্মসচিব (আদালত ও সমন্বয়)
২।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপসচিব
৩।	বেগম শাহীন আখতার	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
৪।	জনাব মোঃ আবু আশরীফ মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ হাফেজ আহমেদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব সালাহউদ্দীন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৮।	জনাব মোঃ ইকবাল আহম্মেদ	উপ মহাপরিদর্শক
৯।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা

আলোচনা মঞ্চ সজ্জিতকরণ

১।	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন	যুগ্মসচিব
২।	জনাব এস, এম এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব সালাহউদ্দীন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব শিকদার মোঃ তৌহিদ হাসান	সহকারী মহাপরিদর্শক

পবিত্র কোরআন শরীফ, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল ও সঞ্চালক আনা-নেওয়ার দায়িত্ব

১।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	উপ শ্রম পরিচালক
২।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব মোঃ ইকবাল আহমেদ	উপ মহাপরিদর্শক
৪।	জনাব সালাহউদ্দীন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ আল আমিন	সহকারী মহাপরিদর্শক
৮।	জনাব শাহ্ মোফাখখারুল ইসলাম	সহকারী মহাপরিদর্শক
৯।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	শ্রম পরিদর্শক
১০।	জনাব মোঃ আহসান জামিল	শ্রম পরিদর্শক

এস,বি/ডিউটি পাসের ব্যবস্থা করা

১।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ-সচিব
২।	জনাব শাহীন আখতার খান	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
৩।	জনাব মঞ্জুর কাদের	উপ মহাপরিদর্শক
৪।	জনাব মোঃ হাফেজ আহমেদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ জহিরুল হক	পরিসংখ্যান সহকারী
৭।	জনাব মোঃ আহসান জামিল	শ্রম পরিদর্শক
৮।	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	হিসাব রক্ষক

রেডিও ও টিভিতে অনুষ্ঠান প্রচার

১।	জনাব অমর চান বণিক	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিবজনসংযোগ কর্মকর্তা
২।	জনাব মোঃ আকতারুল ইসলাম	জনসংযোগ কর্মকর্তা
৩।	জনাব মোঃ আব্দুল রশিদ মোল্লা	যুগ্ম মহা পরিদর্শক
৪।	জনাব এস,এম আরিফুজ্জামান	তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা
৫।	জনাব শিকদার মোঃ তৌহিদ হাসান	সহকারী মহাপরিদর্শক

মোবইল/ব্যাগ সংরক্ষণ

১।	জনাব শফিকুল ইসলাম	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
২।	জনাব এনামুর হক রাকি	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
৩।	জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৪।	জনাব সুব্রত নাথ	পরিসংখ্যান সহকারী
৫।	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	অফিস সহায়ক

গেঞ্জি, টুপি বিতরণ

১।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক
২।	জনাব মোঃ হাফেজ আহমেদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ নাজমুল রাশেদ	সহকারী মহাপরিদর্শক
৫।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	অসিফ সহকারী-কাম-কম্পিউটার মদ্রাক্ষরিক
৬।	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ সিকদার	দপ্তরী

ফোকাল পয়েন্ট

১।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	উপ-সচিব (শ্রম ও আইন)
২।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক (চঃ দাঃ)
৩।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উপ-মহাপরিদর্শক

দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি

১।	জনাব আই, কে, এম এহ্‌তেশামুল হক	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক	সভাপতি
২।	ডঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহা পরিদর্শক	সদস্য
৩।	জনাব মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া	উপ মহা পরিদর্শক	সদস্য
৪।	জনাব অধীর চন্দ্র বালা	রেজিস্ট্রার, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ আবু আশরীফ মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক	সদস্য-সচিব

আয়-ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত কমিটি

১।	জনাব মোঃ সামসুজ্জামান ভূঁইয়া	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
২।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ সচিব
৩।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক
৬।	মিসেস রোকসানা চৌধুরী	সহকারী শ্রম পরিচালক

মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী, সচিব মহোদয়ের বাণী, মহাপরিদর্শক, শ্রম পরিচালক এর বাণীর খসড়া তৈরী ও সংগ্রহের দায়িত্বে থাকবেন যথাক্রমেঃ

১।	জনাব মোঃ আবু আশরীফ মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
২।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৩।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক
৪।	বেগম জুলিয়া জেসমিন	উপ মহাপরিদর্শক
৫।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক
৬।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সহকারী শ্রম পরিচালক

প্রচার সংক্রান্ত কমিটি

১।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
২।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	উপ শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক
৫।	বেগম জোবেদা খাতুন	সহকারী শ্রম পরিচালক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের ভাষাণের খসড়া প্রস্তুত কমিটি

১।	জনাব মোঃ ইকবাল আহমেদ	উপ মহাপরিদর্শক
২।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৩।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক

বিজি প্রেসে দাওয়াত কার্ডের প্রুফ দেখা ছাপানোসহ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকবেন ঃ

১।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
২।	জনাব মোঃ আল আমিন	সহকারী মহাপরিদর্শক
৩।	শিকদার মোঃ তৌহিদ হাসান	সহকারী মহাপরিদর্শক

অনুষ্ঠানসূচি

১ মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ /১৮ বৈশাখ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

স্থান ঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

বিকাল

৩.৩০ মিঃ	ঃ	আমন্ত্রিত অতিথিদের আসন গ্রহণ।
৪.০০ মিঃ	ঃ	প্রধান অতিথির আগমন।
৪.০১ মিঃ	ঃ	পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ থেকে তেলাওয়াত/পাঠ।
৪.০৯ মিঃ	ঃ	স্বাগত বক্তব্য ঃ **জনাব মিকাইল শিপার** সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৪.১৪ মিঃ	ঃ	শ্রমিক প্রতিনিধির বক্তব্য ঃ **জনাব শুক্কুর মাহামুদ** সভাপতি, জাতীয় শ্রমিকলীগ।
৪.১৯ মিঃ	ঃ	মালিক প্রতিনিধির বক্তব্য ঃ **জনাব সালাহউদ্দীন কাসেম খান** সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন।
৪.২৪ মিঃ	ঃ	আইএলও প্রতিনিধির বক্তব্য ঃ **Mr. Srinivas B. Reddy** ILO Country Director, Bangladesh.
৪.২৯ মিঃ	ঃ	বিশেষ অতিথির বক্তব্য ঃ **বেগম মন্নুজান সুফিয়ান** এম. পি সভাপতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
৪.৩৬ মিঃ	ঃ	সভাপতির বক্তব্য ঃ **জনাব মোঃ মুজিবুল হক** এম. পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৪.৪৬ মিঃ	ঃ	প্রধান অতিথির ভাষণ ঃ **শেখ হাসিনা** **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।**
	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

- অনুগ্রহপূর্বক আমন্ত্রণপত্র সাথে আনবেন। এ আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- ব্রীফকেস, মোবাইল ফোন, হাত ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, ক্যামেরা, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সাথে না আনার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনুষ্ঠান শুরুর অন্তত ৩০ মিঃ পূর্বে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহান মে দিবস-২০১৬

র‌্যালী-সেমিনার
উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কর্মসূচি

মে দিবস র‌্যালী

০১, মে রবিবার

সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় শ্রম ভবন থেকে আরম্ভ হয়ে দৈনিক বাংলার মোড় হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হবে।

মে দিবস সেমিনার

স্থান ঃ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জ

০২, মে সোমবার

প্রথম সেমিনার	ঃ	সকাল ১০.০০ টা থেকে বেলা ১.০০ টা পর্যন্ত।
আয়োজক	ঃ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স ও কর্মজীবী নারী
বিষয়	ঃ	"শ্রমিক কল্যাণঃ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ভূমিকা"
প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব মিকাইল শিপার, মাননীয় সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
বিশেষ অতিথি	ঃ	সৈয়দ আহম্মদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
		জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), জীবন বীমা করর্পোরেশন।
		জনাব ম.আ.কাশেম মাসুদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন।
সভাপতি	ঃ	শিরীন আখতার, এম.পি, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, কর্মজীবী নারী।

০২, মে সোমবার

দ্বিতীয় সেমিনার	ঃ	বিকাল ২.০০ টা থেকে ৫.০০ টা পর্যন্ত।
আয়োজক	ঃ	সেইফ্‌টি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)।
বিষয়	ঃ	"নিরাপদ কর্মক্ষেত্র : পোষাক কারখানা ভবন সংস্কারে করণীয়"
প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
বিশেষ অতিথি	ঃ	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সভাপতি, বিজিএমইএ।
		জনাব ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র।
সভাপতি	ঃ	মোঃ আওলাদ আলী, সহ-সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ব্লাস্ট।

“মে দিবসের মর্মবাণী
শ্রমিক মালিক ঐক্য জানি”

7.5" x 10.6" inch

BASHUNDHARA GROUP
অভিজ্ঞ চোখ আসল চেনে
বিশ্বমানের বসুন্ধরা A4 পেপার ক্রেতার স্বার্থরক্ষা এবং নকল এড়ানোর জন্য সুদৃশ্য প্যাকেজিং ও হলোগ্রাম স্টিকারসহ বাজারজাত করা হয়।
অভিজ্ঞ চোখে পরখ করে অবশ্যই বসুন্ধরা পেপারের হলোগ্রাম স্টিকার সম্বলিত A4 প্যাকেট কিনুন এবং থাকুন নিশ্চিন্ত
Bashundhara
বসুন্ধরা পেপার মিলস্ লিঃ
বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেডকোয়ার্টারস
প্লট নং ৩, ব্লক নং জি, উম্মে কুলসুম রোড, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯
হটলাইন ১৬৩৩৯

Unilever

For 50 years Unilever Bangladesh Limited has been serving the people of Bangladesh with a range of home care, personal care and food products. Brands like Wheel, Rin and Vim have delighted housewives by making household chores simpler. Brands like Lifebuoy, Pepsodent and Pureit have helped millions of families stay healthy. Brands like Lux and Fair & Lovely have helped women look and feel beautiful. Unilever reaches nearly every household in Bangladesh with at least one of its brands and every day nearly 2 billion people around the world use Unilever brands to feel good, look good and get more out of life. We want to continue this proud heritage by creating a better future everyday through our business and our brands. We want to grow as a business while minimizing our environmental footprint and maximizing our social impact. We want to grow by putting 'sustainable living' in the heart of everything we do.

Learn more about Unilever and our Sustainable Living Plan at:
http://www.unilever.com.bd

Dove. POND'S LUX AXE Vaseline Pepsodent CLEAR Rexona sunsilk
Fair & Lovely Wheel Lifebuoy Taaza Knorr closeup Surf excel Rin Vim pureit

To find out more visit unilever.com or www.facebook.com/unilever